একাত্তরের টুকরো গল্প

আলহাজ্ব মো: সামসুদ্দিন

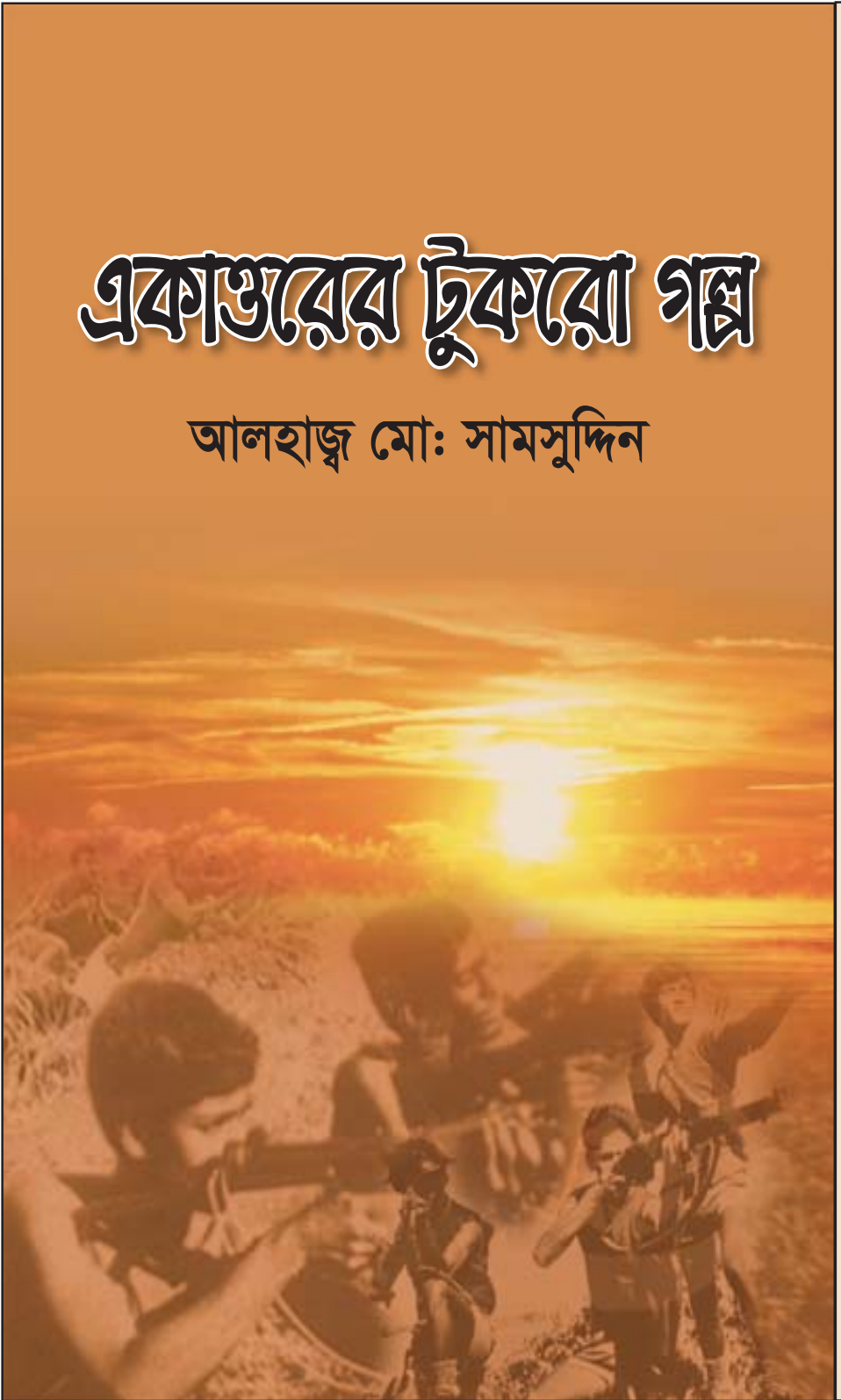

‘একাত্তরের টুকরো গল্প’ বইটির গল্পগুলি লেখকের চাক্ষুষ দেখা। একজন শিক্ষিত সচেতন যুবক হিসেবে সেই সময় তিনি যা দেখেছেন, করেছেন, তাঁর সহযোদ্ধারা যা করেছেন তারই খন্ডিত খন্ডিত ছবি, এক একটি গল্প। কত মানুষের ত্যাগ, ভালোবাসা, কত নারীর নিভৃতে দেশের জন্য উজাড় করে দেওয়া মমতা তারই একটি ছবি আঁকা হয়েছে বইটিতে।

মুক্তিযোদ্ধা মো: সামসুদ্দিন এর জন্ম ১৯৪৯ সালে। পিতা : মরহুম সেকেন্দার আলী মোল্লা। মাতা মরহুমা দুল্লুপি বিবি। গ্রাম: জয়কৃষ্ণপুর, উপজেলা: পাংশা, জেলা: রাজবাড়ী। প্রাথমিক শিক্ষা জয়কৃষ্ণপুর প্রাইমারী স্কুলে। মাধ্যমিক শিক্ষা হাবাসপুর কে. রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৬৭ তে উচ্চ মাধ্যমিক। ১৯৭০ এ রাজবাড়ী কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করেন। ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন লেখককে সকল আন্দোলনের কর্মী করে তোলে। বাহাদুরপুর হাইস্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার দেড় বছরের মাথায় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তিনি তার বাল্য সাথীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের লক্ষ্যে দেশ ত্যাগ করেন। অস্ত্র নিয়ে দেশে ফিরে শুরু করেন গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধ। তিনি নিজে এবং তার সহযোদ্ধারা ছিলেন পাকবাহিনী, রাজাকার আলবদরদের ত্রাস। দেশ স্বাধীন হলে ঐ স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন পরে বি.এড ডিগ্রি নেন। ১৯৭৯ সালে বন বিভাগে ফরেস্ট রেঞ্জার পদে চাকুরিতে যোগদানের পর বি.এস.সি ইন ফরেস্ট্রিতে গ্রাজুয়েশন করেন। ২০০৬, ২৮ ডিসেম্বর সহকারী বন সংরক্ষক পদে বর্ণাঢ্য চাকরী জীবন শেষ করে অবসরে যান। তিনি ২০০৭ ও ২০১৩ সালে হজ্ব পালন করেন। বর্তমান সময় কাটে বই পড়ে, বাল্য বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে এবং ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণ করে।

একাত্তরের টুকরো গল্প
মো. সামসুদ্দিন

একাত্তরের টুকরো গল্প
মো. সামসুদ্দিন

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৫

স্বত্ব: লেখক

প্রকাশক: মোর্শেদ আলম
জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন
৬৭, প্যারী দাস রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।
ফোন : ৭১১১৯৬৯

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস: নেছার উদ্দিন, ম্যাক্রোস পয়েন্ট
২৭৯ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, ঢাকা-১২০৫।

মূল্য: ৩০০.০০ (তিনশত টাকা) মাত্র।

Price: 300.00 Tk. only

উৎসর্গ

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদ
ও অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা
এবং মহিয়সী বীরাঙ্গনাদের প্রতি

ভূমিকা

'একাত্তরের টুকরো গল্প' বইটি লেখার ইচ্ছে ছিল যুদ্ধকালীন সময়েই। সহযোদ্ধা তপনের কাছ থেকে ছোট্ট একটা নোট বই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো টুকেও রেখেছিলাম। তপনের কাছ থেকেই নোট বইটা হারিয়ে যায়। সরকারী চাকুরিসূত্রে নানা জায়গায় বিচরণের ফলে ইচ্ছেটা বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব হয় নাই। না হওয়ার আরও একটা অন্যতম কারণ কুড়েমি। অবসরে যাওয়ার অনেক পরে মনে হল, যাই মনে আছে, তাই লিখবো। দিন তারিখ-এর হেরফের কোন ব্যাপার না।

আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি যুবক বয়সে। গ্রাজুয়েশন শেষ করে, হাইস্কুলের শিক্ষকতায় সবেমাত্র ঢুকে। উত্তর প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে লিখে যাওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধই আমাকে তাড়িত করে কলম ধরালো। আমি তো লেখক নই। লেখা আমার পেশাও নয়। সত্য ঘটনা, যা করেছি, যা দেখেছি তাই লিখবো। এতে রস, গন্ধ, সুগন্ধ মিশ্রণের দরকার নেই। মিশ্রণের ক্ষমতাও আমার নেই।

আমি ও আমার সাথীরা '৭১ এ যুদ্ধের সময় যা দেখেছি, যা করেছি তারই বর্ণনা আছে বইটিতে। যুদ্ধের সময় অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও আমাদের মতো; আমাদের চাইতেও অনেক অনেক গুণ বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অনেক বেশি কাজ করেছেন। সবার সম্মিলিত দুর্বার আক্রমনে ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বান, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...' দেশকে স্বাধীন করার জন্য এদেশের যুব সমাজকে পাগলপারা করে ফেলেছিল। ঐ আহ্বান আমরা মুহূর্তের জন্য ভুলিনি।

বইটি প্রকাশ করার জন্য আমার পরম স্নেহের ভাগ্নে মো. আরিফ প্রচণ্ড শ্রম দিয়েছেন। উৎসাহ যুগিয়েছে কাজটি শেষ করার জন্য। ওর তাড়া না খেলে হয়তো কুড়েমির কারণে পড়েই থাকতো লেখাগুলো।

দীর্ঘ ৪৪ বছরের পুরোনো ঘটনা লিখতে গেলে স্মৃতি প্রতারিত হওয়া স্বাভাবিক। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিও সম্ভব। তাই বিদগ্ধ পাঠকগণকে ভুলত্রুটি সমূহ সমালোচনা বা বিতর্কের বিষয়বস্তু না করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নিমিত্তে আমাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ রইলো। যুদ্ধকালীন

কমান্ডারদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা যা করেছেন, দেখেছেন সেগুলো লিপিবদ্ধ করে যান। প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের কথা। মুক্তিযুদ্ধের কথা। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শকুনেরা এখনো আকাশে উড়ছে। এদের চির নির্মূল করার দায়িত্ব দিয়ে যাই নতুন প্রজন্মের কাঁধে।

বইটি প্রকাশে জনাব রবিউল আলম জিন্নাহ্ আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

মো. সামসুদ্দিন (সামছা)
E-mail : shams4246@gmail.com

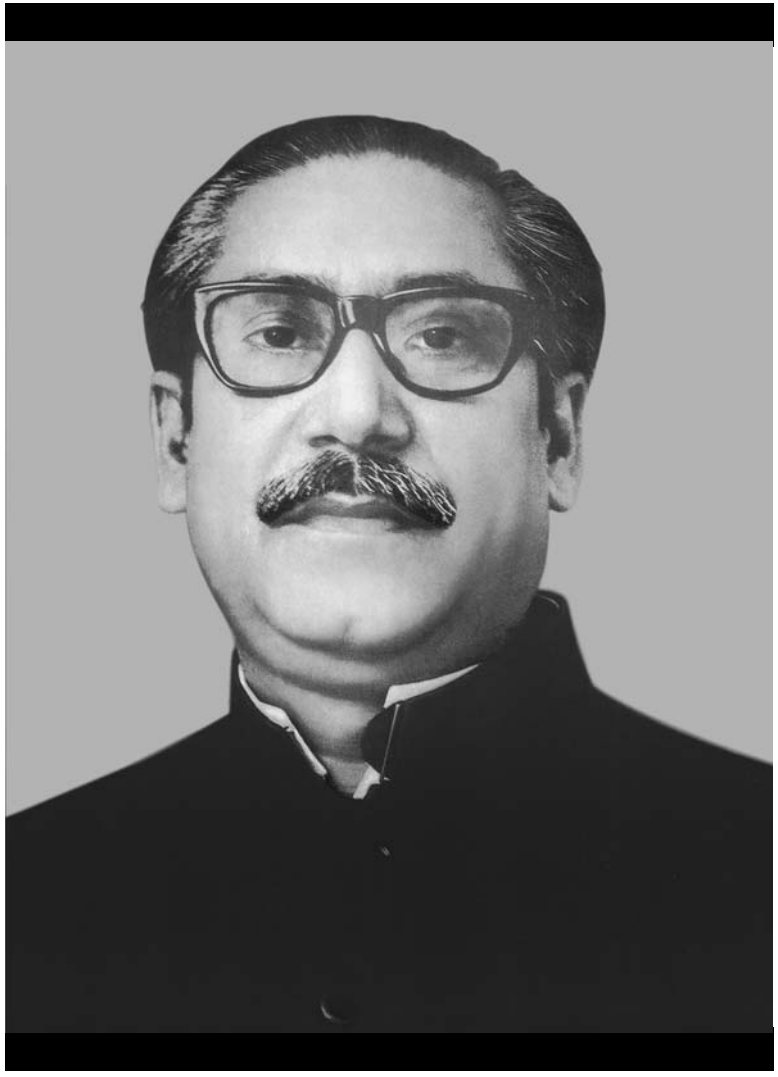

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

আমার দেখা প্রথম গণহত্যা	১১-১৪
মুক্তিযোদ্ধা সাহা খাঁ ও আমরা ক'জন	১৫-৪৪
চাকুলিয়ার স্মৃতি/দিনগুলো	৪৫-৭২
দেশে ফেরা ও যুদ্ধ শুরু	৭৩-৯৪
রাজবাড়ীর যুদ্ধ	৯৫-১১২
মুক্তিযোদ্ধা কবির/সুহৃদ কবির	১১৩-১৪৫
ভারতের মাটিতে কিছু অম্ল-মধুর ঘটনা	১৪৬-১৬৫
খলিলের কাছে খোলা চিঠি	১৬৬-১৭৫

আমার দেখা প্রথম গণহত্যা

জামায়াতে ইসলামির নায়েবে আমির মোহাম্মদ আবদুস সোবহানের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল-১ তার বিরুদ্ধে একাত্তরে গণহত্যা ও হত্যা, অপহরণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ-প্রভৃতি মানবতাবিরোধী অপরাধে নয়টি অভিযোগ গঠন করে।

ষষ্ঠ অভিযোগে বলা হয়েছে ১৯৭১ সনের ১২ মে ভোর ৬ টা থেকে সোবহানের নেতৃত্বে রাজকাররা ও পাকিস্তানি সেনারা পাবনার সুজানগর থানার সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের মোমরাজপুর, কফিৎপুর, কন্দর্পপুর গ্রামের কাছে পদ্মা নদীর পাড় ও গুপিনপুর গ্রামে আওয়ামী নেতাকর্মী ও হিন্দু জনগোষ্ঠির উপর অভিযান চালায়। এই অভিযানে ৪৮০ জন লোক গণহত্যার শিকার হন। শত শত বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালানো হয়। (প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি, ২০১৪) এই ছয় নং অভিযোগ সম্পর্কে আমি লিখছি এই জন্য যে এটা আমি দেখেছিলাম। আমার সাথীরা নিজ চোখে দেখেছিল।

আমার বাড়ি বর্তমান রাজবাড়ি জেলায় পাংশা থানার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে পদ্মার পাড়ে। নদীর ওপারেই সুজানগর থানার সাতবাড়িয়া বাজার ও উপরের বর্ণিত গ্রামগুলি। সাতবাড়িয়া ব্যবসায়িক কেন্দ্র বলে এপারের লোকজন খেয়া পার হয়ে বা নিজেরা নৌকা নিয়ে ওপারে যায়। আমিও আমার দাদুর সাথে কয়েকবার গিয়েছি। একাএকাও গিয়েছি। আসা যাওয়ায় বড় জোর এক দেড় ঘণ্টা লাগে। নৌকায় মজাই লাগে। পাংশা আমাদের নিজ থানা হলেও যাতায়াতে নৌকাতেই আরাম। পাকিস্তান আমলে সাতবাড়িয়া থেকে এক ধোপা এপারে কাপড় নিতে আসতো। আমিও মাঝে মধ্যে ধোপার কাছে কাপড় দিতাম। তাছাড়া সাতবাড়িয়ায় কালী কংকর সাহা নামে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আমাদের বাড়ির সবার কাছে সম্মানিত হতেন। উনি আমাকেও চিকিৎসা করেছেন। কী রোগের চিকিৎসা তা আজ আর ভালো করে মনে নেই। তবে আমার চাচীর চিকিৎসায় তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর রোগটা ছিল ফোলা। রোগী না দেখে সিমটোম শুনে ওষুধ দিলেন আর ভালো হয়ে গেল। এই জন্যই দাদু তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন। একবার তিনি নৌকায় আমাদের বাড়িতেও এসেছিলেন, মানে তাকে আনা হয়েছিল।

আমি তাকে দেখেছি তবে আজ আর চেহারাটা মনে নেই। শুধু মনে আছে

উনি ধূতি পাঞ্জাবি পরতেন। একজন সজ্জন ভদ্রলোক মনে হতো আমার কাছে। তার ডাক্তারির ছাপ, তার ব্যবহার আমার মনের উপর ভালোভাবেই দাগ কেটেছিল। তাই এতো কথা বলা।

১২ মে, ১৯৭১। ঘুম ভাঙলো প্রচণ্ড গুলি গোলার শব্দে। এক দৌড়ে নদীর পাড়ে গিয়ে দেখি আমার আগেই গ্রামের প্রায় সবলোক জড়ো হয়েছে। গুলির রকম নানা প্রকারের কখনও ঠুসঠাস, কখনও একটানা। আবার বুম করে শব্দ হয়ে আকাশ বাতাস কাঁপাচ্ছে। আমরা সবাই বুঝলাম পাকবাহিনী অপারেশন চালাচ্ছে। আগুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উর্দ্ধমুখী হচ্ছে। আমার মনে হল নদী না থাকলে ওরা এপারে চলে আসতো। পথ তো বেশি নয়। নারী-পুরুষে নদীর পাড় ভরা। আমি ও আমার সঙ্গী সাথিরা সবাই এক সাথে ওপারমুখী হয়ে রইলাম। বেলা দুপুর হয়ে গেলে আওয়াজ কমে আসতে লাগলো। আগুন থামলো না। আমরা দুপুরের খাওয়া খেয়ে আবার বসে গেলাম। নদী পাড়ের মানুষজনও চলে গেল। থাকলাম আমি, সেকেন পুলিশ, মাজেদ, (গুদানের ভাই) মন্টু, ও সাহা খাঁ।

আরও কেউ কেউ থাকলেও থাকতে পারে আজ আর তা মনে নেই। মাজেদ প্রয়াত। সাহা খাঁ শয্যাশায়ী। মন্টুও প্রায় তাই। সেকেন পুলিশও প্রায় বিছানা ধরা। একটু ভালো আছি আমি। মোটামুটি চলাফেরা করতে পারি। নানা অসুখের সঙ্গে ফাইট দিয়ে বয়সটা ধরে রেখেছি। মাজেদকে ভাই বলেই ডাকতাম। প্রাইমারি সহপাঠি হলেও বয়সে একটু বড়। ও বলে উঠলো, চল্ ওপারে গিয়ে দেখে আসি। সবাই একপায়ে খাড়া এই ব্যাপারে। খুঁজে খুঁজে দেখি নদীর পাড়ির নীচে আফসার বিশ্বাসের বোট খুঁটার সাথে বাঁধা আছে। আফসারকে সবাই ডাকে নাহু আফসার বলে। বৈঠা নাই শুধু একখান কাস্তি আছে। সবাই দক্ষিণমুখো হয়ে-ক্ষেত খামারের বেড়া দেওয়া বাঁশের খুটো নিয়ে এলো বৈঠা বানানোর জন্য। বানিয়েও ফেললো, আমাদের চেয়ে বৈঠার সংখ্যা বেশিই হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধতো শুরু হয়েছে আগেই। এই যুদ্ধ ইতিমধ্যে বাঙালিদের অনেক করিৎকর্মা বানিয়ে ফেলেছে। হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়েই এরা সমস্যার সমাধান করতে পারে। কোন অপেক্ষা নেই। কারো উপদেশ, আদেশেরও দরকার নেই। এরা নির্দেশ পেয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণের মধ্য দিয়ে।

যাহোক সূর্য ডোবার আরও ঘণ্টা খানেক বাকি আছে সবাই বোটে উঠে গেলাম। আমি বললাম, সন্ধ্যার আবছা আলোতে আমরা ওপারে উঠবো।

ইতোমধ্যে খবর পেয়েছি আমাদের গ্রামের আতাই ভাই, ময়েন খাঁ, রসেন আরো কে কে যেন ওপারে রাত থাকতে গুড় নিয়ে গেছে বেচতে। ওরা যায় সাতবাড়িয়া বাজারে। বাজার সকালে বসে। দুপুরের আগেই শেষ। জোরে টেনে ওপারে নদীর পাড় থেকে মোটামুটি দূরে বোটখানা থামালাম। আর একটু আলো কমুক। আঁধার না নামতেই পাড়ে বোট রাখলাম। বাঁধলাম না। সবাই মিলে বোট ডাঙায় তুলে উপুড় করে রাখলাম আর বাঁশের বৈঠাগুলি নৌকা থেকে একটু পাড়ের আড়ালে রেখে দিলাম। পাড় খুব উঁচু। পাড়ের গাঁ ঘেষে দাঁড়ালে উপর থেকে কিছুই দেখা যায় না। গায়ে কোন গুলিও লাগবে না। খাজকাটা পথ বেয়ে আমরা ক'জন পাড়ের উপরে উঠলাম। উঠেই যা চোখে পড়লো তা বর্ণনার নয়। সারিসারি লাশ। বুঝলাম এদেরকে লাইন করে গুলি করা হয়েছে। বাজারের রাস্তার দিকে এগুলাম। সব গর্তে লাশ। নারী-পুরুষ-শিশু। ওদের বললাম, আমার সাথে থাকিস। বাজারে না গিয়ে ডাক্তার কালী কঙ্করের বাড়ির দিকে হাঁটলাম। যেখানে গর্ত সেখানেই লাশ। সন্ধ্যা ঘোর। ডাক্তারের বাড়ির রাস্তার দু'পাশেই লাশ। গিয়ে দেখলাম ঘরের সব দরজা খোলা। পাক ঘরের সামনে এক মহিলার লাশ পড়ে আছে। চিনলাম না। ডাক্তার বাবুর লাশ কোথাও পেলাম না। এমন সময় সেকেন বললো, বাপু, লাশের ব্যাগে, টাকা আর সোনাদানা। কি করবো নিয়ে নিই ? আমি শিক্ষিত মানুষ। ওরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। ওদের জিনিস আমরা লুট করবো? আমরা কি লুটেরা? পাকি আর রাজাকাররা যা যা করেছে আমরাও কি তাই করবো? তাহলে ফারাকটা কোথায়? গর্জে উঠে বললাম, একদম না। ওরা আমাদের বাবা, মা, ভাই বোন। ওদের ছুঁয়ো না, যে ছোঁবে তাকে আমি শেষ করে দেবো। লাশ দেখে সবাই আমরা ভীত হয়ে পড়েছি। ওদেরকে বললাম, আর থাকা ঠিক হবে না। আজ মনে পড়ে সেদিন যদি একটা ক্যামেরা থাকতো? যে ছবি তুলতাম তা সারা বিশ্বে তোলপাড় তুলতো। গর্তে গর্তে ওরা পড়ে আছে। বাতাসে ওদের জামা-কাপড় উড়ছে। শাড়ি উড়ছে, মাথার চুল উড়ছে। আমরা দেখতে দেখতে ঘাটে ফিরছি। থমকে দাঁড়ালাম।

মনে হলো প্রত্যেকটি মৃতদেহ বাংলাদেশের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে গেছে। গাইছে, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' আমার শরীরে কাঁপন ধরে গেল। চোখ বন্ধ করে ফেললাম। হঠাৎ দূরে অনেক মানুষের হই হই শুনতে পেলাম। মাজেদ ভাই বললো, তাড়াতাড়ি নিচে নাম। ওরা লুট করতে আসছে। আমাদের পেলে মেরে ফেলবে। বাঁশের বৈঠা সবাই

হাতে নিয়ে বোটটা পানিতে ভাসালাম। জোরে টান দিলাম। একটানে মধ্য গাঙে। নদী ভরা। মে মাসের গরম। শিরশির বাতাসে আরামবোধ করলাম। পদ্মার পানিতে হাত মুখ ধুয়ে বিড়ি ধরালাম সবাই। আমরা নিরাপদে। ঘাটে পৌঁছে দেখি, আমাদের কাছে ঘটনা শুনার জন্য নদীর পাড়ে লোকে লোকারণ্য। বোট বেঁধে আমরা সবাই ডাঙায় উঠলাম। জনতা আমাদের ঘিরে ধরলো। সাহা খাঁ, মাজেদ ভাই বলা শুরু করলো। আমি টুক্ করে কেটে পড়ে বাড়ি চলে এলাম। সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। কোথাও বেরও হলাম না। যদিও রাতের খাবার খাওয়ার পরে বের হওয়া আমার অভ্যেস। সকাল বেলা আবার নদীর ঘাটে। শুনলাম আতাই গংরা এখনও ফেরে নাই। বারবার ঘর-বাহির করতে থাকলাম। দুপুরে খবর পেলাম ওরা সবাই ফিরেছে। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচলো। কারো কোনো ক্ষতি হয় নাই। ঐ গণহত্যার দৃশ্য আমার মনকে তাতিয়ে দিল। এমন তাতানো তাতালো যে ঘর সংসার তিতে হয়ে গেল। আমার সিনিয়রদের বললাম, চলো ভারতে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেই। ওরা হাঁ, না কিছুই বলে না। খায়দায় আর তাস পিটায়। পরে আমি সাহা খাঁ, হোসেন, মন্টু, ইন্তাজ গ্রুপ বেঁধে দেশ ছাড়লাম যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য।

পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে নিরীহ বাঙ্গালীর নৃশংস গণহত্যা

সাতবাড়িয়া গণহত্যা সোবহানের কর্ম। যা আমাকে উজ্জীবিত করেছিল যুদ্ধে যোগ দিতে। ঐ গণহত্যা কত তারিখে ঘটেছিল আমার মনে ছিল না। ১ জানুয়ারি, ২০১৪ প্রকাশিত মাওলানা আবদুস সোবাহানের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের গঠিত চার্জগুলো থেকে জানলাম ঐ তারিখ ছিল ১২ মে, ১৯৭১। দিনটা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় নৃশংস গণহত্যার দৃশ্য। সোবাহানের ফাঁসি দেখার প্রতীক্ষায় থাকলাম। দেখে যেতে পারলে জন্ম ও মৃত্যু আমার স্বার্থক হবে। ওপারে গিয়ে মাজেদ ভাই আর সাহা খাঁকে বলতে পারবো আমি দেখে এসেছি। আয় এবার একসাথে বসি।

মুক্তিযোদ্ধা সাহা খাঁ ও আমরা ক'জন

লোকটা কৈশোর কাল থেকে ৩০ জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত আমার সাথী ছিল। খেলার সাথী, মেলার সাথী, গানের সাথী আম কুড়ানোর সাথী, মাছ ধরার সাথী, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দার সাথী। ১৯৭১-এসে আমার মুক্তিযুদ্ধের সাথী হয়ে গেল। কৈশোর থেকেই আমার মনের উপর তার প্রভাব ভালোভাবেই পড়েছিল-যা আজো জ্বলজ্বল করে। কেন তাকে আমি এতো মানে রাখি, কেন তার অনুপস্থিতি আমাকে কষ্ট দেয়, চোখে পানি আসে? কারণ সেই কৈশোরের অকৃত্রিম ভালোবাসা। এই অকৃত্রিম ভালোবাসা ৬০ বছর ধরে মনের গভীরে সজীব রেখেছিল তাকে। যদিও আমাদের কৈশোরের, যৌবনের ও প্রৌঢ়ের চলার পথ ছিল আলাদা। সে মাঠে কাজ করতো। আমি স্কুলে যেতাম। আমি কলেজে পড়তাম। সে ছোট ছোট ব্যবসা করতো। আমার মাথার উপরে নিরাপদ ছাদ ছিল। তার ছিল না। এতো আলাদা আলাদা অবস্থান সত্ত্বেও আমরা একই পথে হাঁটতাম। একই পথে হাটে বাজারে যেতাম। একই বাতাস আমাদের গায়ে লাগতো। একই আলো-ছায়া আমাদের ঘিরে থাকতো। এসব আমরা একসাথে ভোগ করতাম। সুখের সময়ে দুখের সময়েও। যখন গ্রামে থাকতাম তখন দিনে তাকে পেতাম না। রাতে পেতাম। আবার দেখতাম ৪/৫ দিন উধাও। বলতো, মটকা নিয়ে নানা জেলায়, নানা গ্রামে ঘুরি। সাথে থাকে হাবাসপুরের ধীরেণ সাহা। ওর কাছ থেকেই এই ব্যবসা সে রপ্ত করেছে। আরো বলতো, ভালোই চলে। তার চলা ফেরায় দেখতাম পরিবর্তন এসেছে। খুশিই হতাম। আমি কলেজ ঘুরে বাহাদুরপুর হাইস্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলাম। দেখতে দেখতে ১৯৭০ এর নির্বাচন এসে গেল। যেখানেই বঙ্গবন্ধুর মিটিং সেখানেই আমরা। তার মটকা বেচা সেইসময় লাটে উঠতো। আমরা বের হলে মুড়ি চিড়া নিয়ে বের হতাম। আমাদের কোন টাকা পয়সা ছিল না। বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠতাম। নির্বাচনে আমরা দুজন ছাড়াও সবাই কোমর বেঁধে লাগলাম। ওরা অতো বুঝতো না। বুঝতে চাইতো না। কেন আমরা নির্বাচনে আওয়ামীলীগের পিছনে খাটছি। বঙ্গবন্ধু

দিনে দিনে উজ্জ্বল হয়ে গেছেন। গ্রামে গঞ্জে আনাচে কানাচে তাঁর নাম মুখে মুখে ফিরছে। নির্বাচন শেষ। আওয়ামীলীগ ২টা আসন বাদে সবটি আসন পেলো। সে আবার বেরিয়ে পড়লো তার ব্যবসায়। এবার বেশিদিন বাইরে থাকতে লাগলো। ফিরলেই আমরা একসাথে মেতে উঠতাম। তার গল্পে বোঝা যেতো যশোর, পাবনা, কুষ্টিয়া জেলা সব তার মুখস্ত। কোন্ নদী কোথায় তাও। বিশেষ করে ছোট ছোট নদী। সীমান্তের গ্রামগুলোর উপর ছিল তার বিশেষ জ্ঞান। সীমান্তের ওপারে কোন্ কোন্ গ্রাম তাও ছিল তার মুখস্ত। আমি লেখাপড়া জানলেও অতো ছোট ছোট জায়গার ধারণা আমার মাথায় ছিল না। আমার অনেক সময় মনে হতো সে ওপারে যায়। এমন কিছু মালামাল আনে যার এদেশে ভালো ব্যবসা আছে।

ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান তালবাহানা শুরু করায় পূর্ব বাংলা উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। এর আঁচ বাংলার আনাচে কানাচে ঢেউ তুলছিল। সেই ঢেউ আমাদের গায়েও লাগলো। আমরা কেমন যেন হয়ে গেলাম। সারাদেশ উত্তাল। সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুখের দিকে তাকিয়ে। আলোচনার কথা বলে ইয়াহিয়া সরকার কালক্ষেপণ শুরু করলো, আর আড়ালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আকাশ পথে সৈন্য, জাহাজে গোলাবারুদ আনতে লাগলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এসব জানা সত্ত্বেও

৭ই মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ।

হঠকারি কোন সিদ্ধান্ত নিলেন না। ঘোষণা এলো, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেবেন। গোটা বাঙালি জাতির চোখ শেখের দিকে। সেই ৭ই মার্চ এলো। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম..।

আমরা যারা সামনে ও পিছন নিয়ে নাড়াচাড়া করি। তারা দেখলাম, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছেন। তবে একটু কায়দা করে।

আবার সময় দ্রুত গতিতে গড়াতে গড়াতে এসে গেল ২৫ মার্চ, ১৯৭১। পাক বাহিনী নিরীহ বাঙালির উপর ঐ রাতে ঝাপিয়ে পড়লো। রেডিও পাকিস্তান ঢাকায় ইসলামী গান বাজাতে লাগলো। ঐ রাতেই বাঙালি রুখে দাঁড়ালো। সে কি রোখা! ২৭ মার্চ সকালে সিরাজ মন্ডলের রেডিওতে মেজর জিয়ার ভাষণ নিজ কানে শুনলাম। 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আমি মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।' আমরা আরো উজ্জীবিত হলাম। হয়ে গেলাম বোমার মতো। কিছু বাঙালি বাদে সব বাঙালি হয়ে গেল এক একটি তাজা বোমা। শেখ মুজিব সেসময় সকল বাঙালির চোখের মণি হয়ে গেছে। মুজিব কোথায় ? সবারই এক কথা মুজিব কোথায় ? আমাদেরও কথা মুজিব কোথায়? পাকিস্তানের রেডিও আমরা বিশ্বাস করলাম না। বিবিসি, ভয়েস আব আমেরিকা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলকাতা বেতার কেন্দ্র আমাদের খবর জোগাতো।

এতোক্ষণ যে লোকটার নাম উহ্য রেখে লিখে চলছিলাম তার নাম এবার বলতে হল। সে আমাদের সাহা খাঁ। সাহাদত হোসেন খান। এখন তাকে সামনে না নিয়ে আসলে লেখা আর চলবে না। সাহা খাঁর মটকা ফেরি বেড়ে গেল। সে ফেরির মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করতো। আমাদের রাতে বলতো। কোথাও আজ গোলাগুলি হয়েছে। রাজবাড়ী, পাবনা, কুষ্টিয়ার অবস্থা কি এসব খবর তার কাছ থেকে আমরা পেতাম। ঘটনা দ্রুত গড়িয়ে চললো। মুজিব নগর সরকার গঠন হলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খুললো। সেখান থেকে সব খবর আমরা পেতে লাগলাম। দলে দলে লোক দেশ ছাড়ছে। নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে। কী হিন্দু, কী মুসলমান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার আহবান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসতে লাগলো। সাহা খাঁ আমাকে দেশ ছাড়ার জন্য খোঁচাতে শুরু করলো। তার ব্যবসা বন্ধ প্রায়।

মটকা আর চলে না। মানুষ জানমাল সামলাতে ব্যস্ত।

আমি গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের সাথে আলাপ করলাম। না সাড়া পেলাম না। দোটানা ভাব। যখন ইয়াহিয়া সরকার চাকরিজীবীদের চাকরিতে যোগদান করতে বললো, তারা সুড়সুড় করে যে যে পথে পারে ঢাকা চলে গেল। যোগ দিয়েই ডান্টি কার্ড করে ফেললো। ব্যাস এবার আর ভয় নেই। আমি বেকুব বনে গেলাম। আমার এমপিএ ও স্যার মোসলেম উদ্দিন মৃধা গোপনে ভারতে চলে গেলেন। বাহাদুরপুর ইউনিয়নের শত শত যুবক বুঝলো না তাদের কী করতে হবে? কিন্তু আমরা কয়েকজন বুঝে ফেললাম। সাহা খাঁর কথা, 'অতো ভেবে কী হবে, চলো তো বাপু, আজ রাতেই কেটে পড়ি।' ইতোমধ্যে এলাকায় গেরস্থের বাড়িতে ডাকাতি শুরু হয়ে গেছে। এখবর সাহা খাঁ আমাকে দিল। কারা জড়িত তাদের নামও বললো। আমি শুনে হতবাক! এরা এই কাজ করছে? সবাই আমার চেনাজানা, সখ্যও ভালো। আমি একদিন একজনকে টোকা দিলাম। সে জবাবে আমাকে তাদের ঐ দলে আহ্বান জানালো। এও বললো, বেশি খোচাখুচি করো না, করলে জীবন বাঁচবে না। আমি এটাকে থ্রেট হিসাবে নিলাম। কিন্তু গা বাঁচিয়ে চলতে লাগলাম। সাহা খাঁ-ই আমাকে জানালো, তোমার খোঁজাখুঁজিতে ওরা তোমার উপর ক্ষেপে আছে। চলো, আমরা ভারতে চলে যাই। আমি তো ভয় পেলামই না, সাহস বেড়ে গেল। শরণার্থীদের লুটপাট শুরু হোল। হিন্দু বাড়িতে প্রতি রাতে কিছু না কিছু ঘটবেই। কুষ্টিয়ায় পুলিশ ও ইপিআর এর সাথে যুদ্ধে পাক বাহিনীর পরাজয় ঘটলে আমার ঘরের পাশে সেকেন পুলিশ একটা রাইফেল ও এক ব্যাগ গুলি নিয়ে রাতের গভীরে বাড়িতে এসেই আমাকে ডেকে তুলে সব জানালো। ও সব আমাকে দেখালো। আল্লার কাছ থেকে ঐ পুলিশ আমার জন্য রহমত হয়ে এলো। বললাম, সকাল হলে তোমাকে সবাই ধরবে ঘটনা জানার জন্য। ঘটনা বলবে, রাইফেল ও গুলির কথা বলো না। তাহলে তোমারসহ গ্রামের সবার বিপদ হয়ে যাবে। সে আমার কথা মতো কাজ করলো। পরদিন আমি আর সেকেন গভীর রাতে খোলা মাঠে বৈঠকে বসলাম। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হল, রাইফেল নিজ বাড়িতে রাখা যাবে না, রাইফেল গুলি পৃথক পৃথক রাখতে হবে। এমনভাবে রাখতে হবে যাতে সহজেই

হাতের কাছে পাই। গুলি আমার দায়িত্বে নিয়ে নিলাম। আর রাইফেল দু'জনার জানা মতে এক জায়গায় পুঁতে ফেললাম। সারাদিন রাইফেল চোখে চোখে রাখতাম। রাতে তুলে পরীক্ষা করতাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি এ অস্ত্র আমার আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে। সেকেনও টের পাবে না, আমি কী করছি? আমি জানতাম ও গরীব মানুষ। টাকাও দরকার। টাকার বিনিময়ে রাইফেলটা সে ডাকাতের কাছে বিক্রি করে দিতে পারে। ইতোমধ্যে রাতে রাইফেলটা কয়েকবার তুলে ওর কাছ থেকে চালানো শিখে ফেলেছি। বুঝে ফেলেছি ম্যাগাজিন ও গুলি ছাড়া রাইফেলের কোন দাম নেই। একটা লাঠি মাত্র। ম্যাগাজিন ও গুলি আমার কবজায় নিয়ে নিলাম। সেকেন পুলিশের পিছনে প্রতি রাতে দু'চার টাকা খরচ করি। ভয় দেখিয়ে বললাম, তুমি সরকারি অস্ত্রধারী লোক ছিলে কেউ যদি পাংশায় মিলিটারি ক্যাম্পে খবর দেয় তোমার কাছে অস্ত্র আছে, গুলি আছে, তাহলে তোমাকে তো মারবেই, সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে। তাই তোমাকে সবার সাথে মেশা যাবে না আর বাড়িতে থাকা যাবে না। হয় ভারতে না হয় ইয়াহিয়া সরকারে। পুলিশ আমার কথা বুঝলো। বললাম, মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়াই উত্তম। চলো যাই। চাইলেই কি পা বাড়ানো যায়? আমার আর সেকেন পুলিশের হঠাৎ গলাগলিতে সাহা খাঁর মনটা কেমন কেমন করতে লাগলো। কী নিয়ে আমরা ফিসফিসাই ? তাকে আগের মতো সঙ্গ দিই না, বরং এড়িয়ে চলি। কেন এসব করি ? সে আমাদের পিছু লাগলো। সেকেন পুলিশ ওকে বোকা ভাবে, তাই পাত্তা দেয় না। আমিও জানি ওকে বেশিদিন এড়িয়ে চলা যাবে না, কোন একসময় ওকে আমাদের দরকার হবে।

একদিন বাড়ির সামনে পূবের মাঠে খেতের আল দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি। এমন সময় বকসিপুরের অনিল ডাক্তার মাঠ আড়াআড়ি হেঁটে আমার কাছে এলো। ওনাকে আমি ছোটবেলা থেকে কাকা বলে ডাকতাম। আমার কাকা পিয়ার আলী মোল্লা হাবাসপুর হাইস্কুলে ওনার সহপাঠী ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন আমাদের পারিবারিক ডাক্তার। ছোটখাটো রোগ-ব্যারামে আমার দাদা বাপেরা তাকেই ডাকতো। মধুর ব্যবহারের মানুষ। চোখ উঁচু করতে জানতেন না, আমাদের ও বাজান ছাড়া কথা বলতেন না। আমাদের তথা পাড়ার সবার কাছে পূজনীয় ছিলেন। টাকা পয়সা দিলেই যে রোগী

দেখতেন তা নয়। তাঁর কাছে জাত পাতের বালাই দেখিনি। মিষ্ট ও মৃদুভাষী মানুষ। বললেন, বাবা আজ আর রেহাই নেই। সামনে পূবের গ্রাম বকসিপুরে ওনার বাড়ি। ও পাড়ায় প্রায়ই ছোটখাটো চুরি হতো, ডাকাতিও হতো। আমি আর সাহা খাঁ জানতাম কারা এসব করতো। কাকার মুখটা প্রচণ্ড বিমর্ষ। কাঁদো কাঁদো সুরে কথা বলছিলেন। বলছিলেন, টাকা পয়সা তো পাবে না। বাড়ির বউ ঝিদের নিয়ে ভয়। এদের উপর অত্যাচার হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কেমনে বুঝলেন আজ রেহাই নাই?' তিনি বললেন, 'বাড়ির চারপাশে এমন কিছু লোককে ঘুরাঘুরি করতে দেখেছি তাতেই মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে।' তিনি ভয়ে নাম বলতে চাইলেন না। বললেনও না। কিন্তু আমি বুঝে গেলাম। ঠাস করে বলে ফেললাম, আপনারা আজ বাড়িতেই থাকবেন। কিছু ঘটলে আমি দেখবো। আমার মুখের দিকে তিনি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। বললাম, কাজ থাকলে কাজ সেরে বাড়ি চলে যান। রাতে বাড়ির বাইরে বেরুবেন না। কাকা চলে গেলেন।

সেকেন পুলিশকে ডেকে নিয়ে সব কথা বলতে বলতে বকসীপুর ডাক্তারের বাড়ির কাছে চলে গেলাম। বাড়ির চারপাশ আমরাও ঘুরলাম। রাতে কোথায় আমরা থাকবো। লুটেরা কোন পথ দিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকতে পারে তাও নীরিক্ষা করলাম। আরো ঠিক করলাম সাহা খাঁকে সাথে নিবো। বিকেলেই সাহা খাঁকে পেয়ে বললাম, রাতে আমার সাথে এক জায়গায় যেতে হবে। সাথে লাঠি থাকবে। বললাম, সেকেন পুলিশও থাকবে। আর কিছু বললাম না। ঐ সময় গ্রামের মানুষ সন্ধ্যার পরপরই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তো। না হয় রেডিওর সামনে বসে খবর শুনতো। যতক্ষণ খবর ততক্ষণ ওরা আছে। কোথাও রেডিও নেই। ধোনাই মণ্ডলের বাড়িতেই বসতো আড্ডা ও আসর। গ্রামের রাত দশটা মানে গভীর রাত। তারপর আবার আঁধার রাত। এসব এলাকা আমার আর সাহা খাঁর এত বেশি চেনা যে চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও গন্তব্যে পৌঁছে যাবো।

এবার আমরা তিনজন ঐ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলাম। সাহা খাঁর ভয় আমরা তিনজন কি কিছু করতে পারবো? ওদের কাছে অস্ত্র আছে, সংখ্যায়ও বেশি। আমি বললাম ভয় নেই। যা হবার হবে। পুলিশকে বললাম, তুমি খাঁকে নিয়ে অমুক জায়গায় থাকবা। আমি দশ মিনিট পরে তোমাদের সাথে মিলবো। কোন বিড়ি খাওয়া চলবে না, টর্চ থাকবে না।

মুখ থাকবে গামছা দিয়ে বাঁধা। লুঙ্গি কাছা মারা। সেকেনকে বললাম, অস্ত্র নিয়ে আমি পৌঁছে যাবো। এখনই আমরা সাহা খাঁকে অস্ত্রের ব্যাপারে কিছু বলবো না। তুমিও কিছু বলো না, যা বলার আমি বলবো। রাত ৯ টা পর্যন্ত ধোনাই মণ্ডলের রেডিওর পাশে আমরা ছিলাম। তারপর তিনজন উঠে চলে গেলাম। বললাম, নাম ধরে ডাকা চলবে না। সবাই সবাইকে মুক্তি বলে ডাকবো। মুক্তি বললেই বুঝবো আমাদের কেউ। রওনা হওয়ার আগে আমাদের সিগারেট বিড়ি ম্যাচ রেখে গেলাম। ফিরে আমরা কোথায় বসবো কেমন করে বাড়ি যাবো তাও ঠিক করে ফেললাম। বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা ঝোপে পানি ভর্তি তিনটি বদনা রেখে গেলাম। হাতে বদনা দেখলে সবাই ভাববে পায়খানা করতে বেরিয়ে ছিল। ওরা চলে গেল। মিনিট বিশেক পরে আমি রাইফেল আর দশ রাউন্ড গুলিসহ ওদের কাছে হাজির হলাম। সেকেনকে বললাম, রাইফেল আমি চালাবো। তোমরা লাঠি হাতে আমার দু'পাশে থাকবে। আমাদের জায়গায় তিনজন চোখকান খোলা রেখে বসে আছি। আবার মাঝে মাঝে শুয়েও থাকি। রাত দেড়টার সময় আমরা তিনজন টের পেলাম কিছু লোক তিন দলে অনিল কাকার বাড়ির সামনে গেল। ওদের সংখ্যা বেশি হবে না। বড় জোর ৮/১০ জন। একদল বাড়িতে ঢুকেই ধড়াম ধড়াম বেড়ায় বাড়ি দরজায় লাথি শুরু করলো। আর কয়েকজন বাইরে পাহারায় মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল পুলিশকে দিয়ে বললাম, পরপর তিন রাউন্ড। প্রথম রাউন্ড পশ্চিম দিক থেকে। ২য় রাউন্ড উত্তর দিক থেকে। ৩য় রাউন্ডও উত্তর দিক থেকে। গুলি যেন বাড়ির উপর দিয়ে যায়। চোখের পলকে সেকেন পুলিশ ১ম রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে দিল। দৌড়ে বাড়ির উত্তর পাশে চলে এসেই ২য় রাউন্ড ছুঁড়লো। রাইফেলের গুলির আওয়াজে রাতের আঁধার খানখান করে ভেঙে পড়লো। আশে পাশের গ্রাম রাতের আঁধারে শুনলো থ্রি নট থ্রি রাইফেলের বিকট হুঙ্কার। অনিল ডাক্তারের বাড়িতে আর কোন শব্দ নাই। কোন কান্নাকাটি নাই। ডাকাডাকি নাই, কোন আলো নাই। মনে হল কোন বাতাসও বইছে না। ভোরের আজান পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমরা পরামর্শ মতো কেটে পড়লাম। যথাস্থানে রাইফেল রেখে বদনা হাতে দাঁত মাজতে মাজতে বাড়ি ঢুকলাম। বুঝলাম তিন চার গ্রামের মানুষ ভোর হওয়ার প্রহর গুনছে, কখন রাত পোহাবে? কখন ঘটনাস্থলে গিয়ে আসল খবর পাবে? আমরাও খবর নিতে বের হয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি বকসীপুর গ্রামে এক হই হই ব্যাপার, মানুষ

গিজগিজ করছে।

আমাদের বাড়ি থেকে আড়াআড়ি (পূর্ব দক্ষিণ কোণে) অনিল কাকার বাড়ি যাওয়া যায়। বর্ষা ঋতু ছাড়া বিশেষ করে শুকনা ও শীতে আমরা ওদিকে আড়াআড়ি যাতায়াত করি। ঘুরাঘুরির ধার ধারি না। অতো মানুষের ভিড়ে কাকে কী জিগাই তাল করতে পারলাম না। সবার মুখে এক কথা ডাকাত পড়েছিল। কিছু করতে পারে নাই। কেউ কেউ বললো, ডাকাতে ডাকাতে গুলাগুলি। দুই পক্ষে লোক প্রায় ৪০ জন। পায়ে পায়ে অনিল কাকার তেঁতুলগাছ তলায় গেলাম। বাড়ি ভর্তি মানুষ ইচ্ছে করেই ভিতরে গেলাম না। আমরা কয়েকজন ঐ বাড়ির চারপাশ ঘুরে এক জায়গায় দাঁড়ালাম যেখান থেকে আমরা ১ম রাউন্ড গুলি ছুঁড়ি। দেখি রাইফেলের গুলির খোসা পড়ে আছে। ঐটাই আমি খুঁজছিলাম সবার অলক্ষ্যে খোসার উপর চড়ে দাঁড়ালাম, পা দিয়েই মাটি চাপা দিলাম। আমার সাথীরা খেয়ালও করলো না। জমিতে লাঙল দেওয়ায় সময় কেউ পেয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ-এর ধারণা ডাকাতে ডাকাতে গুলাগুলি। এবার আমরা রাতে আবার তিনজন বসলাম। আমি বললাম, এবার আসল ডাকাতরা খুঁজবে এ ডাকাতরা কারা? এরা কোথাকার। আমি বললাম, হাতে কিছু লিফলেট লিখে বাজারে বাজারে লাগিয়ে দেই। লিফলেটে লেখা থাকবে 'মুক্তি এসে গেছে চোর ডাকাত লুটেরা সাবধান।' হাবাসপুর, বাহাদুরপুর, সেনগ্রাম বাজারে কয়েকটা চোখে লাগে এমন দোকানের বেড়ায় লাগালেই হবে। বললাম, আমার ঘরেই কাগজ আছে। কালিও আছে। রাত ১০ টার মধ্যে সেকেন পুলিশের ঘরের দরজা দিয়ে চেরাগ জ্বালিয়ে ৮/১০টা পোস্টার লিখে ফেললাম। আমাদের সাহা জিগের আঠা নিয়ে এলো। মটকার ঝুড়ির নীচে ফেলে সাহা খাঁ রাত অনুমান ১১টায় হাবাসপুর বাজারে রওনা দিল। এই তিন জায়গায় পোস্টার লাগানো দায়িত্ব তার। ও ফেরিওয়ালা, লেখাপড়াও জানে না। ওকে কেউ সন্দেহ করবে না। আমরা ঘুমোতে গেলাম, সাহা খাঁ কাজ শেষে কখন ঘরে ফিরেছে তা জানিনে। সকালে দেখাও করে নাই। এভাবেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের পথে পা বাড়ালাম। আর পিছনে তাকালাম না। গ্রামের মানুষ সকাল সকাল শুয়ে পড়ে, ওঠে আবার খুব ভোরে।

বেলা ৮টা বাজতে না বাজতেই রাস্তায় গিয়ে দেখি মানুষ জটলা পাকাচ্ছে

আর কথার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে, শুন হে মাস্টের সারা পাংশা থানায় পোস্টারে ছেয়ে গেছে। মুক্তি এসে গেছে। এলাম তারাপুর সেখানেও ঐ অবস্থা। এলাম বাহাদুরপুর সেখানেও তাই। মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আমার মনে হল মানুষ শান্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। মানুষের ভাঙা মনে শক্তি এসে গেছে। যে যা পারে তাই নিয়েই মুক্তিদের সাথে যোগ দিয়ে দেশটাকে মুক্ত করে ফেলবে। কোথায় তারা ? কেউ পরম আদর দিয়ে পোস্টারের গায়ে হাত লাগাতে গিয়ে জিগের আঠা হাতে লেগে গেছে। কেউ ছিড়ছে না। যারা মাতব্বর টাইপের তারা ঘোষণা করছে, খবরদার পোলাপান, পোস্টার ছিড়বিনে। পোস্টার ছিঁড়লে তার খবর আছে। পরাণ ভরে তাকিয়ে কয়েকটা পোস্টার দেখলাম। সাহা খাঁ নিখুঁতভাবে কাজ করেছে। মনে মনে ওকে ধন্যবাদ দিলাম।

সন্ধ্যায় ধোনাই মন্ডলের বাড়িতে আবার একসাথে হলাম। যারা হাবাসপুর গিয়েছিল, তারা বলছে সেখানকার কথা। যারা সেনগ্রাম তারা বলছে সেনগ্রামেরটা। সবাই পাল্লা দিচ্ছে কোথায় কোনটা জমেছে ভালো। একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম। কেউ বললো না মুক্তিটুক্তি আসে নাই। পোস্টার দিয়ে কেউ দুষ্টুমি করেছে। এবার সবাই ধরে নিল অনিল কাকার বাড়ির গুলাগুলি মুক্তি আর ডাকাতদের মধ্যে ঘটেছে। আমরা ঠোঁটে ক্লুপ মেরে বসে আছি। খাই দাই তাস খেলি। না কোথাও ডাকাতি হচ্ছে না। সারা এলাকায় রাতে শান্তি নেমে এসেছে। ডাকাতের ভয় গেছে এবার মিলিটারির ভয়। এই যে মুক্তিরা মানুষের আদরের হয়ে গেল সে আদর বাড়তেই লাগলো। সবাই বলে কোথায় ওরা? ওরা মিশে আছে বাতাসে গন্ধ হয়ে। মিশে আছে আঁধারে কৃষ্ণ হয়ে।

এমনিভাবে সপ্তাহ পার করলাম। আবার তিনজন বসলাম। ওদের বললাম, এভাবে থাকা যাবে না। সত্যিকার মুক্তিবাহিনী এসে গেলে, ওই পোস্টার লাগানো মুক্তিবাহিনী খুঁজবে। যদি কোনভাবে জানতে পারে আমাদের রাইফেল আছে তাহলে অতীতের সকল ডাকাতের দায়ভার আমাদের উপর বর্তাবে। ওরা আমাদের রেহাই দেবে না। চলো কেটে পড়ি। সেকেন পুলিশ আমতা আমতা করতে লাগলো। আমি বুঝলাম ওর যাওয়ার ইচ্ছা নাই। দেশ ছাড়ার জন্য গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের বললাম। দেখি না কী হয়, এই হলো ওদের কথা। আমার পাঠশালার

সহপাঠি মন্টু জানতেই একপায়ে খাড়া হয়ে গেল। ইতোমধ্যে হোসেন মোল্লা যোগ দিল। যাওয়ার একদিন আগে কৃষ্ণপুরের ইন্তাজ যোগ দিল। আমরা পাঁচজন হয়ে গেলাম। রাইফেলটা এমন এক জায়গায় রেখে গেলাম যা সেকেন পুলিশের নাগালের বাইরে। আমাদের যাওয়ায় খবরটা সেকেনকে জানালামও না। ও ভাবছে আমরা যতই যাওয়া যাওয়া করি শেষমেষ যাওয়া হবে না।

আমাদের দেশত্যাগের কিছুদিন আগে থেকেই সেকেন পুলিশ আমার কাছে রাইফেল-রাইফেল করতো। সাহা খাঁই বুদ্ধি দিল ওকে ওটা আর দেওয়া যাবে না। ওর হাতে গেলে অপব্যবহার হবে। অভাবের সংসারে রাইফেলটা বাজে কাজে লাগাতে পারে। এটা আমিও জানতাম। দিচ্ছি দেই করে করে আমরা পাঁচজন কোন এক সকালে ভারতের পথে হাঁটা দিলাম। পথে এক জায়গায় বসে কীভাবে কী করবো ঠিক করলাম। একসাথে হাঁটবো না ফাঁকে ফাঁকে হাঁটবো। সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম, পাংশা থানার ভিতর দিয়েই থানা এড়িয়ে চলে যাবো। সাহা খাঁ মটকার ঝুড়ি সাথে আছে। ওর মধ্যে আমাদের চিড়েমুড়ি গুড়। হোসেনের মাথায় দিলাম এক পোটলা সেটাতেও তাই। হোসেন মোল্লাকে দেখলে একটা কামলা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আমি, মন্টু, আর ইন্তাজ একটু চটপটে নাদুসনুদুস। পরণে লুঙ্গি। হাতে ভাঙা ছাতি; বাজারের ব্যাগ। যাহোক আমরা ভয়ে ভয়ে পাংশা পার হলাম। আবার একসাথে বসলাম। সন্ধ্যা নামে নামে ভাব। আর কী? অনুভব করলাম বেশিক্ষণ বসা যাবে না। রাতের আঁধারে আমাদের চলা দেখলে মানুষ অন্য কিছু ভাববে। রাতটা কোথায় থাকি? হঠাৎ মনে পড়লো পাট্টা বিশ্বাস বাড়ির সালাম আমার স্কুল বন্ধু। ঐ বাড়িতে কয়েকবছর আগে গিয়েছিলাম। ওরা বেশ অবস্থা সম্পন্ন। পরিবারটাও বেশ খ্যাত। দ্রুত পা চালিয়ে রাত ৯.৩০টার দিকে সালামদের বাড়িতে কড়া নাড়লাম। ওর ডাকনাম বাদশা। আমার নাম বলতেই অবাক চোখে বেরিয়ে এলো। বললো, তোরা ? পরে বলবো, আমরা চাইনি এখনই আমাদের গন্তব্য কেউ জানুক। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সালাম আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় রে? ওর চোখের পর চোখ ফেলে বললাম, ভারতে। ভোরেই সবাই ঘুম থেকে উঠে পায়খানা প্রসাব সেরে আমাদের খাবারের ডাক পড়লো। গরম

ভাত। সালাম আমাকে ডেকে নিয়ে বললো, আজ লাঙলবাদের হাট। আমাদের বাড়ি থেকে অনেক নৌকা পাট নিয়ে হাটে যাবে। তোদের ঐ নৌকায় তুলে দেবো। বলে দেবো, আমার লোক ওরা ওপারে যাবে। অন্যকোন নৌকায় গেলে তোদের অনেকে নানা প্রশ্ন করবে। বললো, নৌকা বেলা ১০.৩০টার মধ্যে ছেড়ে যাবে। ভাবলাম, দেরি হয়ে গেল। ৪ ঘণ্টা আমরা গতিহীন হয়ে গেলাম। আমরা আবার ৪ জন একসাথে বসলাম। শক্ত ভাষায় বললাম, যার এখনো পিছটান আছে সে ঘরে ফিরে যেতে পারো। কোন বাধা নেই, কারো জীবনের দায়-দায়িত্ব আমি নেবো না। এ এমন এক পথ যে পথ থেকে আমাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। ওরা সবাই বললো, আমরা ফেরবো না যা হবার হবে। মরলে একসাথে, বাঁচলেও একসাথে। আবারও কিছু খেয়ে নিলাম। সালাম আরও কিছু চিড়ে মুড়ি দিয়ে দিল। সময় হলে নৌকায় উঠে পড়লাম। সালাম মাঝিরে কানে কানে কী যেন বলে দিল। আমাদের বললো, তোদের ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেবে। ভরা বর্ষা গড়াইতে। প্রচণ্ড বেগে চলছে স্রোত। দুটো দাড় টেনে পার হতে হচ্ছে। নৌকার ঘাটে মাঝি নৌকা ভিড়ালো না। ঘাটের উজানে ফাঁকা জায়গায় ভিড়ালো। আমাদের বললো নামেন। চকিতে নেমে পড়লাম। পাড়ের উঁচুতে দাঁড়ায় সবাইকে বললাম আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমার বন্ধুকে এপারে পৌঁছার খবরটা দেবেন। দুই একজন যেন কানাকানি করলো। সবাই আমাদের দিকে ফিরে তাকালো। পাট বোঝাই নৌকাটা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি তাকিয়ে থাকলাম। সাহা খাঁকে বললাম বাপু আমার পায়ে হাঁটা চেনা পথ শেষ। এবার তোমার পালা। আমার কাছে ছোট একটা পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপ আছে। তাও লুকানো। নিরিবিলি জায়গা ছাড়া বের করা যাবে না। এবার আমরা জোরে পা চালাচ্ছি। সন্ধ্যার আগেই আমাদের একটা নিরাপদ স্থান বেছে নিতে হবে। বেলা ৩টার সময় একটা বাগানে বসলাম। সামনেই একটা খাল। কচুরিপানায় ভরা। দ্রুত কিছু খেয়ে নিলাম। সাহা খাঁকে বললাম, আমরা কোথায়? বললো সে, মনে হয় ঝিনাইদহের শেষ প্রান্তে। তখন ঝিনাইদহ জেলা ছিল না। জেলা ছিল যশোর। পথেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। সন্ধ্যার পরে হাঁটছি, ফাঁকা মাঠ, রাস্তার ধারে কোন বাড়িঘর নেই। সন্ধ্যার দু'ঘণ্টা

পর রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা বাড়ি পেলাম। সাহা খাঁ বললো, আজ আর না। বাড়ির গেটে গিয়ে ও ডাকাডাকি শুরু করলো। কেউ আছেন বাড়িতে? কোন সাড়া নেই। অনেকক্ষণ পরে এক মহিলার আওয়াজ এলো। কারা ? উনি গেটটা খুলে দিলেন। গেটতো নয়, বাঁশ দিয়ে বেড়া আর কি? সাহা বললো, মারে আমরা পাঁচজন একটু রাতটা থাকবো। বাইরে পাটি পেড়ে থাকবো। খাবার দরকার হবে না। আমাদের কাছে চিড়া মুড়ি আছে। শুধু পানির দরকার। আর দরকার বিশ্রামের। মধ্য বয়সী মহিলাটি আমাদের সকলকে কয়েক পলক দেখে নিল। ভেতর থেকে খেঁজুরের পাটি এনে আমাদের বসতে দিল। পরে আনলো কলস ভরা পানি। পানি খেয়ে প্রাণটা জুড়ায়ে গেল। আমরা মুড়ি বের করে কোন মতে খেয়ে নিলাম। ছোট পোটলাটা মাথায় দিয়ে সবাই শুয়ে পড়লাম। সাহা খাঁ বললো, বাপু ঘুমানো যাবে না। অজানা অচেনা জায়গা সতর্ক থাকার দরকার আছে। আমি বললাম, তুমি শোও। আমার ঘুম পাচ্ছে না। আমি কিছুক্ষণ জেগে থাকি।

সত্যি ঘুম আসছে না। নানা চিন্তা মাথায় কিলবিল করতে লাগলো। প্রিয়ার মুখখানি মনে পড়লো। ছোট ঝরণার কথা, মায়ের কথা মনে পড়তেই উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করলাম। কেন ঘর ছাড়লাম ? এই পথ চলার শেষ কোথায়? আমি কি এর শেষ পরিণতি ভেবে দেখেছি। সামনে তো মৃত্যু, না হয় স্বাধীনতা। আমরা মৃত্যুর পথেই ছুটছি। 'এমন করে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে?' এটা রবীন্দ্রনাথের কথা। হঠাৎ মায়ের মুখটা মনে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়ালাম। বুকের এক কোণায় চিনচিন করতে লাগলো। বোবা কান্না আমাকে আকুল করে তুললো। মাকে বলে আসা হয়নি। আধা সত্য বলে এসেছি। যাবো আর ফিরবো।

মা আমার স্বাধীনতা বুঝে না। বুঝেছে পাকিস্তানিদের সাথে বাঙালিদের মারামারি লেগেছে। এটা ঠিক হয়ে যাবে। মায়ের মুখটা ভেসে উঠতেই মনে হল যাত্রা থামিয়ে ঘরে ফিরে যাই। আমার কী দায় পড়েছে যুদ্ধে যাবার। সাহা খাঁ শুয়েই বললো, কি হলো বাপু? বললাম, ভালো লাগছে না। ফিরে যেতে চাইছো ? আমি চুপ। তবে শোন, আমি গ্রামে গিয়ে ফেরি করে চলতে পারবো। হোসেন মাঠের কাজে লেগে যাবে। মন্টুও ঢাকা চলে যাবে ওর কাজে। ইন্তাজও তাসফাস খেলে সময়

কাটাবে। কিন্তু তুমি ? তুমি কী করবে ? ডাকাতরা তোমায় টার্গেট করে আছে। তুমি তো মাথা নোয়াতে পারবে না। তোমার চাইতে কম লেখাপড়া জানা ছেলেরা মুক্তি হয়ে এলে তোমাকে তাদের কথা মেনে চলতে হবে। তোমার বিবেকে বাঁধবে। ওদের এড়িয়ে চলতে গেলে আরো বিপদ। সুতরাং মাথা উঁচু করে চলতে হলে যুদ্ধে যাওয়াই ঠিক। অপঘাতে মৃত্যুর চাইতে যুদ্ধ করে জীবন দেওয়া বড়ই গর্বের। ওর কথা আমার মন ঘুরিয়ে দিল। মনে পড়লো রবী ঠাকুরের সেই 'সুপ্রভাত' কবিতার কয়েকটা লাইন।

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

.....
মহাসম্পদ তোমারে লভিবে।
সব সম্পদ খোয়ায়ে,
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে।

দূরে কোথাও মোরগের ডাক কানে ভেসে এলো। সাহা খাঁ সবাইকে ডেকে তুললো। হাত মুখ না ধুয়ে তখনি রওনা। প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পর বেলা উঠলো। রাস্তার ধারে এক ডোবায় নেমে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। আবার হাঁটা। সাহা খাঁ বললো, এবার যশোর শেষ। সামনে কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা। বেলা ১২ টার দিকে একটা নদীর পাড়ে এলাম। খাঁ বললো, এটা ইছামতি। হোসেন বললো, ঐ দেখ হাবাসপুর বাজারের বেহারা খোরশেদ সর্দার। উনি আমাদের সবারই চেনা। হাবাসপুর বাজার থেকে ওরা পালকির ব্যবসা করে। আমাদের বাড়িতেও কয়েকবার পালকির কাজ করেছে। আমাদের দিকে তাকিয়েই উনি এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন বাপু, তোমরা ? আমি বললাম, বাপু নদী পার হবো কেমনে ? উনি বললেন, আসেন আমার সাথে। মেইন রাস্তা, খেয়াঘাট বাদ দিয়ে আমাদের নদীর তীর ধরে আধা মাইল পূর্বে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বসলেন। কাকে যেন ডেকে ওপার থেকে নৌকা আনালেন। আমরা পার হলাম। বললেন,

ঐ আমার বাড়ি। চাচা, তোমার কোথায় যাচ্ছো তা আমি বুঝেছি। এলাকাটা ভালো নয়। রাজাকারের ক্যাম্প আছে পথে পথে। আর্মির গাড়ি সময়ে অসময়ে ঘোরাফেরা করে। ঐ খেয়াঘাটে ওদের লোকজন আছে। তাই এখানে নিয়ে এসে পার করালাম। এবার আমরা চিড়া মুড়ি খেয়ে নিলাম। বেহারা এক দৌড় দিয়ে এক ছড়ি সবরি কলা নিয়ে এলো। সাথে কিছু চিড়ে মুড়িও। এবার সে আমাদের নিয়ে হাঁটছে আর গল্প করছে। বুঝলাম মেইন রাস্তা এড়িয়ে গ্রামের ভেতরের রাস্তা ধরেছে। নামেই গ্রাম। বসতি নেই বললেই চলে। এবার বেহারা আমাদের নিয়ে আবার বসলো। পথে কোথায় কোথায় রাজাকার, মিলিটারি ক্যাম্প আছে তা বলে দিল। কোন কোন গ্রামে দাঁড়ানো যাবে না তাও বলে দিল। রাস্তাটা এমনভাবে বলে দিল যা একেবারে বর্ডারে ঠেকলো। পথে বলবে, তোমরা কাজের খোঁজে বেরিয়েছ, চুয়াডাঙ্গায় আমাদের বাড়ি। তিন চারটে গ্রামের নামও বলে দিল। আমরা বাপ-দাদার নামও ঠিক করে ফেললাম। বেহারা চাচা ৩/৪ মাইল পথ আমাদের সাথে এলেন। বললেন, বাপুরা, আর যাবো না। দোয়া করি তোমরা ভালো থাকো। এই লেখার সময় বেহারা চাচার মুখটা ভেসে উঠছে। সেই মিষ্টি হাসি। চোখে মুখে পিতৃত্বের স্নেহ। একাত্তরে পথ চলার সেই অকৃত্রিম বন্ধু। তুমি বেঁচে আছো কী না জানি না। তোমার কথা আজও ভুলিনি আমরা, আজীবন ভুলবো না। তোমাদের মতো সাধারণ মানুষই এই দেশটা স্বাধীন করেছে। স্বাধীনতা আনতে কত অগুনতি জীবন তোমরা দিয়েছো। তোমাদের সালাম। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন।

খোরশেদ বেহারা ফিরে যাচ্ছেন আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন বারবার। আমরাও হঠাৎ সামনে তাকাতেই নারী পুরুষের এক বিরাট লাইন দেখতে পেলাম। একটা বাগানের ভেতর থেকে বের হচ্ছে। আমি বললাম, ওরা শরণার্থী। দেশ ছাড়ছে, পা চালিয়ে ঐ দলের কাছে চলে এলাম। সে এক অচিন্তনীয় দৃশ্য, না দেখলে বোঝা যায় না। কলমে তো সেই ছবির কিছুই আসবে না। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, শিশুদের যেন অনিরুদ্দেশ যাত্রা। সবার মাথায় পোটলা। মায়েদের এক কোলে সন্তান আর এক কোলে বোঝা। বৃদ্ধা মা বাবাকে বাঁশ দিয়ে খাটিয়া বানায়ে তাতে শুইয়ে সন্তানরা কাঁধে করে

নিচ্ছে। পোয়াতি মায়েরা, বোনেরা ফিকে হয়ে গেছে। পা ফুলে কলাগাছের মতো হয়েছে। ঘুম নাই। গোসল নাই। খানা পানিও নাই পেটে। দেখে মনে হল, ওরা এখানেই রাস্তায় শুয়ে ঘুমাতে চায়, কিছু খেতে চায়।

পথে বিশ্রামরত ভারতগামী শরণার্থীরা

বাচ্চাদের অবস্থা আরো করুণ। সবাই পথ চলছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। মায়েরা করুণ কণ্ঠে বলছে, 'এইতো এসে গেছি আর একটু, আর একটু।' ওদের বাবাদেরকে মনে হল, ওদের পথে ফেলে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। তারা আর পাচ্ছে না। বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত। আমরা সবাই ওদের কাজে লেগে গেলাম। কারো বাচ্চা কাঁধে করলাম। বোঝা মাথায় নিলাম। একজন পারছে না তাকে চলতে সাহায্য করলাম। ওদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করলাম। ওই দিশাহারা মানুষগুলো আমাদেরকে দেখে একটু ভরসা পেল। হায়রে মানুষ! আশাই তোদের বাঁচিয়ে রাখে। মনে থাকে আশা। আশা ভাঙে, আশা গড়ে।

ভারতগামী শরণার্থীরা

এই ভাঙা গড়ার সংসারেরই তোদের জীবন তরী বাইতে হয়। আশা নিরাশার দোলাচলে তরী একদিন শেষ খেয়াঘাটে ভিড়বে। তবু আশা মরে না। ওদের অভয় দিলাম, সামনে আরেকটু পার হলেই বর্ডার। ওপারেই শরণার্থী ক্যাম্প। সেখানে থাকা খাওয়ার আয়োজনসহ সব সুবিধা আছে। ভারত সরকার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। সমস্যা হল, পাক বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে পার হওয়া। যদি পাকসেনার গাড়ি সামনে পড়ে, ওরা ব্রাশ চালাবে। আমরা দলটিকে থামালাম। বললাম, একসাথে এতলোক রাস্তায় উঠা যাবে না। আমরা গ্রুপে গ্রুপে পার করে দেবো। রাস্তা পার হওয়া গ্রুপ ওপারে একজায়গায় নিরাপদে থাকবে। সব গ্রুপ পার হওয়ার পর আবার একসাথে হবো। দুপুর হয়ে গেছে, খাওয়ার সময়। সাহা খাঁই ১ম গ্রুপ পার করে রেখে এলো। বললাম, আমি শেষ গ্রুপে। যাই হোক কপাল ভালো সবার। পাঁচ গ্রুপই নিরাপদে পার হয়ে গেল। প্রায় শ'চারেক হবে ওরা। এদের বললাম, যার যা আছে খেয়ে নিন। বিশ্রাম নিন, সামনে আর কোন দৃশ্যত বিপদ নেই। ওরা কেউ কেউ আমাদের খেতে ডাকলো। বিড়ি সাধলো। আমরা ওদের আত্মীয় হয়ে গেলাম। কারো ছেলে, কারো দাদা, কাকা বনে গেলাম। সাহা খাঁ মানুষ পটাতে ওস্তাদ। ওর হিন্দুদের সাথে মিলে মিশে থাকার অভ্যাস আছে। আমাদের

তা নেই। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেছে। আবার হাঁটা শুরু হল। বুঝতে পারলাম, এই শরণার্থী দল যে তালে যাচ্ছে তাতে আমাদের পোষাবে না। আমরা ওদের ছাড়তেও পারছিনে। বেলা ডোবার কাছাকাছি হলে ওদের থামালাম। দলের লোকদের বললাম, রাতে চলাচল করলে পথ হারাবে। লুকিয়ে থাকা ডাকাত তোমাদের ক্ষতি করতে পারে। স্থানীয়দের সাক্ষাত হলে বলি, বর্ডার কতদূর? সবাই বলে এই ৪/৫ মাইল । এই চার পাঁচ মাইল ফুরায় না। সন্ধ্যা হয়ে গেল। হাতে এখনও ৪/৫ মাইল আছে। একটা বাগান মত গাছতলায় আমরা থামলাম। গ্রাম থেকে বেশ ফাঁকে। বললাম, খোলা আকাশের নীচেই থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পুরুষরা পালাক্রমে জেগে থাকবে। হাতের কাছে যা পাবে তাই নিয়ে। ওদের স্থিতু করার পর আমারা সিদ্ধান্ত নিলাম, না ওদের সাথে আর না। আমাদের কেটে পড়তে হবে। একটু রাত হলেই অনতিদূরে কাছে গ্রামের দিকে পা বাড়ালাম। রাত ১০টার দিকে এক বাড়িতে উঠে ওনাদের ডেকে তুললাম। আমরা বাড়িওয়ালাকে বললাম, আমরা ভিতরে ঢুকছি। আজকের রাতটা থাকতে দিন। আমাদের সাথী আরো আছে। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এবার শুধু কথা বলছি আমি। এ বাড়ির ও বাড়ির লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে। আমি একটু স্বর তুলেই বলে দিলাম আপনারা যার যার ঘরে চলে যান। আমাদের দেখার দরকার নেই। দেখবেন সকাল হলে। আরো বললাম আমাদের ধারে কাছে থাকা আপনাদের রিস্ক হতে পারে। আমরা তো রাতে ঘুমাবো না। রাজাকাররা বা অন্য কেউ চ্যালেঞ্জ করলেই শুরু হয়ে যাবে। হয়তো এই গ্রামটাই ছারখার হয়ে যাবে। আপনারা একটু জায়গা না দিলে এখানে বসেই আমরা রাত কাটাবো। কথার টোনে মাতব্বররাই ওদের খেদিয়ে দিল। আমাদের পাটি পেড়ে বসতে দিল। পোটলা ভিন্ন ভিন্ন করে রেখে দুজন দুজন করে গোসল করে নিলাম। ইতোমধ্যে ওনারাই চিড়া মুড়ি গুড় দিয়ে খেতে দিল। বললাম, আর প্রয়োজন নেই। এতেই রাতটা কাভার করতে পারবো। ঘণ্টা খানেক পরে দেখি গরম ভাত, ভর্তা, ডাল, মুরগিও এসে গেল। আমরা কেউ জেগে, কেউ ঘুমে। পরাণটা ভরে খেয়ে নিলাম। সারাদিনের হাঁটার পরে পেট ভরে খেয়ে নিলে যা হবার তাই শুরু হয়ে গেল। সবাই ঘুমে ঢুলু ঢুলু। বাড়ির লোকদের অনুরোধ করলাম, আপনারা ঘুমাতে যান। আমাদের কারও হয়তো পাহারায় থাকতে হবে। আমাদের কাছে হাতিয়ার আছে?

শুধু একজন মধ্যবয়সী লোককে ডাকলাম। ওরা কি ধারের কাছে কোথাও আছে? লোকটা সহজ সরল মনে হল। না, এদিকে নাই। এদিকে আসেও না। এই কাঁচা রাস্তায় ওরা বেরোয় না। লোকটা আরো জানালো, দু'এক গ্রামে কোন রাজাকার নাই, তবে চোরাকারবারি আছে। ওদের ধান্দা অন্য রকম। বললো, স্যার এই প্রথম আমরা মুক্তিবাহিনী দেখলাম। সকালে সব মানুষ আপনাদের দেখতে আসবে। বললাম, এটা কি ভালো হবে ? বললেন, ভালো হবে না। কার মনে কী আছে আমরা কি জানি? বললাম, এরকম লোক কি আছে? জবাব দিলেন, নাই। তবে খবরটা তড়িৎ গতিতে নানা দিকে ছড়িয়ে যাবে। বললাম, আপনি ছাড়া আর আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। আমাদের দেখা দেওয়াতো দূরের কথা, কথা বলাও নিষেধ। আমরা আমাদের গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত পিছু পিছু লোক আছে। তারা দেখছে আমরা কোথায় কোথায় থামছি। কোথায় কার সাথে কথা বলছি ? এমন কী কার বাড়িতে খাচ্ছি। বিপদ যেমন আমাদের, তেমন আপনাদেরও। সকাল হলে বলে দিবেন আমরা তখনই চলে গেছি। আর যাবার সময় জোর করে দুটো খেয়ে গেছি। আমার কথা ওর মনে ধরলো। বললো, তাইতো স্যার, পাকসেনা রাজাকারদের কাছে খবর গেলে আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, এইতো বুঝলেন। ওরা সবাই ঘুমে। আমি আর ঐ লোকটা বসে আছি। আমরা উভয়েই বিড়ি টানছি। খচ্ করে সাহা খাঁ উঠে বললো, আমাকেও একটা বিড়ি দাও তো বাপু। বললাম, তুমি ঘুমাওনি ? ঘাপটি মেরে তোমাদের কথা শুনছিলাম। না, আর শুবো না। বলেই উঠে বসলো। রাত কখন যে মধ্যসীমা অতিক্রম করে ভোরের আলোর ভালোবাসায় ছুটে চলেছে টেরও পাইনি। বললাম, আমরা এবার উঠবো। বেড়ার আবডাল থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠ মায়ের কণ্ঠে বলে উঠলো, তোমরা হাতমুখ ধুয়ে নাও খেচুড়ি তৈরি। সারাদিন তোমাদের না খেয়ে চলতে হবে। দাঁড়াবার ফুরসৎ হবে না। রাত হলে চোরের মত কোন এক বাড়িতে উঠতে হবে। খোদা কিছু জোটালে খেতে পাবে না জোটালে পাবে না। ঘর সংসার ছেড়ে মৃত্যুকে প্রতিক্ষণে মোকাবেলা করছো তোমরা শুধু হানাদার মুক্ত করার জন্য। যাও, উঠো তোমরা। মোরগ ডেকে চলেছে। বুঝলাম, এ আদেশ মানতেই হবে। এ আদেশ অন্তর থেকে এসেছে। মনে পড়ে গেল, শরৎবাবুর শ্রীকান্ত উপন্যাসের একটি লাইন, 'আশ্চর্য এই বাঙলা দেশটা! এর পথে ঘাটে মা-বোন, সাধ্য

কী এদের এড়িয়ে যাই।' খিচুড়ি খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। দেশের সমস্ত বেদনা যাদের টান দিয়ে ঘরের বাইরে বের করেছে। তাদের কোন কিছুই ধরে রাখতে পারবে না।

এবার আর শরণার্থীদের খোঁজ নিলাম না। ঐ সেবা টেবা আমাদের দ্বারা হবে না। লক্ষ্য আমাদের একটাই, বাংলার স্বাধীনতা। হাঁটতে হাঁটতে দুপুর প্রায়। সামনেই দেখি একটা ছোট বিল। লাল পদ্ম শোভা পাচ্ছে। পাড়ে একটা বটগাছ। জুন মাসের শেষ, প্রচন্ড গরম। জিরাবার জন্য গাছ তলায় বসলাম। গামছা পেতে একটু কাত হতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতের ঘুমের ঘাটতি পূরণ করে ঘুম ভাঙল প্রায় ২ ঘন্টা পরে। এমন কাকচক্ষু পানিতে প্রাণ জুড়াবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রাণ ভরে গোসল করে, ভিজা কাপড় রোদে শুকাতে দিয়ে চিড়া মুড়ি গুড় খেতে লাগলাম। এমন সুন্দর জায়গা অনেকদিন চোখে পড়েনি। উত্তরে দিগন্ত ছোঁয়া মাঠ। বাড়িঘর দেখা যায় না। দক্ষিণে টুকরো টুকরো ছায়া ঘেরা গ্রাম। বাংলার যে চিরন্তন রূপ, এই বটতলায় বসে আমার দেহমন প্রাণ আচ্ছন্ন করে ফেলল। দেখলাম, আমার সোনার বাংলা মাকে দস্যুরা ধর্ষণ করছে, বস্ত্রহরণ করছে। মায়ের শরীরে রক্ত ঝরাচ্ছে। মা, সন্তান সন্তান বলে চিৎকার করছে। দাঁতের পর দাঁত ফেলে বললাম, ওঠ্ সবাই। ওরা হকচকিয়ে গেল। বুঝলো, আমি কঠিন কিছু মনের মধ্যে নাড়াচড়া করছি। কিছুক্ষণ কাটার পর এক পথিক দেখাল, ঐ যে সীমান্ত পিলার। ১০/১৫ মিনিট লাগবে। মনের মধ্যে শিহরণ জাগল, তেমনি আবার ভারি হয়েও গেল। সীমান্তের সীমানা ঘেষে একটা বাড়ি। সবই ছনের ছাওয়া। পানি পানের জন্য ঐ বাড়িতে উঠলাম। কোন পুরুষ মানুষ নাই। একজন মধ্যবয়সী মহিলা বের হয়ে আসল। বললাম, আমাদের পানি খাওয়ান। মহিলাটি কিছুক্ষণ পর মুড়ি ও আঁখের গুড় নিয়ে ফিরে আসল। আর একটা ছোট মেয়ের কাঁখে মাটির কলসীতে এক কলসি পানি। একটা কাসার গ্লাস। তোমরা খেতে থাক আমি ভাত চড়ায়ে দেই। শুধু ডাল আর ভর্তা। বললাম, বর্ডার কতদূর ? আঙুল তুলে দেখাল ঐ তো। জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ নাই। বললো, মাঠে গেছে। বাড়িতে দেখলাম ভালোমত খড়ের পালাও আছে। গরু বাছুরের সাড়া শব্দ পেলামনা। মুড়ি খাওয়া শেষ হলে বাড়ির বাইরে এসে এক মুঠি মাটি, একটা নেকড়ায় বেঁধে ব্যাগে ভরে ফেললাম। ওদের বললাম, তোরাও নে। যেখানেই মরি এই মুঠি মাটি আমাদের সাথে যাবে। এমাটি

নয়রে এ যে মা। মাকে সাথে নিলে মনে জোর পাবি, শক্তি পাবি, সাহস পাবি। ওরাও তুলে নিলো। বললাম, হারায় না যেন। এক ঘন্টার মধ্যে মেয়েটা ডাল ভাত নিয়ে আমাদের ডাক দিলো। তরকারি শুধু ডাল। এই আমাদের অমৃত। পরাণভরে খেয়ে বিছানো খড়ের উপর শুয়ে পড়লাম। মেয়েটা বললো, বাবারা এ জায়গা নিশ্চিন্ত। এখানে মিলিটারি, রাজাকার কেউই আসে না। শুধু দলে দলে শরণার্থী যায়। কোন দল বসে, কোন দল বসে না। রাতে তোমরা ভয় পাও না? বলল, আমাদের থাকতে থাকতে অভ্যেস হয়ে গেছে। চোরেরা গরু ছাগল চুরি করে। এই যা। বিকেল চারটা। সীমান্তের পিলারটা পিছনে রেখে বাংলার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। সবার চোখ ভিজে গেছে। আমাদের দেশ আমাদের টানতে লাগলো। মনে পড়ে গেল, শরৎবাবুর পথের দাবীর কয়েকটা লাইন, "সব্যসাচী বলছে, ভারতী, আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই। পাপ পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য আমার একটি মাত্র সাধনা। এই আমার ভালো এই আমার মন্দ। এছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নাই। ভারতী, আমাকে আর তুমি টেনো না।"

ঐ কথাগুলি আমি ঘুরিয়ে ওদের বললাম। আমরা মুক্তিযোদ্ধা, আমাদের মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের একটিই সাধনা। হে আমার প্রিয়জন, 'আমাদের তোমরা টেনো না।' এই কথাগুলো বলেই তড়িৎবেগে সীমানা পিছনে ফেলে তরতর করে ভারতের মাটিতে পা বাড়ালাম। পা আর চলতে চায় না। সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে ভিতরে ঢুকে অন্য রকম পরিবর্তন এসে গেল। সাহা খাঁ বলে উঠলো, তোমরা শোন, যে পথে নেমেছি এর শেষটা আমরা দেখে নেবো। আমাদের চলা দেখে এদেশের মানুষ, পুলিশ, আর্মি আমাদের নানা রকম প্রশ্ন করতে পারে। সবার এক উত্তর হবে পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমরা ট্রেনিং নেবো, অস্ত্র নেবো, তারপর ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়বো। এই একটি মাত্র কারণেই আপনাদের দেশে আসা। আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। আমরা কারো সাথে মিশবো না। কোন বাজে গল্প করবো না। শুধু আমরা আমরাই কথা বলবো। ওদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবো আমি অথবা বাপু। আমরা দ্রুত হাঁটছি। সাহা খাঁ সামনে। মানুষের সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছে। আর জেনে

নিচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প কোথায়? এমনি করেই আমরা প্রায় রাত দশটার দিকে করিমপুর ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। ক্যাম্পে ঢুকেই সেনগ্রামের ছনে মুনছির ছেলে বন্ধু হাতেম মুনশির দেখা পেয়ে গেলাম। ও আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তোরা খেয়েছিস? না। আয় ক্যাম্পের হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে মোটা মোটা ডাল দিয়ে মোটা মোটা ভাত খেয়ে নিলাম। খাঁ বললো, মুনশী শোয়ার ব্যবস্থা? মুনশি আমাকে ঐ ক্যাম্পের ইনচার্জের কাছে নিয়ে গেল। উনি আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, আপনাদের ফরিদপুরের জন্য কল্যাণীতে নতুন ক্যাম্প খোলা হয়েছে। সেখানে গেলে আপনারা স্বস্তি পাবেন। শরীর সুস্থ না থাকলে যুদ্ধ করতে পারবেন না। আর এখানে রোগী হলে কে কাকে দেখবে? মোসলেম উদ্দিন মৃধার স্যারকে ওখানে পাবেন। স্যারকে পাবো? ভোর হতেই সাহা বললো, চলো।

বাসে তারপর হেঁটে চলতে চলতেই বেলা ১টার আগে কল্যাণী ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে গেলাম। ক্যাম্প শুরু হয় নাই। দু'একটি তাবু ফেলা হয়েছে। আমরাও আমাদের তাবুটা গেড়ে নিলাম। পাশের এক পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসে আমরা খেয়ে তাবুতে ঘুমিয়ে গেলাম। সব তাবুর লোক আমাদের পাংশার রাজবাড়ির লোক। ব্যবস্থাপনায়ও রাজবাড়ি মহাকুমার লোক। এদের কাছে থাকায় সব তাপ জ্বালা কমতে লাগলো। ইতিমধ্যে হাবাসপুরের করিম মিলিটারি এসে ট্রেনিং এর দায়িত্ব পেয়ে গেলেন। সকাল বিকাল প্যারেড। দুপুরে বিশ্রাম। দুই একদিন পর করিম সাহেব আমাকে নিভৃতে ডেকে বললেন, স্যার, আপনি একবেলা যাবেন। শুধু সকালে। বিকেলের প্যারেডে যাবেন না। ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াবেন। আর মৃধা স্যারের সাথে যোগাযোগ করে চলে যাবার ব্যবস্থা করবেন। ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছি স্যার ৭/৮ টা ইয়ুথ ক্যাম্পের চেয়ারম্যান। রাজবাড়ির আক্কাছ মিয়ার কাছ থেকে স্যারের ঠিকানাটাও পেয়ে গেলাম। যেভাবে ক্যাম্পে যুবকরা আসছে বুঝলাম, এ এলাকায় কুলোবে না। খাবার দাবারও অভাব পড়ে যাবে। এখানে রোববার ছুটি। ভোরেই ৫/৬ জন কল্যাণী স্ট্রেশনে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরলাম। দেড় ঘণ্টার মধ্যে শিয়ালদহ গেট পার হয়ে রাস্তায় পড়লাম। জয় বাংলা বললে কেউ চেক করে না। শুধু

মুখের দিকে একবার তাকায়। স্যার কলকাতা টালা ট্যাংক বি.টি রোড জনাব নুরুল ইসলাম এর বাসায় থাকেন। লোকজনকে জিজ্ঞেস করেই হাঁটা শুরু করলাম। বাসা নম্বরটা আজ আর মনে নেই। আমরা সবাই ১৬ থেকে ২২ বছরের যুবক। ফুর্তির সাথে দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগলাম। পৌঁছেও গেলাম। কড়া নাড়তেই কঠিন কালো মধ্যবয়সী ৬ ফুটের মতো উঁচু এক মহিলা গেট খুলে দিলেন। একবার সবাইকে দেখে নিয়ে আস্তে করে বললেন, কাকে চাই? মোসলেম উদ্দিন মৃধা স্যারকে। বলতেই বললেন, আসুন আমার সাথে। বিরাট বাড়ি। ভিটেয় ভিটেয় বিল্ডিং। আর একটা গেট পার হয়েই ডান পাশের বিল্ডিংয়ের একরুমের সামনে দাঁড়ায়ে বেল টিপলেন। দরজা খুলতেই আমরা স্যারের সামনে পড়ে গেলাম। স্যারকে সালাম করার পর আর একজনকেও সালাম করতে হলো। স্যার বললেন, ইনি ফণিদা। ফণিভূষণ মজুমদার। এম.এল.এ। স্যার আমাদের চোখ মুখ দেখেই বুঝলেন পেটে কিছু পড়েনি। স্যারকে পেয়ে আমরা ক্ষুধা নিদ্রা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাদের ডেকে বাইরে এনে অনতিদূরে ব্যারণ'স হোটেলে নিয়ে গেলেন খাওয়াতে। কাচের বেড়া দেওয়া হোটেল। খাই আর তাকাই। তাকাই আর খাই। খাওয়া শেষ হলে আমরা রুমের বারান্দায় বসলাম। বললাম, স্যার দ্রুত আমাদের ট্রেনিং এ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। হাতিয়ার নিয়ে দেশে ফেরার জন্য মনটা দাপাচ্ছে। স্যার মুচকি হাসলেন। পুরো দেশের খবর নিলেন। কারা কারা রাজাকারে গেল তাও। আমরা বললাম। আমরা একটা আশ্বাস পাওয়ার আশায় বার বার ওনার মুখপানে চাইলাম। ভিতরে গিয়ে ফণি বাবুর সাথে কী যেন পরামর্শ করলেন। আবার বেরিয়ে এসে বসলেন। তোমাদের ১৫ দিনের মধ্যে পাঠাবার চেষ্টা করবো। আগেও হতে পারে। বেলা পড়ে এলো। মেইন রাস্তায় এসে একটা বাস দেখালেন। এই বাস শিয়ালদহ স্টেশন যাবে। আমাদের প্রত্যেকের হাতে ভারতীয় ১০ রুপি দিলেন। আমরা বাসে উঠে স্টেশনের কাছে নামলাম। সামান্য পথ। বাসের সুপারভাইজার ভাড়া নিলো না। বাসে উঠার একটু আগে আমাকে বললেন, সামনের রোববার আবার এসো। কথা আছে। রাত ৮টার মধ্যে আমরা মহানন্দে কল্যাণী ক্যাম্পে ঢুকলাম।

সবাইকে বললাম, আর ১০/১২ দিন ধৈর্য ধরো। স্যারের মুখ থেকে কথা আদায় করে তবে ফিরেছি। আক্কাছ মিয়াকে বলতেই চমকে উঠলেন। বললেন, আমরা প্রত্যেকদিন ফোন করে অনুরোধ করছি, কথা বের করতে পারছি না। আর আপনি এক পরিচয়েই সব পাস করে নিয়ে এলেন। দু'দিন বাদেই আক্কাছ মিয়া ডেকে বললেন, আপনার ফোন মৃধা স্যার। বললেন, কালকে কল্যাণীতে আসছি। তুমি থেকো। আর আমাদের এলাকায় যারা ট্রেনিং এ যাবে তাদের একটি তালিকা করে রেখো। জি, স্যার। এরপর ফোন কেটে দিলেন। সামান্য দুটো লাইন। আক্কাছ মিয়া জিজ্ঞেস করলেন কি কথা হলো ? প্রথম লাইনটা বললাম দ্বিতীয়টা বললাম না। ওনাদের আসতে আসতে দুপুর হয়ে গেল। চেয়ার টেবিল নাই। গামছা মতো কি একটা পেতে ঘাসের ওপর বসে গেলেন। হেদায়েত কাজী আর আক্কাছকে ডেকে আস্তে আস্তে কী যেন বললেন। কাজী আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। স্যারকে বিদায় জানতে গিয়ে বললাম স্যার রবিবার আমি একজনকে সাথে নিয়ে আসছি। বললেন, এসো। চলে গেলেন। আরও কোথাও কোথাও যাবেন বলে গেলেন।

কাজী আর আক্কাছের কাছে আমার দাম বেড়ে গেল। আমাকে আর লাইনে দাঁড়িয়ে ভাত নিতে হতো না। আক্কাছ মিয়াদের সাথে পাত পড়তে লাগলো। আমি আর আক্কাছ মিয়া একদিন কাজীর সাথে দেখা করতে গেলাম। কাজী বললেন, মৃধা ভাইয়ের নির্দেশে কিছু দিনের মধ্যে পাঁচ কী ছয়টা বাস আসবে। রাজবাড়ি মহাকুমার সব ছেলে উঠার পর যদি জায়গা থাকে তাহলে অন্য মহাকুমার লোক উঠবে। বহু তদবিরের পর এ ব্যবস্থা করা গেছে। বললেন, আপনার নিকট মৃধা ভাই বলে গেছেন অন্যদের বলতে, দুইদিন পর এই বাস আবার ফিরে আসবে আরো ট্রিপ নেওয়ার জন্য। রবিবারে সাহা খাঁকে নিয়ে টালাট্যাঙ্কে পৌঁছে গেলাম। এবার আগেই গেলাম। দেখি স্যার আর ফণি বাবু গল্প করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, ভেতরে এসো। মিনিট কয়েক পরে স্যার বললেন, সামসুদ্দিন তোমাকে যে জন্য ডেকেছি তা শোন। আমাদের অ্যাম্বাসিতে লেখাপড়া জানা লোকের অভাব। যাও দু'একজন বিএ, এমএ পাস পাই, তাতে কাজ হয় না। কিছু জানে না ব্যাটারা ? আমি আর দাদা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাকে দূতাবাসে ঢোকাবো। মাসে

একশ টাকা মাইনে, ধারের কাছে একটা মেস জোগাড় করতে হবে থাকা খাওয়ার জন্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বুঝবে চাকরি কী। তুমি তো লেখাপড়ায় ভালো। এখনো পদবি ঠিক করিনি। আমি আর দাদা এটাও ঠিক করে দেবো। চেয়ার টেয়ার না পেলেও মাটিতে মাদুর পেতেও কাজ করা লাগবে। তুমি কি বলো ? সাহা খাঁ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। মনে হলো চোখ টিপ মারলো। বললাম, স্যার আমরা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। এসো। নিজেরাই গেট খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। খাঁ এর মুখ কালো ও কঠিন। কী সিদ্ধান্ত নিলে বাপু। আস্তে করে বললাম দেখি। তোমার দেখা তুমি দেখো, চাকরিতে যোগ দিলে আমি কালই চলে যাবো। হোসেন তো গেছে। তুমি কি মনে কর মন্টু ইন্তাজরা থাকবে ? ওরাও যাবে। না, গিয়েই কি করবে। অন্য লোকের হুকুম ওরা মানতে পারবে না। আমাদের মাথার উপর তুমি ছিলে ছাদ। ছাদ যখন নেই, আমরাও নেই। এবার গিয়ে সেকেনের সাথে করে অন্য ব্যবসা ধরবো। এটা না হলে তো মটকার ডালা আছেই। চমকে উঠে খাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

বললাম, স্যারকে বলে তোমাকেও একটা চাকরি দিয়ে দেবো। এখানে অনেক রকমের চাকরি আছে। আর না হয় আমার টাকা দিয়েই দু'জনে চলবো। এবার খাঁ ক্ষেপে গেল। তুমি তো তোমার ওয়াদা ভঙ্গ করছো। তুমি মাটির সঙ্গে বেইমানি করছো। আমরা শিগগিরি অস্ত্র নিয়ে না গেলে কি ঘটবে জানো ? ডাকাত, রাজাকার, পাক সেনারা আমাদের পরিবারের কাউকে রাখবে না। চাকরি করা মানে নিজে নিরাপদে থাকা। আমাদের আপনজনদের গভীর বিপদে ফেলা। একশ টাকা বেতন ? ক্যাম্পে দৈনিক হাজার টাকা আসবে ? আসতেই থাকবে। স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আসতেই থাকবে। বিড়বিড় করে কথা গুলো বলে চললো। দোকানির কাছ থেকে দু'কাপ চা নিয়ে শেষ করে সিগারেট ধরালাম। দোকনি বললো দাদা ! আমরা বললাম 'জয় বাংলা।' দামটা সাহা খাঁই দিলো।

এবার আমার সেই তিনটে গুলি করার ঘটনা মনে পড়তেই তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও মনে পড়লো। চাকরি করে দেশের কী উপকার করতে পারবো, জানিনে। তবে অস্ত্র দেশের কাজে লাগবে। চলো যাই। স্যারের রুমে ঢুকলাম। দু'জনেই বিছানায় কাত হয়ে গল্প করছেন। বললাম, স্যার চাকরি

করা আমার হবে না। অস্ত্রই হাতে নেবো। দেশের সার্বিক অবস্থা, বকশিপুরের লুটপাটের কথা, সর্বশেষ অনিল ডাক্তারের ঘটনাটা বলে ফেললাম। আপনি তো সবই জানেন। বাহাদুরপুর দুটো দল। আপনার বিপক্ষের দলটাও কম না। গ্রাম্য কোন্দল যদি রাজনীতির সাথে যোগ হয় আপনার গ্রামও লুট হবে। আপনার অনুসারিদেরও খোঁজ পাওয়া যাবে না। ওরা একজনও দেশ ছাড়েনি। তাস খেলে আর পরিস্থিতি বোঝে। আমার হুমকি দেওয়ার ঘটনাও বললাম। বললাম, দলে ঢোকার কথাও। চাকরি করলেও আমার দেহমন পড়ে থাকবে আমার এলাকায়। তাছাড়া আমি একটা গ্রুপ নিয়ে এসেছি। আমি না থাকলে ওদেরও রাখা যাবে না। আমি প্রিয় ছাত্র না হলেও আপনার ছাত্র। আপনার প্রিয় ছাত্ররা ইয়াহিয়া খাঁর বেতন খাচ্ছে আর ডানে বামে মাথা ঘুরাচ্ছে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমাদের হাতে কয়েকশত অস্ত্র এলেও তার অপব্যবহার হবে না। যদি না তারা ডাকাতি করে, আর আমাদের উপর অস্ত্র না তোলে।

পাকিদের ব্যাপারটা আলাদা। বললাম, যারা কলম চায় তাদের দিন। আমার-আমাদের অস্ত্র চাই। এক সপ্তাহ দেখবো। ট্রেনিং না পেলে ভিতরে গিয়ে অস্ত্র যোগাড় করে কাজে নেমে যাবো। তবে এখান থেকে পেলে মাথাটা উঁচু থাকবে। ওরাও ভাববে ভারত ফেরা মুক্তি। আর না । এবার যাই স্যার। দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এলেন। ফণি বাবু বললেন, মোসলেম ওকি তোমার ছাত্র? স্যার মাথা নাড়লেন। এরকম কয়টা ছাত্র তৈরি করতে পেরেছো? স্যার নিরুত্তর। ফণি বাবু বললেন, তোমার চাকরি করতে হবে না বাপু। ও তোমার কাজ নয়। তোমার মনবাসনা পূর্ণ হবে। আমার আশীর্বাদ রইলো। দেশ স্বাধীন হলে, আর যদি বেঁচে থাকো তাহলে আমার সাথে দেখা করো। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। মোসলেম এবার ওরা যাক। বলেই পকেট থেকে দুশো টাকার দুটো নোট বের করে আমার দিকে মেলে ধরলেন। আমি তো হতভম্ব! হাত না মেলেই স্যারের দিকে তাকালাম। কী করবো ভাবছি। স্যার ফণি বাবুর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। টাকা হাতের মুঠোয় রইলো। দুজনকেই পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বেরিয়ে এলাম। স্যার মাথায় হাত দিয়ে কী যেন বিড়বিড় করে বললেন। হয়তো দোয়া করলেন। ওনারাও গেট পর্যন্ত এলেন। এবার তোমরা কল্যাণী ক্যাম্পে ফিরে যাবে? না, স্যার, হাওড়া ব্রিজটা

দেখবো। চোখের সামনে যা পাই, তাই দেখবো। স্যার বাসের কথা বলে দিলেন। রাস্তায় এসেই কিছুক্ষণ পরেই বাস এলে উঠে পড়লাম। সিটও পেলাম। হেলপার ছোড়াটা হাঁকছে হাওড়া, হাওড়া, হাওড়া। সুপারভাইজার কাছে আসতেই টিকিট নিয়ে নিলাম। ব্রিজ পার হয়েই নেমে পড়লাম। সামনে তাকিয়েই বড় সাইনবোর্ডে লেখা হাওড়া স্টেশন। শিয়ালদহকে ভালো করে দেখার সুযোগ হয়নি। গেটের ভিতরে ঢুকে স্টেশনের এমাথা ওমাথা ঘুরলাম। স্টেশন দেখা শেষ হলেই উঠলাম ব্রিজের উপর। পায়ে চলার পথে বসেছে নানা রকম দোকান যেমন বসে ঢাকার ফুটপাতে। নীচে হাওড়া নদী ধীরে বহমান। ব্রিজটা নেড়ে চেড়ে দেখছি। পা দিয়া পাটাতনে গুতা মারছি। বোকামো আর কী? সামনে একটা সাইনবোর্ডে লেখা, 'পৃথিবীর সবচাইতে দৃষ্টিনন্দন ও অপূর্ব কলাকৌশলে তৈরি এই সেতু।' এই রকম সেতু আর পৃথিবীতে কোথাও নেই। আমি বিহবল দৃষ্টিতে সেতু দেখতে দেখতে ধীর পায়ে সামনে এগুচ্ছিলাম। চলো তো বাপু। বেলা কোথায় দেখেছো? এবার পা টানা করে সেতু পার হয়েই বাস ধরলাম। সারাদিন খাওয়া দাওয়া নাই। ভাবলাম শিয়ালদহ গিয়ে কিছু খেয়ে নেবো। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাস থেকে নেমে প্লাটফর্মে ঢুকে পড়লাম। রুটি চা কিনে ওখানেই খেয়ে নিলাম। প্রায় ২/৩ মিনিট পর পর ট্রেন। একটা ফেল করলে আর একটা ধরা যাবে। ট্রেনে উঠে পড়লাম। রাত ৯ টার সময় ক্যাম্পে ঢুকলাম। মন্টুরা আমাদের দেখে মার মার করে উঠলো। বললো, কাজী আর আক্কাছ মিয়া তোকে গরু খোঁজা খুঁজছে। বললাম, আগে গোসল, খাওয়া তারপর ঘুম তারপর হবে দেখা। গামছা নিয়ে পুকুরে গিয়ে ভালো করে গোসল করে এলাম। সাহা খাঁকে বললাম, তোমার সাথে আমার খাবারটাও নিয়ে এসো। মন্টু বার বার খোঁচায়, বল্ না তোরা কোথায় গেছলি ? অনেক চাপাচাপিতে বললাম, ২/৩ দিনের মধ্যে আমরা ট্রেনিং এ চলে যাচ্ছি কী না এই কথাই জানতে গিয়েছিলাম। শুধু টাকার কথা বাদে সব বললাম।

সকালের পিটিতে না গিয়ে আমরা ৫ জন বাইরে নাস্তা খেয়ে ৪ প্যাকেট সিগারেট কিনে কল্যাণী বাজারের দিকে যাচ্ছি। আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। এই মাত্র দোকান খুলে এক দোকানদার ঝাপ তুলছে আর দাদা দাদা করে ডাকছে। আগেও এসেছি, চাও খেয়েছি। ওরা ফরিদপুরের

লোক। আত্মীয় স্বজন কিছু ছিল কিছু এসেছিল। এবারে বোধহয় পাট চুকিয়ে এসে পড়েছে। বললাম, কী খবর দাদা? বললো, আমাদের প্রায় সবাই এসে গেছে। যারা দু'একজন আছে তারাও এসে যাবে। জমিজমা ঘরবাড়ি ফেলে রেখে এসেছি। কিছু বিশ্বস্ত লোকের আওতায় আছে। তবে যুদ্ধের শেষ না দেখে পাট চুকাচ্ছিনে। ছেলেটর নাম নরেন। ও পাঁচ কী ছয় মাস হলো দোকান শুরু করেছে। দাদা, চা খাওয়াই বলে চায়ের অর্ডার দিল। আমি দোকানের কাপড় দেখতে লাগলাম। বললাম, গামছা কোথাকার? কুষ্টিয়ার। দেখি, বলতেই একগোছা গামছা তাক থেকে নামায়ে সামনে মেলে দিল। একটা হাতে নিয়ে বললাম, এর দাম কতো দিবো? হিসেব করে বললো, সাড়ে বারো রুপি দাম, আপনি এগারো রুপি দেন। প্যাকেট করলো। আবার বললাম, লুঙ্গি আর গেঞ্জি দেখি। এবার সে লুঙ্গি ও গেঞ্জির বান্ডিল সামনে মেলে ধরলো। এগুলো কোথাকার? গেঞ্জি পাবনার। লুঙ্গি কুমারখালির। পাঁচটা লুঙ্গি ও ৫টা গেঞ্জি ঠিক করে দাম জিজ্ঞেস করতেই নরেন আবারও হিসেব করে বললো, আপনি ৬০ রুপি দেন। মোট একাত্তর রুপির কাপড় কিনে ১০০ রুপির নোট দিলে ২০ রুপি ফেরত নিয়ে এবার আমি চায়ের অর্ডার দিলাম। নরেন খুব খশি। দোকান না খুলতেই এতো বিক্রি। সাহাদের বললাম, তোমাদেরটা তোমরা পছন্দ মতো নিয়ে আমারটা আমাকে দাও। সাহা খাঁর জামাটা প্রায় ছেঁড়া। ওরটা কিনতে গিয়ে সবাই মাপ মতো একটা একটা নিলাম। ৪০ রুপি দিলে এবার ক্যাম্পের দিকে আসতে শুরু করতেই রহমত হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে হাজির। কিরে ? কাজী আর আক্কাছ মিয়া তোকে গরু খোঁজা খুঁজছে। সারা ক্যাম্পে হুলস্থূল। ক্যাম্পে ঢুকেই আক্কাছ মিয়ার ঘরে। কাজী সাহেবও বসে আছেন। দেখেই বললেন, কাল থেকেই খুঁজছি আপনাকে। সবাইকে বের করে দিয়ে, আমরা বসলাম। কাজী সাহেব বললেন, আজ রাতে ৬টি বা ৮টি বাস আসবে, আজই আপনাদের যাত্রা। প্রচার করতে হবে এই ট্রিপ যাওয়ার পর বাস এসে আরো ট্রিপ দেবে। মৃধা আর ফণিদার হুকুম। রাজবাড়ির একটা ছেলেও বাদ যাবে না। যারা অক্ষম তারাই যেতে পারবে না। সেনাবাহিনীর লোকজন বাছাই করবে। আমরাও সাথে থাকবো আপনিও। সন্ধ্যা ৭টায় খাওয়া শেষ। বিছানাপত্র নিয়ে ৮টার লাইন। ৮.৩০ টায় বাছাই শুরু। ৯.৩০ টায় বাসে ওঠা। ১০ টায় যাত্রা।

যারা এদিক ওদিক যাবে তারা বাদ পড়লে আর নেওয়া যাবে না। কারণ

তখন ওরা সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে চলে যাবে। যার যার এলাকার ছেলেরা ছিন্নভিন্ন না থেকে একসাথে থাকবে। রাজবাড়ির ছেলেরা সারির প্রথম দিকে থাকবে। ভিতরে ভিতরে সবাইকে আমরা এটে দিলাম। কোথা থেকে লাইন শুরু হবে তাও দেখে এলাম। ঠিকঠাক মতো ৭.৩০ টায়ই আমরা লাইন নিয়ে নিলাম। আমি আর কাজী সাহেব ঘুরে দেখলাম আমরা ঠিক আছি কীনা। বাস লাইন দেওয়া সারিসারি। প্রত্যেক বাসের গেটে একজন আর্মি জোয়ান। যারা সিলেক্ট হচ্ছে তাদের হাতে একটা টোকেন দিয়ে বাসে ঢোকানো হচ্ছে। টোকেনের গায়ে বোধহয় বাস নম্বরও ছিল। অতো আজ আর মনে নেই। রাজবাড়ির সব গ্রুপ উঠার পর অন্য থানার ছেলেদের ঢোকানো হল। যারা বাদ পড়লো তারা অন্য জেলার। সদ্য আগত যারা ও অক্ষম তারা বাদ পড়লো। আমাদের সাহা খাঁও ওদের দলে চলে গেল। আমার মনে হল, ওকে ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হল। ওর জন্য আমরা সবাই হা হা করছি। কিন্তু কোন উপায় নেই। বাস ভর্তির সাথে সাথে গেট লক আপ। আগেই বলে দেওয়া হয়েছে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সব প্রয়োজন সেরে বাসে উঠতে হবে। সাহা খাঁ বাসের জানালার কাছে আসতেই ৫০ রুপির একটা নোট ওকে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, রোববারে স্যারের সাথে অবশ্যই দেখা করবে। যা করার ওনাকে বলে করবে। বাসের দায়িত্বে সেনারা। এবার বাসযাত্রী গুনলেন আর টোকেনগুলো নিয়ে বারবার মিলালেন। মনে হয় ছবিও তুললেন আর আমাদের বাসের নাম্বার মনে রাখতে বললেন। সোজা কথা মিলিটারি কায়দা কানুন প্রয়োগ শুরু হয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছি জানি না সবার মুখে কুলুপ আটা। বাস ছাড়লো সাহা খাঁ থাকলো। ওর মুখটা বুকের মধ্যে ভরে নিলাম। ওর আর আমার বয়স সমান ১৯৪৯ এ জন্ম হলে ২০১৪ তে বয়স হয় ৬৫ বছর। ও আমার দীর্ঘ ৬০ বছরের সাথী। সুখে দুঃখে আরামে-বিরামে কঠিন সময়ের কঠিন মোকাবেলায়ও কেউ কাউকে ছেড়ে যাইনি। ও ছিল আমার কাছে সকল ঘটনার ডিকশনারী। কোন কিছু মনে না থাকলে বলতাম বাপু, ঐখানে যেন কী হয়েছিল ? অমনি ঘটনার ছবিটা তুলে ধরতো। আমি ঢাকা বা চাকরি থেকে বাড়ি গেলেই একসাথে মাঠে ঘাটে বসতাম। পিছনের স্মৃতি নিয়ে আলোচনা হতো।

২০১৩ সালে হজ্জ থেকে ফিরে দেখতে গেলাম। বিছানা থেকে উঠতে

পারে না। খাওয়া দাওয়াও বন্ধ। তরল খাবারে দিন কাটছে। আমি কিছু খেজুর ও যমযমের পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম। পানি খেল খেজুর খেতে পারলো না। ঢাকা এসেই থানাকে বলে রেখেছিলাম ওকে যেন রাষ্ট্রীয় সম্মানে দাফনে কোন রকম অবহেলা না হয়। তখনও সে জীবিত। ওর শেষ খবর যখন এলো। তখন আমি আর নড়তে পারলাম

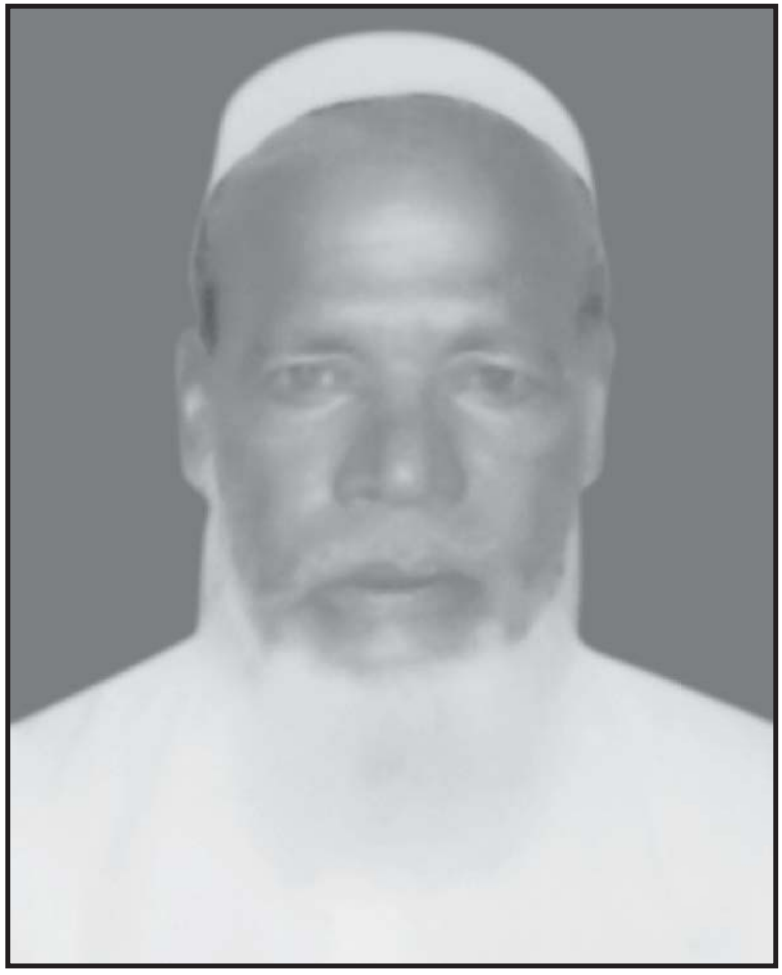

মুক্তিযোদ্ধা সাহা খাঁ

না। সব কিছু অবশ হয়ে গেল। থ মেরে বসে রইলাম। ৩০ জানুয়ারি, ২০১৪ চলে গেল। জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য বলে যদি কিছু থাকে সে মৃত্যু। মৃত্যু তো অন্ধকার। অন্ধকারেরও আলো আছে। সাহা খাঁ সেই আলোর মধ্যেই প্রবেশ করলো। বলি খোদা, ওকে তুমি আলোয় আলোয় ভরিয়ে দিয়ে তোমার কাছে আলোর মধ্যেই রেখে দিও।

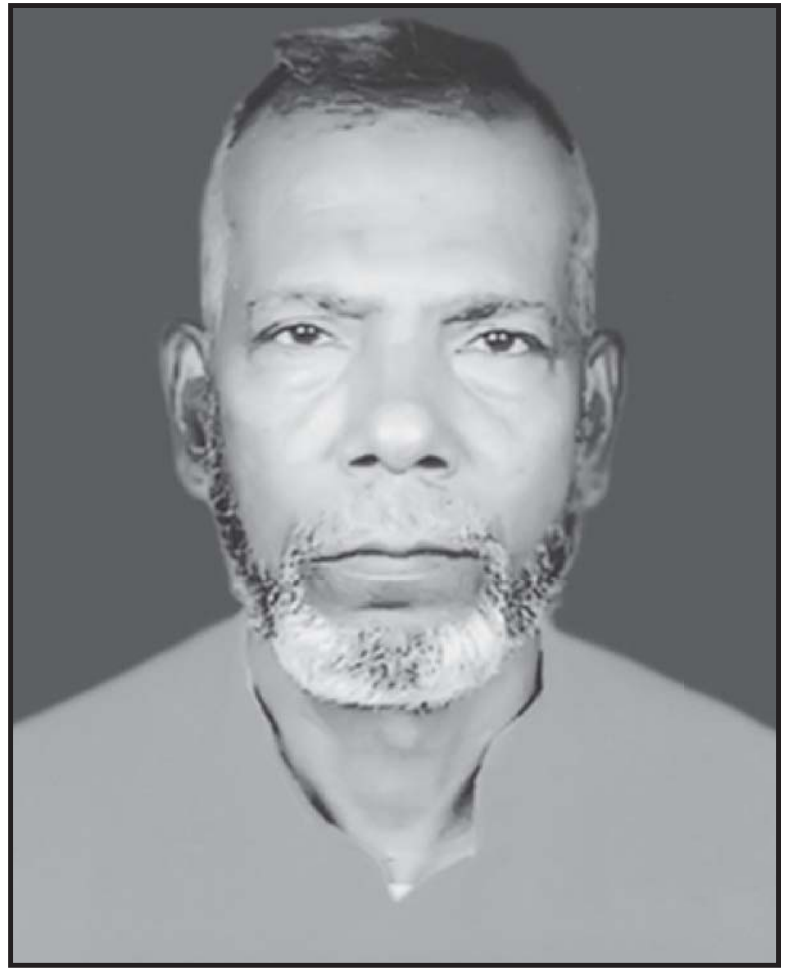

মুক্তিযোদ্ধা সেকেন পুলিশ

চাকুলিয়ার স্মৃতি/দিনগুলো

কল্যাণী ক্যাম্প থেকে আমাদের বাস অনুমান রাত ১০টায় ছেড়ে দিল। সাহা খাঁকে সাথে নিতে পারলাম না বলে মনটা খারাপ হয়ে আছে। চলনে বলনে একটু যে তড়িঘড়ি থাকবে তা নেই ওর মধ্যে। এসব লোক নিয়ে মারাত্মক কিছু করতে যাওয়া মানে বিপদ টেনে আনা এই ভেবে মনটাকে ঠাণ্ডা করলাম। বাসে উঠার আগে নেতারা আমাদের পথ খরচের জন্য ভারতীয় ৫০০ রুপি দিলেন আমাকে। আমি আবার তা রাখলাম কাজী হেদায়েত সাহেবের ভাগ্নে আঃ রশীদ এর কাছে। আমাদেরই বয়সী সে। এমএ পাশ। তবে এমএ'র কোন ধারধোর নেই ওর মধ্যে।

রাত তিনটায় বীরভূমের কোন এক অজ্ঞাত জায়গায় বাসগুলো থামলো আমাদের দৈহিক ভার কমাতে। নির্গমনের কাজ সারা হতেই পাশে ঝুপড়ি মার্কা এক হোটেলে আমাদের ঢুকানো হলো চা-পানি খাওয়ার জন্য। তবে খরচ যার যার। কাজী সাহেবের ভাগ্নের ইচ্ছে টাকাটা মেরে দেওয়ার। আমি বেঁকে বসলাম। সবাইকে টাকার কথা বলে দিলাম। ঐ টাকায় আমাদের চা-রুটি ভালোই খাওয়া হলো। যেমন মোটা ডাল তেমন মোটা রুটি। মানুষগুলোর মোটা গোফ, মোটা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। তিলক কাটা আছে কীনা রাতে খেয়াল করিনি।

ওস্তাদরা বলে দিলো, পথে বাসে থামানো হলেও খাবার খাওয়ার সুযোগ মিলবে না, যা করবার এবারেই করো। কয়েক প্যাকেট চারমিনার সিগারেট বেশি করে নিলাম। রুটি ডাল পেটে গেল না। যাও গেল ফিরে আসতে চাইছে বারবার। এক ঘণ্টার মধ্যে কাম-কাজ সেরে আবার বাসে ঢুকলাম। ভোর হয়ে বেলা উঠে গেছে। সকাল ৯ টায় আবার বাস থামানো হলো। যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমাদের কোথায় নেওয়া হচ্ছে তা বলা হয়নি। জিজ্ঞাসু হয়ে জানবো তাও নিষেধ। দেখলাম এক নদী। এক ওস্তাদ বললো, এ দামোদর। সামনেই বিদ্যাসাগর মহোদয়ের বাড়ি। এই দামোদর! দেখে হাসি পেলো। আমরা পদ্মা পাড়ের মানুষ। নদীর বিশালতায় ডরাই না। পদ্মার কাছে এতো নস্যি। মায়ের ডাকে বিদ্যাসাগর এই নদী সাঁতরে পার হয়েছিল? আমরা দিনে রাতে ১০০ বার পার হতে পারি। আমাদের মা বোনেরাও পারে। ড্রাইভারকে অনুরোধ করলাম,

আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের বাড়িটা একটু দেখবো।

দয়া করে বাস একটু থামাবেন ? দামোদরের উপর ব্রিজ পার হয়ে একদম পাকা রাস্তার গা ঘেষে বিদ্যাসাগর মহোদয়ের বাড়ি। অনেকেই জানে না এই মানুষটি কে এবং কী? নেমেই দৌড়ে গেটে। কেয়ারটেকার আছে একজন। টিনের ঘর। তার আসবাবপত্র, লাইব্রেরি, বইপত্র মোটকথা ব্যবহার করা সবকিছু সাজানো আছে যত্নের সাথে। হাতে সময় ১০ মিনিট। এই সেই মহা মানবের বাড়ি যার কথা আমরা বইয়ে পড়েছি। তাঁর কাজ, শিক্ষা, সমাজ সংস্কারের কথা সারা ভারতে আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। কেমন একটা আবেশ আমাকে বিবশ করে ফেলছে যেন। মন্টুর চল্ চল্ আর বকাতেই এক লাফে গেটের বাইরে। তারপর বাসে।

এবার আর ভিতরে নয়, বাসের ছাদে। ঠাসাঠাসি বসে ভ্যাপসা গরম খাওয়ার থেকে মুক্তি পেয়ে ছাদে ফুরফুরে বাতাসে উড়ে চলায় কী মজাই না লাগছে। দূর হয়ে গেল দেহ মনের ক্লান্তি। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলাম বুকের বেদনা। এপাশে ওপাশে সামনে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। আমাদের বাংলারও একই ছবি। মাঠে মাঠে শুধু নানা-রকম ফসল আর ফসল। এটাই মনে হয় বাসের ছাদে চড়ে আসার প্রথম কোথাও যাওয়া। গ্রীষ্মের দগদগে রোদ গায়ের উপর পড়তেই পারছে না গা পিছলে পড়ে যাচ্ছে অন্য কোথাও। হঠাৎ মন্টু বললো, দেখ, দেখ গ্রামগুলো সব আকাশে উঠে গেছে। গাছপালাও। সামনে তাকাতেই দেখি দিগন্ত ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে সমতলের সবুজ গ্রামগুলো। আমি সবাইকে প্রথম বললাম, ওটা পাহাড়। সবুজ হলো পাহাড়ের গাছপালা। বাস চলছে পশ্চিমমুখী বীরভূম ছাড়িয়ে বিহারের কোন এক জেলার দিকে। আমরা দ্রুত ধাবমান পাহাড়ের দিকে। মন শুধুই উতাল পাতাল করছে কখন পৌছাবো পাহাড়ের কাছে। জীবনের প্রথম পাহাড় দেখা। বইয়ে কত যে পড়েছি, দেখা হয়নি। এমনি করতে করতে পৌছে গেলাম পাহাড়ের কাছে। পাহাড় কেটে পথ বানানো হয়েছে। যে মাটিতে ঢুকলাম সে মাটি পিছনে ফেলে আসা মাটি নয়, লালচে মাটি। নেই কোথাও বিস্তৃত সমভূমি আর ফসলের ক্ষেত। উঁচু নিচু ঝোপঝাড়ে ভরা। কোথাও যেন লেখা দেখলাম, সিংভূম, বিহার। জেলা শহর দুমকা পরে জেনেছি। জেনেই বা কী হবে ? ঘুরে দেখতে পারবো না। পড়ন্ত

বেলায় আমাদের বাস ঢুকে পড়লো চাকুলিয়ায়। এক পরিত্যক্ত সেনানিবাসে আমাদের নামানো হলো এবং জেলাওয়ারি লাইন করানো হলো। আগে আসা সাথীরা আমাদের স্বাগতম জানাতে এসেছে। সাথে নিয়ে এসেছে খাবার। সেই মোটা রুটি আর বারো মিশালি সবজি। খেয়ে যেই পানি খেয়েছি অমনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তারপর আর মনে নেই। জ্ঞান ফিরে দেখি আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চিকিৎসা তাবুতে। ক্যাম্প খাটে শুইয়ে দেয়া হলো। দাঁত দুটো ভেঙে গেছে। থুতনি ভালোই জখম হয়েছে। দু'তিনটে সেলাই দিতে হলো। হাঁ করতে পারছি না। ব্যথায় জ্বর এসে গেছে। আমাকে তরল খাবার দেওয়া হয়েছে। আমার সাথীরা বিকেলে আমাকে দেখতে এলো। ওদের মন খারাপ। পরের দিনই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। মুখে ব্যান্ডেজ নিয়েই তাবুর হাসপাতাল ছেড়ে দলের সাথে বিছানা পাতলাম। মুখে ব্যান্ডেজ আছেই।

এরই মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের ছবিসহ একটা ফরম পূরণ করতে হলো। ওটাতে লেখা আছে 'টপ সিক্রেট'। অনেকের ফরমই আমি পূরণ করে দিলাম। ওরা শুধু সই করলো। আমাদের যারা ট্রেনিং দেন তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য। এখানে মোট ১১ টি উইং খোলা হয়েছে। আমরা ৬ নং উইং এর সদস্য। এটার চার্জে আছেন একজন সিনিয়র ভারতীয় ক্যাপ্টেন। নাম ডিকে খান্না। হালকা পাতলা অপূর্ব সুন্দর চেহারা। পরে জেনেছি রাজপুত। সেনাবাহিনীর কায়দায় আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। লাইন দিয়ে দাঁড়ানো, লাইন দিয়ে বসা। সবকিছুই হয় লাইনের মাধ্যমে। ক্যাপ্টেন খান্না আমাদের সাথে পরিচিত হলেন। আমরাও হলাম। ভাষার বাধা আমাদের এগুতে দিচ্ছে না। ওরা বাংলা বুঝে না। আমরা হিন্দি বুঝি না। আকার ইঙ্গিতে ৪/৫ দিন কাজ চললো। একদিন ক্যাপ্টেন বললেন, আমি যদি ইংরেজিতে বলি আপনাদের মধ্যে কি কেউ আছেন বাংলা করে অন্যদের বলতে পারবেন। হাত তুলুন। আমার থুতনি কাটা ঘা সারা সারা ভাব। আমি বসেই চারদিক দেখে নিলাম। কেউ হাত তুলছে না। সুনসান নীরবতা দেখে আমার লজ্জা লাগলো। অমনি হাত তুলে দাঁড়িয়ে বললাম, 'স্যার, আই ক্যান'। ক্যাপ্টেন সোজা আমার দিকে তাকালেন। বললেন কাম টু মি। আমি উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। উনি বললেন, আপনি

আপনার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন। আমি বুঝলাম, উনি আমাকে যাচাই করতে চাচ্ছেন। আমি শুরু করলাম।

'Respected wing Commander, Instructor and my friends, we have left our motherland to free her from the barbarous pakistanis. They are killing our people, raping our woman. Setting fire in our house. Many of us have lost brothers, sisters and kith and kin. Pak army has started genocide in Bangladesh. Now, We need training, arms & ammunitions to kill the pak junta. We shall not quit arms till our country is free. This is our oath. We are fighting for our motherland, they are fighting for illegal occupation. Our victory is must, as their fall is. Joy Bangla. বলেই থেমে গেলাম। সবার চোখ আমার দিকে। ক্যাপ্টেনকে খুশি মনে হলো। বললেন, Tell your friends what you spoke. বললাম, প্রিয় সাথীরা, এবার আমি বাংলায় বলবো। "শুয়োরের বাচ্চা পাকিস্তানিরা বাংলায় গণহত্যা শুরু করেছে। আমাদের মানুষদের হত্যা করছে। মা বোনদের ধর্ষণ করছে। ঘরবাড়ি কলকারখানা আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে। বাংলার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করছে। মা- বোন শিশু মরে পথের ধারে পড়ে আছে। শিয়াল কুকুর খাচ্ছে লাশ। আমরা ঘর ছেড়েছি, ওদের খতম করার জন্য বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা অস্ত্র ত্যাগ করবো না। এখন আমাদের প্রয়োজন ট্রেনিং আর অস্ত্র। আমরা আমাদের মাতৃভূমির জন্য লড়ছি। ওরা লড়ছে জোর করে দখল রাখার জন্য। আমরা জিতবই। ওরা হারবে। জয় বাংলা।"

ক্যাপ্টেন আমাদের সেদিন ভালো চা নাস্তা খাওয়ালেন। আমার কদর একটু বেড়ে গেল। বললেন, আপনাকে পিটি করতে হবে না। আপনার উল্টা ভালো হোক, তারপর করবেন। সবাই দৌড় পারে আমি শুয়ে থাকি ভালো লাগে না। তিন দিন পরে আমিও শুরু করলাম। সে কী পিটি! জান যায় যায়। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে ফুটবল, হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, ডুব-সাঁতার কাটার সব খেলা খেললেও পিটির দাপট কাহিল করে

ফেলছে।

খাবার দাবার, চলাফেরা সব চলছে আর্মি কায়দায়। যাহোক, টিকে গেলাম। মানে টিকতে বাধ্য হলাম। আমার ধারণা পালাবার কোন পথ থাকলে অনেকেই ভাগতো। ক্যাপ্টেন আমাকে সামস্ বলে ডাকেন। ইংরেজি থেকে বাংলায় বলার কাজ আমি আমার মতো বলে চলেছি। এদিক ওদিক হলেও ক্যাপ্টেন ধরতে পারবে না, তা আমি জানি। আমার বন্ধু ছাত্ররা যা বলছি তাতেই খুশি। একদিন ক্যাপ্টেন বললেন, সামস, আপনি আমার তাবুতে আসুন। কিছুক্ষণ পর এক সিপাই আমাকে নিয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে রইলাম। উনি আমাকে বসতে বললেন চেয়ারে। কাচুমাচু হয়ে চেয়ারে বসলাম। বললেন, এখন আপনি আমার মেহমান। আসুন একসাথে চা খাই। আর্মি অফিসারের দেওয়া নাস্তা আর চা খেলাম। খেলাম জড়তার সঙ্গে। মনে একটা চিন্তা খেলছে। উনি আমাকে তাবুতে ডাকলেন কেন? ভালো-মন্দ দুটোই মনের মধ্যে দোল খাচ্ছে। ভালোটা হলো আমি ওনাকে ক্লাসে সহায়তা করছি। তাই আমাকে অনার করছেন। মন্দটা হলো, আমি কী এমন কিছু করেছি, বলেছি যা আমাকে পাকিস্তানি চর হিসাবে ভাবতে পারে? অথবা অন্য কোন্ রিপোর্ট? এ ব্যাপারে আমাদের কল্যাণী থেকেই সাবধান করা হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর ছদ্মবেশে পাকিস্তানি চর ঢুকেছে। অতএব কথাবার্তায় কাজে কর্মে সাবধান। ক্যাপ্টেন বললেন, আমার অফিসিয়াল কাজে আপনার সাহায্য দরকার। আমার সাহায্যকারী হাবিলদার, হাবিলদার মেজর, জেসিও যারা আছেন তাদের দ্বারা অফিস চলছে না। অন্যান্য উইং কমান্ডার তাদের কাজে এগিয়ে আছেন। আমি পিছিয়ে আছি। সিও সাহেব বারবার তাগাদা দিচ্ছেন। বললাম, অব কোর্স, আমি কাজ করে দেবো। কাজের ধরণটা যদি বলেন স্যার। উনি আমাকে কাজের বিষয় দেখালেন। ফর্মগুলো সব ইংরেজিতে। প্রায় সাত/আট রকমের ফর্ম পূরণ করে সিও'র অফিসে জমা দিতে হয়। ঐদিনই আমি বিকেল চারটে পর্যন্ত কাজ করলাম। আমার হাতের লেখা, ভাষা দেখে উনি খুব খুশি। উনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার চা-নাস্তা সব এখানে হবে। শুধু খানাটা বাদে। কারণ আমার তাবুতে ঐ ব্যবস্থা নাই। আপ সিগারেট পিয়ো ? আমি চুপ দেখে মুচকি হাসলেন। উনি সিপাইদের কী কী বললেন তা জানিনে তবে

আমি না চাইতেই সব এসে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে অফিস আপ-টু-ডেট করে ফেললাম। দৈনিকের রিপোর্ট দৈনিক যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন মহাখুশি। এখন আমরা মাঝে মাঝে খোশ গল্প করি। অনেক সময় ব্যক্তিগত কথাও জিজ্ঞেস করেন। তবে আমার সাবধানী উত্তর। একদিন জিজ্ঞেসে বলে দিয়েছি আমি ফিজিক্সে মাস্টার্স। কোন এক সরকারী কলেজের সহ অধ্যাপক। স্টিল আনমেরিড। কথা খুব কম বলি। উনার কথা জিজ্ঞেস করিনে। মন বারণ করে। এখন আমাকে একবেলা পিটিতে যেতে বলেন। সেনা ভাষায় বলেন, ওটা প্রয়োজন আছে। পাকিদের সাথে ফাইট দিতে ফিজিক্যাল ফিটনেস খুবই দরকার। আপনারা গেরিলা কমান্ডো। সব তাতেই আপনাদের দক্ষ হতে হবে। আমি শুধু স্যার স্যার করে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে পাকি আর্মিদের ওদের দালালদের বিভীষিকাময় কর্মকাণ্ডের বর্ণনা আমার সাধ্যমতো ইংরেজিতে দিয়ে ফেলেছি, আমার মা, বোন, ভাই সব কোথায় আছেন জানিনে। হয়তোবা ওদের মেরে ফেলেছে, আমি মুক্তিতে যোগ দিয়েছি বলে। আমরা ভারতীয়দের দালাল ওরা জেনে গেছে। ওদের চোখে বাঙালি জাতি ভারতীয়দের দালাল হয়ে গেছে। তাই ওরা পোড়ামাটি নীতি ধরেছে। মাটি চাই, মানুষ চাইনে। বললাম, স্যার, আমাদের শুধু হাতিয়ার দেন। একটা পাকিকেও পাকিস্তানে ফেরত যেতে দেবো না। বাঙালি গেরিলা ওরা দেখেনি। হয় মৃত্যু, না হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ওর সাদা মুখে রক্তের খেলা শুরু হয়েছে। উনি আমাদের অবস্থা, বাঙালি জাতির অবস্থা অনুধাবন করতে পারছেন।

একদিন আমাকে বললেন, আপনি আমাকে বাংলা শেখান। আমি আপনাকে হিন্দি শেখাবো। আমাদের উভয়ের জন্য ভালো হবে। ইংরেজিতে আমরা কেউই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনে। বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ইতিমধ্যে আমাদের উইং এ এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। আমাদের কয়েকজন ওস্তাদদের সাথে মুক্তিবাহিনীর বাজে ব্যাপারে তিক্ততা সৃষ্টি হয়।

কিছু মুক্তি সরাসরি গোপনে চাকুলিয়ায় ট্রেনিংরত এক এমপিএ এর মাধ্যমে সিও গুপ্ত'র সাথে দেখা করে সব কথা বলে দেয়। সিও ছিলেন বাঙালি। আদিবাস নাকি ফরিদপুরে। পূর্ব পুরুষরা ১৯৪৭ এর আগেই পূর্ব বাংলা ছেড়েছিল। বাঙালির প্রতি সহানুভূতি থাকবেই, তাছাড়া একজন এমপিএ

সাথে আছেন। সিওর র‍্যাঙ্ক ব্রিগেডিয়ার। উনি সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন এ গেলেন। কারো ডিমোশন করা হলো, কারো হলো বদলি, কারো অন্য পানিশম্যান্ট, যা আমরা জানতাম না পরে শুনেছি। এমন কী আমাদের ক্যাপ্টেনকে সিও কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। এরপর থেকে শুরু হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিটি। সামান্য ত্রুটিতে কঠিন শাস্তি। আমি তো তাবুতে কাজ করি। একদিন মন্টু দৌড়ে এসে বললো, দেখে যা। গিয়েই দেখি আমাদের দলের কয়েকজনের এবং অন্য থানার কয়েকজনের মাথার উপর ২/৩ মণের পাথর চাপিয়ে দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে। আমি এক দৌড়ে তাবুতে এসে ক্যাপ্টেনকে বললাম, Sir, Please Come and see what the Instructors are doing. উনি দ্রুত এলেন। দেখেই বললেন, ফেক্ দো। শব্দটা আজো আমার কানে বাজে। কে কে যেন মাটিতে পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলো। 'শেরপর পানি ঢালো।' বলেই একটু দূরে দাঁড়িয়ে গেলেন। পানি ঢালা শুরু হলো। ওরাও কৈ মাছের মতো কাঁতরাতে কাঁতরাতে বসে ঝিমুতে লাগলো। সে এক বিশ্রি অবস্থা। আমি তাবুতে গেলাম। দেখলাম, ক্যাপ্টেন একটু বিমর্ষ। বারবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। বললাম, Sir, No Works at hand. You look sad, why? I don't know. ok Shams you go and take rest. No PT in the afternoon. All are at leisure.

পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন নিজেই আমাদের নিয়ে মাঠে গেলেন। অন্যান্য উইং এর মুক্তিরাও ট্রেনিং নিচ্ছেন। হঠাৎ সিও সাহেবের গাড়ি আমাদের কাছে এসে হাজির। ক্যাপ্টেন আমাদের দাঁড়া করে দৃপ্তপদে জিপের কাছে গিয়েই স্যালুট দিলেন। সিও নামলেন। একটু দূরে তাঁরা উভয়ে সরে গেলেন। কী আলাপ হলো জানি না। ক্যাপ্টেন এর মুখটা থমথমে। দুপুর হয়ে গেছে। আমরা উইং এ ফিরবো খাওয়ার জন্য। ক্যাপ্টেন আমাদের নিয়ে উইং এ এলেন। আমরা গোসল সেরে খাওয়া খেয়ে বিশ্রামে। বিকেলে ক্যাপ্টেন আবার এলেন। আমাকে তাবুতে ডাকলেন। বললেন, বসুন। আমার উইং এ একটা কিছু ঘটে গেছে ফলে আমার সিপাহীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারা সিও এর কাছে গিয়ে কী কী বলেছে, এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন? আসলেই আমি জানি না।

বললাম, I am in dark regarding the matter, believe me.

আমি আর এগুলাম না। কী ব্যাপারে কী বলে শেষে আমার পর দোষ পড়বে। তিনি বললেন, It is a disgrace for me , for my people who sufferd punishment without report from me. Absurd! আমরা চা খেলাম। পরে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম। ক্যাপ্টেনকে কঠিন মনে হল। বললাম, If I come to your help, tell me unhesitatingly. শুধু বললেন, Thank you. সাঝের খাবার সেরে ইটের বালিশ মাথায় দিয়ে মাটিতে বিছানো শতরঞ্জির উপর শুয়ে পড়লাম। আমরা সবাই এই ব্যবস্থায় শুই। আমাদের ঘরটা ছনের প্রায় ২০০ হাত লম্বা। চল্লিশ ফুট চওড়া। বেড়াও ছনের। ভালোই লাগে। গ্রামের কুশোর খোলায় শুয়ে থাকার মতো। আমরা প্রায়ই খাওয়া দাওয়ার পরে তাস খেলি। আড্ডা মারি। আমি আজ নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। ইতোমধ্যে মুকসেদ পুরের কবিরের সাথে ভাব হয়ে গেছে। সে আমার ভক্ত ও অনুগত হয়ে গেছে। ওর দল ছেড়ে এসে আমার বিছানায় আড্ডা দেয়। বয়সে বেশ ছোট হওয়ায় তুই বলেই ডাকি। আমার ফাইফরমাশ খাটে। শুতেই আমার বিছানায় বসলো। বললাম, এখন যা, রাত গভীর হলে আমাকে ডাকিস। কথা আছে। মন্টুকেও কিছু বললাম না। ঘুমিয়ে গেছি। ছোট ছোট চিমটি আর গুতো আমাকে জাগিয়ে তুললো। চোখ মেলে দেখি কবির হাসছে। বুঝলাম, ব্যাটা একটুও ঘুমায় নাই। নিজের বিছানায় ঘাপটি মেরে পড়েছিল। ঘরের আড্ডা শেষ হবার পর, এখানে এসেছে। চল্ বাইরে যাই।

ঘরের সামনেই সুন্দর উঠোন আমরা বানিয়ে নিয়েছি। গাছের মোথা, গুড়ি, লাকড়ির স্তূপ আমাদের বসার জায়গা। ঘুটঘুটে আঁধার। ক্যাপ্টেন এর কাছ থেকে যা শুনা তা ওকে বললাম। দেখলাম ও জানে ভয়ে আমাকে বলেনি। ছোট মানুষ বড় ব্যাপারে নাক গলানোর সাহস হয়নি। ও আমাকে নাম ধরে ধরে বললো। দেখলাম আমার দলেরও কয়েকজন আছে। শুনে চমকে উঠলাম। পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে, ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু যারা করেছে তারা এসব ভাবেনি, বা ভাবার বয়স হয়নি। একটা একটা করে নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে। অন্যভাবে রিপোর্ট হতে পারে। ভাবলাম একজন এমপিএ জড়িয়ে গেছেন। সিও অ্যাকশন নিয়ে ফেলেছেন। পানিশম্যান্ট অন্যভাবে

আসবে, আসল বিষয় নিয়ে নাড়াচড়া হবে না। কবির বললো, বলেন না ? কী হয়েছে ? কিছু হয়নি বলে, ধমক দিয়ে শুতে যেতে বললাম।

ক্যাপ্টেন এর তাবুতে ঢুকে কাজ শুরু করেছি। ক্যাপ্টেন এসেই আবার বেরিয়ে গেলেন। সামস আমি একটু আসছি। একটা মিটিং আছে। I need you at noon. ঠিক দুপুরে খাওয়ার আগে উনি ফিরলেন। আমি কাজ বুঝিয়ে দিতেই বললেন, লাঞ্চ এ যান। বিকেলে আবার আসবো। হাবভাব কিছু বুঝতে পারলাম না। দুপুরে যেয়েই বিছানায় কাত হলাম। ভয়ে মনে মনে ইংরেজি যোগাড় করতে লাগলাম, যাতে আমার ক্যাপ্টেনকে বুঝাতে কাজে লাগবে। খুব ছোট ছোট কথা কিন্তু অর্থবহ। যোগাড় আর হয় না। যাও হয় মনে ধরে না। তবু লেগে থাকলাম। পাশের বিছানায় কাউকে জিগাবো এমন কেউ নেই। ভাবলাম তিন ভাষা মিলিয়ে ঘন্ট করে পাতে ধরবো। এছাড়া আর উপায় কী? হিন্দি রপ্ত করার চেষ্টা করছি কাজে লাগানোর জন্য। বিকেলে ক্যাপ্টেন এর সাথে পিটিতে যোগ দিলাম। উনি একটা গ্রুপ বেছে নিলেন। সে গ্রুপ এ আমি আছি। আমার নিকট সাথীরাও আছে। ক্যাপ্টেন পুরো সেনাবাহিনীর তালিম দিচ্ছেন। আমরা যে সাধারণ এটা উনি ভুলেই গেছেন, আমরাও ভুলে গেছি। আমি জানি উদ্ভূত সমস্যা সহজে মিটবে না গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। আমার ভীষণ ভয় করতে লাগলো। ঘটনার সাথে যারা জড়িত রাতে তাদের ডেকে বসালাম। তোমরা যা করেছো ভালো করোনি। যা বলেছো ঐটাই ঠিক। আর তোমরা উইং এর বাইরে যাবে না। গেলে ক্ষতি হতে পারে। এখানে সব তদবির অকার্যকর। শুধু তোমাদের এক কথায় শাস্তি হবে, 'তাহলো তোমরা পাকিস্তানি চর।' ঘরের ও তাবুর কারো কাছে কিছু আলাপ করবে না। এই মুহূর্তে কেউ বিশ্বাসী নয়। ওরা বিশ্বাস করলো ক্যাপ্টেনকে দিয়ে ওদের উদ্ধারের ব্যবস্থা দেখে আমাকে ওরা আস্থায় নিয়েছে। আমার ধারেরকাছেও আসবে না। পিটি করার সময়েও না। আরো বললাম, ক্যাপ্টেন তার লোকদের দিয়ে নজরদারি শুরু করেছেন। ঐ লোকগুলো আমাদের মধ্যে তোমাদের পাশেই আছে। অতএব সাবধান ! যাও যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, কয়েকদিন হলো আমাদের ওস্তাদরা অন্য উইং এর ওস্তাদদের নিয়ে আমাদের তাবুতে আসে, একেকদিন একেক

তাবুতে। ব্রিজ খেলাও চলছে, চলছে ধুমপান। মুক্তিদের টাকা নাই, খরচ পাতিও ওরাই করে। আমার মনের চোখ আরো বাড়িয়ে দিলাম। গন্ধ শুকার মতো যতগুলো পথ আছে তাদের সব দরজা খুলে দিলাম। একদিন আমি, মন্টু, ইন্তাজ আর কে কে যেন মুদি দোকানে কিছু কিনতে গেলাম। দোকানটা আমাদের উইং এর বাইরে। অন্য উইং এর শেষ মাথায়। এখানেও ওস্তাদরা কেনাকাটা করেন। কেনাকাটা শেষ। ফিরে আসার জন্য পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ সামনে এসে দুজন ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্‌ছা উইং হায়?' সিক্স উইং আমি বললাম। এধার আও। বলেই ফাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, তোমতো সব বানছুত আদমি হ্যায়। হামারা লোককো নকরি খা দিয়ে। পানিশম্যান্ট দিয়ে সার্ভিস বহি পর লাল দাগ লাগিয়ে আরও কিচিরমিচির করে কী যেন বললেন। এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোম লোগ এ মাঠ কা ঘাস সাফ করো।' বলেই ধমক লাগালেন। আমরা তুলতে শুরু করলাম। ১০/১৪ মিনিট তোলার পর বললেন, মাত করো। আমি বুঝে ফেললাম ওদেরও বোধহয় অন্য কোথাও কাজ আছে। ঘাস তোলানোর সময় হাতে নাই। জিজ্ঞেস করলেন, তুম হিন্দি সমঝতে ? আমি বললাম, ওস্তাদজী; হিন্দি থোড়া থোড়া সমঝতে। একটু থামতেই একজন বললো, ইংলিশ জানতা হু। ইয়েস বলেই শুরু করলাম।

'We are bad people, we know, because we are fighting against the park army. But we could not understand how did we sack your people, impose punishment and bad remarks in the service book? These are vigorous punishment for a service holder. A service book is a noble book. So who are responsible for their sufferings should severly treated.'

লোকটা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, বইঠো। আমরা ঘাসের উপর ওনারাসহ সবাই বসে পড়লাম। তুম সিগারেট পিয়ো? আমরা চুপ। গোল্ড ফ্লেক এর প্যাকেট বের করে আমাদের সবার একটা একটা করে দিলেন। উনি আর একজনকে বললেন, দোকান ছে চা লে আও। ঐ ওস্তাদ চলে গেলেন। চা এসে গেলে আমরা সবাই বিস্কুটসহ

চা খাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞেস করলেন, দেশে কে কী করতাম। তাও জিগালেন। সবাই প্রায় ছাত্র। শুধু আমি বললাম, পদার্থে মাস্টার্স করেছি। একটা কলেজে শিক্ষক হিসাবে ঢোকার কথা ছিল। ঢোকা হলো না, দেশ ছাড়তো হলো। তুম টিচার হু। বলেই আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। আমি লক্ষ্য করলাম টিচারদের প্রতি এদের বড় দুর্বলতা। আমার ক্যাপ্টেনকেও দেখেছি। এদেরকেও দেখলাম। হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা মিলিয়ে আমরা আলাপ করছি। আমি বললাম, আমাদের সবার পরিবার কৃষক পরিবার। গ্রামে বাস। লেখাপড়ার জন্য শহরে যাওয়া। ঠিক আপনাদের পশ্চিম বাংলার মতো। একই জীবন যাত্রার ধরণ। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পরিবারের খবর পেয়েছো? কল্যাণী থাকতে কিছু খবর পেতাম। লোকজন আসছে। যাচ্ছে। এখানে তো সে উপায় নাই। শুনেছি বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। সবার পরিবার ভিটে ছাড়া।

যাদের সামনে পেয়েছে তাদের গুলি করে মেরেছে। যুবতি মেয়েদের তুলে নিয়ে গেছে। উঠিয়ে বলতেই সবাই দাঁড়ালাম। দোকান থেকে সবার জন্য এক প্যাকেট করে সিগারেট আর এক প্যাকেট বিস্কুট আমাদের হাতে জোর করে গুজে দিলেন। আমরা অবাক হযে চেয়ে ছিলাম। বললেন, সরি ভাই, 'তোমাদের অপমান করেছি' আমি বললাম, ওস্তাদ জি, আমরা আগামীকাল না হয় অবসর সময়ে ঘাসগুলো তুলে দিয়ে যাবো। ঘাসে ভরে গেছে মাঠটা। নো, নো, আপনারা আসবেন না। ঐটার অন্য ব্যবস্থা হবে। আমি ক্যাম্পে আপনাদের সাথে আড্ডা মারতে যাবো। গুড নাইট।

বলেই হাঁটা দিলেন। আমার সাথীরা চুপচাপ। সিগারেট পেয়ে সবাই খুশিই না, মহাখুশি। আমার মাথার মধ্যে কী যেন ঘুরপাক খেতে লাগলো। ওদের কোন বদ মতলব এর কথা আমার মাথায় এলো না। নিশ্চিত হলাম যে সব উইং এর ওস্তাদরা মিটিং করে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করেছে। অথচ ব্যাপারটা যে কী তা আমি নিজেও জানি না। আমার সাথীদের বললাম, ওনারা এলে আমি থাকলে তো ভালোই। না থাকলে সম্মান দিয়ে বসাবে। সিগারেট দেবে। আর তো কিছু নাই। তবে কথা বুঝে বলবে। ঘাস তোলার পর থেকে আমরা আর ওদিকে যাইনে। ক্যাপ্টেনও আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন না। অফিসের কাজের চাপ বেড়ে গেছে

বেশি। কিছু কিছু ওস্তাদ বদলি হয়েছে। সেদিন ক্যাপ্টেন এর তাবুতে কাজ করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বের হয়েই সিগারেট টানতে টানতে আমাদের ঘরের দিকে আসছি। হঠাৎ দেখি হরিতকি গাছের গোড়ায় কে যেন উবু হয়ে ভূতের মত বসে আছে। কে রে? আমি দাদা! দেখি কবির। তুই এখানে কী করছিস? তাড়াতাড়ি ঘরে যান। গিয়ে দেখি সেই ওস্তাদরা। সালাম দিয়ে হাত মিলিয়ে বসে পড়লাম। পাশে ব্যাগ ভরা সিগারেট আর বিস্কুট। 'আপনি ক্যাপ্টেন এর তাবুতে কী কাজ করেন? স্যারের অফিসটা আপ-টু-ডেট করে দেই। দিনের কাজ যাতে দিনে হয়। পেন্ডিং না থাকে। ড্রাফটগুলো আপনিই করেন? কিছু না বলে হাসলাম। তাই তো আপনাদের রিপোর্ট পেন্ডিং থাকে না। অন্যদের তাগিদ দিতে দিতে জান শেষ। মি. খান্না ঠিক লোকটি জোগাড় করেছেন। আপনি কী পিটি প্রশিক্ষণে যান? হ্যাঁ, যাই। মি. সামস আপনাদর জন্য কিছু নাস্তা এনেছি। যদিও এটা নিয়মবহির্ভুত। ওনাদের দিতে গেলে নেয় না। সবাই বলে উনি আসুক। কাইন্ডলি সবাইকে দিন। আমি সবাইকে বিস্কুটগুলো বিলিয়ে দিলাম। সিগারেটের প্যাকেটগুলো আমার নিজের কাছে নিয়ে গেলাম। কাউকে দিলাম না। দিবো যে তার লক্ষণও দেখালাম না। উনি শুধু তাকিয়ে রইলেন। এগল্প সেগল্পে রাত হয়ে গেলে ওনারা উঠলেন। বললেন, দোকানে গেলে ভালো আড্ডা দেওয়া যায়। সেই সাথে চা বিস্কুটও। এখানে তো ওসব হবার নয়। এতোদিনে হিন্দি ভালো বলতে না পারলেও বেশ চলার মতো বুঝতে শিখেছি। পরেরদিন সন্ধ্যা নামার পরপরই মন্টুর ঠেলাঠেলিতে আমরা গেলাম। সেদিন সাথে কবিরও গেল।পৌঁছতেই 'আইয়ে আইয়ে' বলে খুশিতে ওস্তাদজী এগিয়ে এসে হাত মেলালেন। দোকান থেকে একটু দূরে আবার সেই ঘাসের উপর বসলাম। চা বিস্কুট এলো। সবাই আড্ডায় মেতে উঠলাম। যুদ্ধের গল্পই বেশি। আমার সিগারেট ধরানো দেখে ওরা বুঝলো এ ব্যাপারে আমি নব্য। হঠাৎ বললো, 'ক্যাপ্টেন খান্না আপনাকে খুব পছন্দ করেন। বললেন, উনি অতি সজ্জন ভদ্র ও মেধাবী। বললাম, আপনার সাথে বুঝি স্যারের দেখা হয়। কথা হয়? হয়ই তো। দেখুন দয়া করে ঐ ঘাস তোলার গল্পটা করবেন না। না করবো না। তবে আপনাদের সঙ্গে মেলামেশার খবরটা উনি জানেন। কেমন করে? বললেন, সেনাবাহিনীতে গোয়েন্দার পিছনেও গোয়েন্দা থাকে। থাক ওসব। একদিন ওনার তাবুতে যাবো। আর এক কাপ চা শেষ করে গুড নাইট বলে

তাবুতে ফিরলাম। খাওয়া দাওয়া শেষে কাত হয়ে সিগারেট ধরাতেই বিড়ালের মতো কবির এসে পিঠ ঘেষে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরেই আমরা তাসে বসবো। সিগারেটের প্যাকেটগুলো কবিরের হেফাজতে। ও খায় না। অতএব নিরাপদ। দিনেরাতে ৩/৪ বার প্যাকেট গুনে। লিখে রাখে কয়টা গেল। মন্টু হাজারো তোয়াজ করেও এক প্যাকেট বের করতে পারে নাই। আমার অবর্তমানে হাম্বিতাম্বি মারে কোন কাজ হয় না। হুকুম নাই, ব্যাস। সিগারেট কিনে দিতে রাজি, তবে ওখান থেকে নয়। বুঝি, কবির ওদের মাঝে মাঝে এটা ওটা খাওয়ায় ভালোই। খাওয়াও মেলে সিগারেটও মেলে। মাঝে মাঝে আমার জন্যও কিছু আনে। আমি অতো খেয়াল করিনি কিছু জিজ্ঞেস না করেই খেয়ে নিই।

সন্ধ্যা নামলেই দোকানটা আমাদের টেনে আনে। ভিতর থেকেই সন্দেহটা কমে আসছে। আর এক সপ্তাহ পরেই জয় বাংলা মার্চ। এখানে আসার পর থেকেই আমাদের ফৌজি আইনে বেঁধে ফেলা হয়। সকাল ৬ টায় ওস্তাদদের হুইসেলের তীব্র শব্দে ঘুম ভাঙে। ড্রেস পরেই মাঠে দৌড় দিতে হয় ৮টা পর্যন্ত। বলে দেওয়া হয় সকাল ৯ টায় হাতিয়ার নিয়ে ট্রেনিং শুরু হবে। প্রথম দিকে সবাইকে থ্রি-নট-থ্রি দেওয়া হতো। জঙ্গলের মধ্যে গ্রুপ, গ্রুপ করে বসায়ে শিখানো হয় রাইফেলের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, কার্যক্ষমতা, গুলি করার কৌশল ইত্যাদি। যন্ত্রাংশ খুলে পরিষ্কার করা। পুনরায় সংযোজন করা। ব্যারেল পরিষ্কার ইত্যাদি হাতে কলমে শেখানো হতো। ওস্তাদরা চেক করতেন কার ব্যারেল কতো পরিষ্কার, দুপুর ১২ টায় রাইফেল জমা দিয়ে গোসলে বের হতাম। গোসলের কোন জায়গা নেই। পরে জানলাম এক ক্রোশ দূরে একটি ডোবা আছে। গিয়ে দেখি পাহাড়ি ক্ষীণ ঝর্ণা থেকে পানি জমেছে সেখানে। পানির রঙ লালচে। আমাদের দেশে গরু ছাগলও ওতে নামে না। এক দিনেই কাপড় চোপড় সব গেরুয়া রঙ ধারণ করেছে। পরবর্তীতে এই সমস্যা দূর হয় বাহির থেকে পানি সাপ্লাই হওয়ায়। এরপর এস. এল. আর, এস.এম.জি, এল. এম.জি গ্রেনেড বিভিন্ন শুটার মাইন ও বিস্ফোরণ বিষয়ে বিরামহীন প্রশিক্ষণ চলে। গ্রেনেড প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় উঁচু নিচু পাহাড়ে। কয়েকদিন পর পর রাতে চাঁদমারী হতো। চাঁদমারীতে আমাদের মতিন খুব ভালো করতো। ওস্তাদরা ওকে বলতেন, 'তোমহারা নিশানা বহুত পাক্কা হায়।' টানেলের মধ্য দিয়ে কী রকম চলতে হয় তাও আমাদের শিখানো হয়, প্রায় আধা কিলো মতো

লম্বা টানেল। পিঠে রাইফেল, মাজায় গুলির বেল্ট। ভিতরে কোন ম্যাচ, সিগারেট লাইট দাহ্য পদার্থ নেওয়া যাবে না। সিগারেটও নিষেধ। অন্ধকার গুহা, তবে সাপটাপ থাকা অসম্ভব নয়। কবে কারা যে এটা বানিয়েছিল তা আর জানতে পারিনি। আমি সবাইকে বলেছিলাম ম্যাচ, লাইট সিগারেট জ্বালানোর ফলে কার্বন মনো অক্সাইড গ্যাস তৈরি হবে। সবাই মারা যাবে। তাই সাবধান! তবে আমার কাছে সিগারেট লাইট ছিল। ওস্তাদ আমাকে চেক করেননি। দলে দলে ঢুকছি আর ওমাথায় বের হচ্ছি। বের হওয়া মাত্রই দক্ষিণা বায়ু প্রাণ জুড়ায়ে দিচ্ছে। আমরা গাছ তলায় বসে সিগারেট টানছি। আমাদের ক্রলিং করে এগুতে হচ্ছে। পাকের ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতো হতো। প্রতিদিন ১০ জনের গ্রুপ বনে যেতাম জ্বালানি সংগ্রহ করতে। মরা গাছ, মরা বাঁশ, মরা ডাল কেটে এনে জমা করতাম। কখনও কাঁচা তাই কাটতাম।

এলাকাটা সাঁওতালের। বনভূমি, লাল মাটি, ছোট ছোট টিলা। তার নীচে খাদ। বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি আমার নজরে পড়েনি। হয়তো ক্যান্টনমেন্টের বাইরে থাকতেও পারে। হঠাৎ একদিন কে যেন বললো বাইরের রাস্তার অদূরেই সাঁওতাল পাড়া। আজ ওদের একটা অনুষ্ঠান আছে। দুই ওস্তাদকে বললাম, আজ সন্ধ্যায় ওদের অনুষ্ঠান দেখতে যাবো। অনুমতি চাই। যাবার আগে আমাকে বলে যেও। জ্যোৎস্না রাত। বন পথ। জ্যোৎস্না লুটিয়ে লুটিয়ে মজা লুটছে বন পথে। ওদের নাচ গান দেখলাম। ছেলে মেয়েরা নাচছে আর নাচাচ্ছে। ওদের সবচেয়ে ভালো লাগলো বাঁশি। রাত ১১ টায় ফিরে এলাম কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে অনেকদিন পর আনন্দ উপভোগ করলাম। আমাদের ঘর থেকে পাহাড় দেখা যায়। মনে হয় ঐতো পাহাড়। আধা মাইলও হবে না। ওস্তাদকে বললাম, পাহাড়ে নিয়ে যেতে হবে। উনি বললেন, এল.এম.জি চাঁদমারীর দিন নিয়ে যাবেন। একদিন পরেই বললেন, আগামীকাল এল.এম.জি চাঁদমারী। সকালে পিটি হবে না। নাস্তা সকাল সকাল খেয়েই রওনা। সকাল ৮.৩০টায় রওনা হলাম। পথ আর ফুরায় না। অস্ত্রটা ভারি হওয়ায় দুজন মিলে একটা নিতে হতো। প্রায় দু'ঘন্টা পর সেখানে পৌঁছালাম। সেটা একটা বাগান। সেগুন বাগান। গাছের তলা পরিষ্কার। গাছে নাম্বার দেওয়া। আজ বুঝতে পারি।

সেটা সরকারী বনভূমি। লাকড়ি যোগাড় করেছি ছেঁড়া ছেঁড়া বন থেকে। এ বনে একটা গাছও কাটা দেখলাম না। এটা পাহাড়ের ঢালের নীচের সমভূমি। আমরা বসে কিছু খেয়ে নিলাম। প্রতি এল. এম.জি'র পিছনে ৪ জন করে আমরা। প্রায় দুঘণ্টা চললো আমাদের চাঁদমারী। দুটোর দিকে তাবুতে ফিরলাম। পাহাড়ের ঢাল দেখা হলো। পাহাড়ে উঠা হলো না। আমাদের চালা ঘর থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে ঘেরা সবুজ পাহাড়গুলো দেখা যেতো। আমি আর কবির কত দিন যে হরিতকি গাছের গোড়ায় বসে পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে সোনালি সূর্যের ডুবে যাওয়া দেখছি। বনের মাথায় অস্তাগামী সূর্যের সোনালি আলোর লুকোচুরি দেখে কী যে ভালোই না লাগতো। আজো তা মনের পর্দায় উজ্জ্বল।

জয় বাংলা মার্চ-একটা লংমার্চ। প্রায় আসা যাওয়ায় ৫০/৬০ কিলো। পাহাড়ি পথে মার্চ। সাথে রাইফেল মাজায় গুলির বান্ডিল। পিঠে পানি। কিছু লুচি বিস্কুট। আমাদের সাথে সিগারেট থাকলেও তা সম্পূর্ণ নিষেধ। হঠাৎ একটা কথা মনে এলো। এই মার্চের সময় অনেকেই গুম হয়ে যেতে পারে। যারা ওস্তাদদের চাকরি খাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট , তারাই টার্গেট। আমাদের মধ্যে ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হলো। রওনা হওয়ার দুদিন আগে কথাটা আমার ক্যাপ্টেন এর কানে তুললাম। উনি বললেন, অ্যাবসার্ড। গুজব সব গুজব। আমাকে আশ্বস্থ হতে না দেখে শেষে বললেন, 'I am the first. You are the 2nd & next your group.' কোন ওস্তাদ আপনাদের লিড দেবে না। আমি নিজে দেবো। আপনার দল যেন দলছুট না হয়। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। ওসব কিছু ঘটবে না। এবারে আমি শান্ত হলাম। আমাদের সাথীদের ক্যাপ্টেনের কথাগুলো অধিকাংশ বলে দিলাম। 'আগে ক্যাপ্টেন। তারপর আমি, তারপর তোমরা। দলছুট হওয়া যাবে না, ব্যাস।'

সন্ধ্যায় আবার ঐ দোকানের সামনে একত্র হলাম। আইয়ে আইয়ে বলে আমাদের আহ্বান জানালেন, 'সুনীল যোশী'। আমি অনেকটা ফ্রি ও নির্ভীক হয়ে গেছি। চা পানের এক পর্যায়ে মি. যোশীকে বলে ফেললাম, মি. যোশী আপনি কী একটা গুজবের কথা শুনেছেন? জয় বাংলা মার্চে কিছু ছেলে গুম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যারা ওস্তাদদের শাস্তির পিছনে জড়িত। হ্যাঁ,

শুনেছি। তবে এগুলো উড়ো খবর। আপনাদের কাছে উড়ো হলেও আমাদের কাছে ভীতিকর। বলেই ওনার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকলাম। উনিও জোর দিয়ে বললেন ওসব মিথ্যা। যারা মার্চে যেতে অনিচ্ছুক এসব তাদেরই রটনা। আপনার উইং এর সব ওস্তাদকে বলে দেবো। আপনাদের প্রতি যত্নবান থাকতে। আপনি তো জানেন ভারত সরকার কত ক্রিটিক্যাল সময় পার করছে? একটু এদিক ওদিক হলেই সারা বিশ্ব হৈ হৈ করে উঠবে। এক রাশিয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কেউ নেই। বিশ্বের সকল গোয়েন্দা সংস্থা ঝেকে ধরেছে ভারতকে। তাছাড়া এদেশের অবাঙালি মুসলমানরা চায় না পাকিস্তান হারুক। আমাদের ঘরে বাইরে বিপদ। জানেন, তদন্তে উঠে এসেছে আমাদের ইনসট্রাকটররাই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সদ্ব্যবহার না করার জন্য দায়ী। তাদের অপরাধটা শাস্তির যোগ্য। দু'একটা নির্দোষ ওস্তাদ পড়ে গেছে। পুন: তদন্তে আমরা ওটা ঠিক করে নেবো। আমরা দোষী হলে কী করতেন? গুম করতেন না পাকিস্তানি স্পাই বলে সোজা জেলে? ও প্রসঙ্গ থাক। চলুন উঠি। আমরাও চালা ঘরে ফিরলাম। মন থেকে একটা বোঝা এই ভেবে নেমে গেল যে আমাদের ছেলেরা নির্দোষ। ঐ তদন্ত রিপোর্টের ফলাফল কোনভাবেই আমাদের জানার উপায় ছিল না। যোশী জানিয়ে দিলেন। আগামীকাল আমরা মার্চে বের হবো। তাই আজ পূর্ণ বিশ্রাম। সন্ধ্যায় যোশী এলেন সাথে আমাদের ওস্তাদরা। বেশ আড্ডা দেওয়ার পর আমাদের দেখিয়ে বললেন, তোমরা এদের খেয়াল রেখো। সবাই ছাত্র এরা। এতো কঠিন ট্রেনিং এরা পারবে তো ? কথা ছিল বিকেলে যাত্রা শুরু হবে। হলো না, হলো সন্ধ্যা বাদ। ক্যাপ্টেন এর কথা মতোই আমরা আছি, আর চলছি। কখনও পাহাড়ে উঠছি, আবার নামছি। পায়ে চলা পথ। ডানে বায়ে পা ফসকালে অন্ধকারে কোথায় গিয়ে যে পড়বো তার ঠিক নাই। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। পথ পিচ্ছিল হয়ে গেল, ক্যাপ্টেন শুধু পিছনে মুখ ফিরে বললেন, সবাইকে সাবধান করে দেন। লাল মাটি বৃষ্টি পেলে উতলে ওঠে পা দাঁড়ায় না। রাত তিনটার দিকে একটু সমতল জায়গায় পৌঁছালাম। চারদিকেই ছোট ছোট পাহাড় ঘিরে আছে জায়গাটা।

বসে পড়ার কথা বলতেই সবাই শুয়ে পড়লো। পরে জানলাম পিছনের গ্রুপটা ছিটকে গেছে। সাথীরা সবাই জিজ্ঞেস করে সিগারেট কি খাবো ? বললাম, দাঁড়া স্যারকে জিজ্ঞেস করি। স্যার সম্মতি

দিলেন। তবে বললেন শুয়ে কাত হয়ে খেতে হবে। দূর থেকে আলো যেন দেখা না যায়। যারা টানে, তারা সিগারেট টানা শুরু করলো। আধা ঘণ্টা পর বললেন, উঠিয়ে। আবার যাত্রা শুরু। সূর্য উঠার আগে আমাদের নিয়ে ক্যাপ্টেন আর একটু গভীর বনে ঢোকলেন। সবাইকে লাইন করে বলে দিলেন, এখানে কিছু খেয়ে বিশ্রাম করেন। কোন শব্দ হবে না। হাতিয়ার সাবধান, পিছনে শত্রু আছে। হাতিয়ার বা এর কোন অংশ খোয়া গেলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। ক্ষিদের চোটে যার যা ছিল শেষ করে দিলাম। তারপর সবাই রাইফেল বুকের কাছে নিয়ে গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়লো।

আমি কবিরকে বললাম, আধা ঘণ্টা পর পর তুই একটু ঘুরে দেখিস কার কী অবস্থা। আমার ডান পাশে মতিন (মন্টু) বাম পাশে কবির। কিছুক্ষণের মধ্যেই কারো হুশ পাওয়া গেল না। গভীর ঘুমে চলে গেছে। দুপুর ১ টার কাছাকাছি হতেই ওস্তাদরা এসে জানালেন, খাবারের ভ্যান এসে গেছে, আপনারা উঠে পড়ুন। কীসে করে যে কী খেলাম আজ আর তা মনে নেই। কিন্তু পানি নেই। এইবার আমরা বুঝতে পারলাম অনতিদূরে বনের মাঝ দিয়ে একটা পাকা রাস্তা চলে গেছে। যাহোক খাওয়া শেষ করে গামছায় হাত মুখ মুছে কবিরকে বললাম, দেখতো পানি টানি কিছু জোটাতে পারিস কি না? ও দুই পট পানি আনলো। মনে হল ওস্তাদদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে এনেছে। আমরা ভাগ করে এই পানি খেয়ে নিলাম। ওস্তাদরা জানালো দিনে মার্চ হবে না। রাতে কোন খাওয়া দাওয়াও না। সবার কাছেই কম বেশি সিগারেট বিড়ি আছে। সন্ধ্যার আঁধার নামার সাথে সাথে যার যা ছিল তাই গুছিয়ে নিলাম। ঐ আগের মতোই আমরা ক্যাপ্টেন এর পিছনে। হাঁটছি তো হাঁটছি। এই বনটা মনে হল সমতল। কিন্তু গাছ গাছালিতে ঠাসা। রাতে বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে। রাত ৩ টার পরে আর পা চলছে না। কোন বিশ্রামও নেই। আমি ক্যাপ্টেন কে বললাম সবাই আমরা ভুখা। অনেকেই মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। বললেন, 'আপনারা ওদের কাঁধে করে নেবেন? বলে কী করে? নিজেরাই পারছিনে আবার মানুষ কাঁধে। যুদ্ধের সময় আপনি আপনার সাথীকে ফেলে যেতে পারেন না। কেবল মৃত হলে পারেন। যতক্ষণ সে জীবিত,ততক্ষণ তাকে আপনাদের নিতেই হবে। ভোর ৪ টায় আমরা উইং এর খুব কাছাকাছি এলে

ক্যাপ্টেন বললেন, আপনারা সবাই বসে রেস্ট নেন। সূর্য ওঠার সাথে সাথে আমরা উইং এ ঢুকবো। রাতে ঢোকা নিষেধ। বুঝলাম এটাও লং মার্চের একটা অংশ। এই লংমার্চের সাথে ওস্তাদদের ওয়ারলেস টিমও সাথে ছিল। ওয়াকিটকিও ছিল। ওনারা সবাই সবার সাথে যোগাযোগ রাখছেন।

আমাদের দু'একজন ছাড়া কেউ আর বসে নেই। ঘুমে চলে গেছে। বনের সবুজ পাতার ফাঁক গলে ভোরের আলো গায়ে লাগার আগেই আমাদের উঠতে হল। দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা উইং এ ঢুকে পড়লাম। কোথ এ অস্ত্রগুলি জমা দিয়েই ইউনিফরম খুলে লুঙ্গি পরে যে যেখানে পারলো এলিয়ে পড়লো। দিনটা ঘুম আর খাওয়া দাওয়া নিয়েই শেষ হল। বিকালে ওস্তাদরা এসে জানালো আজ আর কোন পিটি প্যারেড হবে না। সবাই রিলাক্স । বিকেলে আমরা সেই দোকানে গিয়েই আড্ডায় মেতে উঠতেই মি. যোশী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের কেউ কি হারিয়ে গেছে জয় বাংলা মার্চে? আমরা না বলে মাথা নাড়ালাম। এক পর্যায়ে উনি বললেন, ৩/৪ দিনের মধ্যে আপনারা চলে যাবেন। কীভাবে আপনাদের নেওয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তবে বাস না হয় ট্রেনে। এ কয়দিন শুধু খেলাধূলায় কাটবে। তবে বাইরে যাবার অনুমতি পাবেন না। আর যাবেনই বা কোথায়। এই পোড়া মাটির দেশে ছেঁড়া ছেঁড়া বন আর গরীব সাঁওতাল ছাড়া আর কিইবা আছে? যোশী বললেন, সন্ধ্যার আগে পড়ন্ত বিকেলে এলে ঘুরে বেড়ানো যাবে। পরদিন আমরা বিকেলেই এলাম। দুটো মোটর সাইকেলে চারজন রওনা হলাম। পুরো ক্যান্টনমেন্ট ঘুরে বাইরে বেরিয়ে বন পথে গাড়ি চলছে। মাটির রাস্তা। লাল মাটি। রাস্তার দুই ধারে গুচ্ছ গুচ্ছ সাঁওতাল পাড়া। আমার মনে হল বনের এবং সামান্য চাষবাসের উপর এদের জীবনের ব্যয়ভার চলে। যোশীকে বললাম, ধারের কাছে কোন শহর-টহর নেই? কেনাকাটার বাজার আছে, ছোটখাটো বাজার। এবার ঘুরে এলাম আমরা চাকুলিয়া রেলস্টেশনে। চা-এর দোকানে বসে কলা, বিস্কুট চা সিগারেট চললো। এলাকাটা সাঁওতাল অধ্যুষিত। অন্যকোন উপজাতি চোখে পড়েনি। তবে বিহারী মুসলমানদের দু'একটা দোকান আছে। আছে বাঙালি হিন্দুদেরও। ভালোই লাগলো।

বহুদিন পরে খোলা পথে বাধাহীনভাবে ছোটা। তাও আবার বনের মাঝ দিয়ে অজানা অচেনা গাছগাছালীর ফুলের গন্ধ গায়ে মেখে।

তরকারির ঝুড়ি পিঠে করে পথ চলা সাঁওতাল যুবতীদের অবাক দৃষ্টি দেখতে দেখতে সন্ধ্যায় ক্যাম্পে এলাম। যোশী ও তার সাথী আমাকে আর কবিরকে নামিয়ে দিয়ে আজ আর আড্ডা না দিয়ে চলে গেল। আমাদের কাজের মধ্যে লাকড়ী জোগাড় করা। পাক করা আর খাওয়া। আড্ডা মারা, ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়ানো। পরদিন সকাল ১০ টায় আমাদের লাইন করে দাঁড় করায়ে কিছু বিছানার জিনিস বুটজুতো আর মনে হয় অল্প কিছু রুপি দেওয়া হল। বেশি কিছু বললেন না। আমারাও বুঝতে পেরেছি যাবার সময় আসন্ন। আমাদের উইং এর কয়েকজন পরে সবার সাথে আলোচনা করে ঠিক করলাম ক্যাপ্টেন কে নিয়ে একটা গেট-টুগেদার করবো। সবাই রাজি হলে আমরা কয়েকজন ক্যাপ্টেন এর সাথে দেখা করে ব্যাপারটা বলতেই উনি সম্মতি দিলেন। বহুত কষ্টে কয়েকটা মালা যোগাড় ও কতগুলো কলম কিনে উপহারের ব্যবস্থা হল। বাঙালি রীতিতে। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিদের চেয়ারে বসিয়ে আমরা মাটিতে বসে সভা করলাম। আমাদের মধ্যে দু'তিন জন কথা বললো। তারপর ওস্তাদরা একজন। শেষে ক্যাপ্টেন। আজো কানে বাজে তাঁর কথাগুলো। মূল কথাগুলো হল,

"আমার উইং এর তোমরা সবাই ভালো ছেলে। আমি ও আমার লোকেরা তোমাদের অস্ত্র চালানো শিখাতে চেষ্টা করেছি। তোমরাও দ্রুততম সময়ে তা আয়ত্ত্ব করতে পেরেছো। আমরা খুব খুশি, ইন্টার উইং চাঁদমারীতে আমার ছেলেদের ধারেরকাছেও অন্য উইং যেতে পারে নাই। একটু চুপ থেকে বললেন, এই বয়সে তোমাদের হাতে বই কলম খাতা থাকার কথা।

আমরা তুলে দিলাম মারাত্মক অস্ত্র। পাক আর্মিরা খুব হিংস্র ও নির্দয়। তোমরা কীভাবে ওদের মোকাবেলা করবে তাই ভাবি ! তবে তোমাদের আছে অসীম সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। স্বাধীন হলে তোমাদের দেশে বেড়াতে যাবো। "জয় বাংলা, জয় হিন্দ"। আমরা সবাই আনন্দে খুশিতে হাততালি দিলাম। অনেকের সাথে কোলাকুলি ও হাত মেলালেন। তাঁর চোখের কোণে অশ্রুর ফোটা টলমল করছে। বুঝলাম, এই একমাস যাদের গড়লেন পিটলেন তাদের বিদায় দিতে বড় কষ্ট হচ্ছে তাও আবার হায়নার মুখে।"

বিকেলে আমাদের জানানো হল , সকাল ৮.৩০ টার মধ্যে আমাদের সেনাবাহিনীর পিকআপে উঠতে হবে। পিকআপ যাবে চাকুলিয়া রেলস্টেনে। সেখান থেকে ট্রেনে উঠতে হবে। পরদিন সকাল ৮ টার মধ্যে আমাদের নাস্তা শেষ করে বেডিংটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তৈরি হয়ে গেলাম লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর জন্য সামনে হাঁটছি আর পিছনে ফেলে আসা ছনের চালা ঘরের দিকে তাকাচ্ছি। ঘরের সামনে হরিতকি গাছটাও মাথা দোলাচ্ছে। বড় মমতায় ওরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। ছনের ঘরটার হাহাকার আমার বুকের মধ্যেও হাহাকার তুলে দিল। চোখে পানি এসে গেল। কুইক শুনতেই তন্ময়ভাব কেটে গেল। শক্ত হয়ে সামনে তাকালাম। ডিকে খান্না ক্যাপ্টেন পিকআপ ভ্যানের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করছেন আর গুনে গুনে ভ্যানে তুলছেন সাথে ওস্তাদরা আছেন। আমাদের গ্রুপ সবার শেষে। আমার পালা এলে ক্যাপ্টেন কোলাকুলি করলেন। বললেন,

I am very pleased with you. Liberate your country. I will visit the new country at available time. Take care of you Mr. Shams. The days we have passed will be a brilliant chapter in my life, an unforgetable and ever-remembering. May God bless you.

সবাই উঠার পর সব ভ্যান এক সাথে রওনা হল। পথ বেশি নয় ৭/৮ মিনিটের পথ। আর্মি ভ্যান থেকে নেমে দেখি ট্রেন লাইনে দাঁড়ানো। প্রত্যেক বগির সামনে একজন করে আর্মি দাঁড়ানো। ট্রেনে উঠার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। হঠাৎ দেখি সুনীল যোশী একটা বগির সামনে দাঁড়িয়ে। দেখা মাত্রই 'আইয়ে' বলে ডাক দিলেন। বগিতে আমাদের উঠতে বললেন। সবাই উঠে পড়লাম। ওস্তাদরা সব বগি চেক করছেন। কেউ যেন বাদ না পড়ে। কতবার যে কত গ্রুপ চেক করলো। হঠাৎ দেখি যোশী ব্যাগ ভর্তি কলা, বিস্কুট রুটি নিয়ে হাজির। আমার হাতে গুঁজে দিল। বললো, সারাদিন খাওয়া হবে না। ট্রেন কোথাও থামবে না। থামলেও নামতে দেবে না। প্রাকৃতিক কাজের সব ব্যবস্থা ট্রেনে আছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সাধ্য হলো না ব্যাগটা ফিরিয়ে দেই। বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, বন্ধু তোমার কথা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মনে থাকবে। ভগবান যেন পরকালে সাক্ষাত করান। ব্যাগটা কবিরের হাতে দিয়ে বললাম, এটা তোর পাহারায়

রাখিস কেউ যেন না খোলে। আমার বগির সামনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি আর সিগারেট টানছি। বগির দায়িত্বে থাকা ওস্তাদও বুঝে গেলেন আমাদের সখ্যতার কথা। যোশী আমার সাথে আলাপ করিয়ে দিল। পথে কোথাও ট্রেন থামলে কিছু দরকার হলে ওকে বলো, সাহায্য করবে। ওকেও বললেন, ওহ্ মেরা বাংলাদেশি দোস্ত হায় তুম খেয়াল রেখো ভাই। ওস্তাদটি মাথা নাড়লেন। যোশীকে আমি কোনদিন ইউনিফরমে দেখি নাই। তার র‍্যাংক কী তাও জানিনে। তবে পুরো উইং এ তার আধিপত্য দেখেছি। কারো স্যালুট দেয়ও না, নেয়ও না। র‍্যাংক জানার কথা মনেও আসেনি। প্লাটফর্ম ক্লিয়ার। শুধু সেনাবাহিনীর লোকজন দাঁড়িয়ে। দূরে ক্যাপ্টেনকে দেখে হাত নাড়লাম। যোশীকে আমার বুকে ধরে বিদায় দিয়ে বগিতে উঠে পড়লাম। ট্রেন চলা শুরু করলো। জানালা দিয়ে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকলাম। কখন প্লাটফর্ম ছেড়েছি টেরও পাইনি। এবার যার যার আসনে সবাই যুত হয়ে বসে গেছে। কেউ উঠেই তাস নিয়ে পিটানো শুরু করে দিয়েছে। ভাবলাম এই বিহারে তো আর আসা হবে না। এর চেহারা-সুরত ভালো করে দেখে নিই।

বইতে পড়েছি বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব ছিলেন সিরাজদ্দৌলা। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফর আলীর বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি নির্মমভাবে মৃত্যু বরণ করেন। বাংলার স্বাধীনতা সেই যে গেল, প্রায় ৩০০ বছর পর ১৯৪৭ সালে একটা বিশ্রীভাবে স্বাধীনতা ফিরে এলো। সেই বিশ্রীর শিকারই আমরা। ইতিহাস থাক, এবার বিহার দেখি, পুরো বিহার তো দেখা হবে না, দেখা হবে সামান্য অংশ। রেল পথের ধারে ধারে যা পড়ে তাই দেখা হবে। মাটি লালচে ছোট ও মাঝারি ধরনের টিলা। টিলাগুলো শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশে ছাওয়া।

বাঁশঝাড়ও অসংখ্য। দুই টিলার মাঝখানে যে জমি সেখানে চাষবাস হয়। বিশেষ করে তরকারীর চাষ। মনে হল যেখানে সমতল একটু বেশি সেখানে করে ধান। জুমও করে এরা। গাড়িতে বগির ওস্তাদের কাছে জানলাম, এই সাঁওতাল পরগণায় কোল, ভীম, আদিবাসীরাও বাস করে। ১৯১২ সাল পর্যন্ত এটা বাংলার সাথে ছিল। পরে বিহারের সাথে যোগ হয়। সবুজে ছাওয়া, পাহাড় আর পাহাড়-প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন শান্ত নির্জন, তেমনি মনোরম। জলবায়ু ও স্বাস্থ্যপ্রদ। এখানকার

জলের নাকি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে। যেকোন পেট পীড়ায়- অব্যর্থ ফল লাভ হয়। ট্রেন লোকালয়ে ঢুকলেই চোখে পড়ছে ছোট বড় মন্দিরের চূড়া। প্রতি স্টেশনে ট্রেন স্লো হচ্ছে, আর আমি দেখে নিচ্ছি। মনে আছে ছোট্ট একটা ডাইরিতে যাত্রা পথের স্টেশনগুলোর নাম টুকে রেখেছিলাম। সহযোদ্ধা তপন সেটা নিয়ে হারিয়ে ফেলে। অনেক তথ্যই ছিল ওতে। হারানোর ফলে কালের গর্ভে তথ্যগুলো চিরতরে হারিয়ে গেল। থাকলে দিন তারিখ সময় পর্যন্ত উল্লেখ করতে পারতাম। অনেক পরে জেনেছি, বৈশালী শিমুলতলা, জসিদি, দেওঘড়, মধুপুর, গিরিডি, দুমকা এইসব স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানগুলো এই পরগণায়, কিছু চাকুলিয়ার কাছাকাছি। দুমকা হল এই পরগণার জেলা শহর।

ট্রেনটা স্পেশাল এবং ননস্টপ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হলো না। অনেক ছোট স্টেশনে অনেকক্ষণ থামতে হল। আমার ভালো মনে আছে, পড়ন্ত বিকেলে ধানবাদ পৌঁছলে অনেক লেট হল। এটা জংশন এবং স্টেশন। ট্রেন থেকে দেখলেই বুঝা যায় এর বৈচিত্র্যময় কারুকাজ। কত ট্রেন যে গেল আর এলো আমাদের টা আর নড়চড় হচ্ছে না। আমাদের চাকুলিয়া ছিল সিংভূম জেলার মধ্যে। এর সদর ছিল চাইবাসায়। ছোট ছোট টিলা ভিন্নধর্মী বাড়িঘর। শাল সেগুনে ছাওয়া উঁচু নিচু পথঘাট। ট্রেন থেকে মনে হল যেন পটে আঁকা এক ছবি। বগির ওস্তাদ বললেন, 'ওরাং মুন্ডাদের বাস। বাঙালিরাও আছে শহরে। ঝাড়খন্ডের দাবি উঠেছে আকাশে বাতাসে। সন্ধ্যাবাদ ধানবাদ থেকে ট্রেন ছাড়লো। আমিও বাইরে তাকানো বন্ধ করে দিয়ে আড্ডায় মেতে উঠলাম।

দেখতে দেখতে ঘাড়েও ব্যথা হয়েছে। চোখও জ্বালা করছে। কবিরকে বললাম, তুই নীচে বয়, আমি একটু শুই। ও বললো, আমার কোলের পর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ুন। সারাদিন তো টুকতে টুকতেই কাটালেন। দাদা, ব্যাগটা খুলবেন না ? ব্যাগের কথা মনে হতেই মনটা ভারি হয়ে গেল। বললাম, না রে। একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে খুলবো। শুধু আমি আর তুই দেখবো এতে কী আছে? মতিন, ইন্তাজ বার বার ধাক্কা মেরেছে ওটা খোলার জন্য। খুলিনি, বলেছি, যাই থাক তোরা ভাগ পাবি। কবে যে কখন থেকে কবির সামছু ভাই থেকে দাদায় অবতরণ করেছে টেরও পাইনি। ও ডাকছে আমি সাড়া দিচ্ছি। কল্যাণী

স্টেশনে যখন ট্রেন থামলো রাত প্রায় ১টা। আমাদের এই পথটুকু পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। আমরা আবার লাইন দিয়ে হাঁটা শুরু করে ১৫ মিনিটের মধ্যে তাবুতে এলাম। এ তাবু আগের তাবু নয়। যুব ক্যাম্প থেকে একটু দূরে এ তাবু। আমাদের জন্য পোঁতা হয়েছে। আমি, মতিন, ইন্তাজ, ওমর আলী, আজিজ এক তাবুতে ঢুকে পড়লাম। বিছানা পেতেই ঘুম। এই তাবুগুলোর মেইন গেটে আর্মির ওস্তাদরা পাহারায়। রেস্ট্রিকশন বেশ এসব সকালে টের পেলাম। পানির ভালো ব্যবস্থা থাকায় ভালো করে স্নান করে নিলাম সবাই।

এটা বাংলার পানি। এর স্বাদ, গন্ধর মজাই আলাদা। এ আমাদের অতি চেনা পানি। নাস্তার জন্য পায়েশ পাক করা হয়েছে। কবির আমাদের সবাইকে প্লেট প্লেট এনে দিলো। খাওয়া শেষে গেটের দিকে এসে দেখি গেটের সামনে তারাপুরের সামু দাঁড়িয়ে। মনে হল ফিরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই আবার ফিরে এলো। বললাম, তুমি কোত্থেকে এলে ? ও বললো, সিরাজ, সাত্তার, ইমান মাস্টারসহ আরো অনেকে দেশ ছেড়েছে। আমরা কয়েকজন আগে চলে এসেছি। ওকে তাবুতে নিয়ে এলাম। বললাম, তুমি ঐ পুকুরে ডুব দিয়ে এসে কাপড় বদলাও। তোমার সারা শরীরে ক্লান্তির ছাপ। তারপর সব কথা শুনবো।

কবিরকে বললাম, আর এক ডিশ পায়েশের ব্যবস্থা করো। সামু গোসল করে তাবুতে এসে খেয়ে নিল। ও প্রথমেই বললো, চাচা খবর আছে। কী খবর ? বললো, আপনি এক পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছেন। ওরা সব ভালো আছে। আমি আসার সময় খবর নিয়ে এসেছি। ওর খবর পাওয়া স্বাভাবিক কারণ ওদের বাড়ি আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে সামান্য দূরে। বললাম, তুমি যুব ক্যাম্পে গিয়ে আগে নাম লেখাও। থাকার ব্যবস্থা করো। ওরা এলে আবার এসো। আমার কাছে খবরটা যে কী আনন্দের ও বেদনার তা কেবল আমিই জানি। সামুকে সারা জীবন মনে রেখেছি এবং যতদিন বাঁচবো ততদিন রাখবো। ও আজ পৃথিবীতে নেই স্ট্রোকে মারা গেছে। খবর শুনা মাত্র হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ছিলামও। আসার দশদিন পরে শুনি ও আর নেই। দুপুরের পর পরই সামু আবার সিরাজকে সাথে নিয়ে এলো। ওদের ভিতরে নিয়ে এলাম, ও তাবুতে বসালাম। যোশীর দেওয়া ব্যাগ

থেকে বিস্কুট বের করে সবাইকে খাওয়ালাম। কবিরকে বললাম, যেকোন সময় আমাদের টান দিতে পারে তাই ব্যাগ ট্যাগ কমা। আর যা যা আছে সবাইকে দিয়ে দে। সিরাজ সন্ধ্যার আগেই চলে গেল। এখানে থাকার নিয়ম নেই। বললাম, কাল যদি থাকি, পারলে একবার যাবো। না পারলে এই শেষ দেখা। পরদিন সকালে নাস্তা সেরে ওস্তাদকে বলে যুব ক্যাম্পে গেলাম। সবার সাথে দেখা হল। বিশেষ করে আমার সাঁহাকে নিয়ে ওর তাবুতে বসলাম।

দেখলাম বেশ নাদুসনুদুস হয়েছে। ওর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে উঠে পড়লাম। আড্ডায় আড্ডায় বেলা হয়ে গেছে। দুপুরের খাবারের ঘন্টা বাজবে কিছুক্ষণ পরেই। দুপুরে খেয়ে দেয়ে আমরা একটু গড়াগড়ি করি। কেউবা আবার তাসের আসর পাতে। আমার তাবুতে তাস খেলতে দেইনে। এমনি করেই আর একরাত পার করলাম। তিন দিনের মাথায় আর্মির লরি এসে গেল অনেকগুলো। আমরাও গাট্টি বোচকা গোল করে নাস্তা খেয়েই উঠে পড়লাম। বেলা দুপুরের পর পথে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি। গাড়ি ধীরে ধীরে এগুচ্ছে, আবার থামছে। প্রত্যেক লরির ওস্তাদরা ওয়াকিটকির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছে আর পথের খবর নিচ্ছে। এমনি করতে করতে সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এলো।

গাড়িগুলো থেমে গেল। জানা গেল, ঝড়ে গাছ পড়ে রোড ব্লক হয়ে গেছে। লরি আর যেতে পারবে না। উপর থেকে সিদ্ধান্ত আসবে কী করা হবে। কিছুক্ষণ পর জানা গেল ধারের কাছে বারাকপুর আর্মি বেস আছে। আপাতত সেখানে আমাদের রাত কাটবে। খিদেয় পেট চু চু করছে। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আমরা বেস এ পৌঁছে গেলাম। ব্যারাকে ঢুকে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। রাত ১০ টার মধ্যেই খানা দেওয়া হল। খানা খেয়ে ঘুমে চলে গেলাম। ওস্তাদরা বলে গেলেন আগামীকাল নাস্তা খেয়েই যাত্রা। আমার মনে পড়ে আমাদেরকে এক প্যাকেট করে গোল্ড ফ্লেক সিগারেটও দেওয়া হয়েছিল। পরদিন ৮ টার মধ্যে নাস্তা খেয়ে লরিতে উঠলাম। আকাশ পরিষ্কার। বৃষ্টিতে সদ্যস্নাত আলো ঝলমলে প্রকৃতি। এ আকাশ আমার অতিচেনা। একে বর্ষায় দেখেছি, শরতে দেখেছি, বাংলার সকল ঋতুতেই এর রূপ আমি অবগাহন করেছি। দুপুরের আগেই দত্তবুলিয়া ক্যাম্পে চলে এলাম। একদম বর্ডার ঘেষা ক্যাম্প। ওপারে বয়রা সাব সেক্টর ৮ নং সেক্টরের অধীন। বর্ডারের

প্রায় ধার ঘেষে ভারতীয় সেনাবাহিনী ছাওনি ফেলেছে। গোলাবারুদবাহী যানগুলো নিরন্তর দিনরাত চলাচল করছে। ট্যাংকগুলো গোলাবাহী গাড়িগুলো ক্যামোফ্লেজ করা।

পরদিন সকালেই আমাদের থানাওয়ারী ভাগ করে ফেলা হল। বয়রা সাব সেক্টরের দায়িত্বে ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা। অসাধারণ চৌকস মনে হল। এখানেই দেখা হল সেক্টর কমান্ডার মেজর মনজুরের সঙ্গে। সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, ‘তোমাদের উপর যে হাতিয়ার তুলবে, তোমরা তার উপর হাতিয়ার তুলবে। জনগণ পানি আর তোমরা হলে মাছ। মুক্তিবাহিনীর এক বিশাল দল এবার একসাথে ঢুকবে। পথে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।’ এবার গ্রুপ লিডার নির্বাচনের সময় এলে হুদা স্যার আমাকে বেছে নিলেন। আমার হাতেই ১ম এস.এম.জি তুলে দিলেন। আমি বললাম, স্যার এই দায়িত্বটা আমাদের রাজ্জাককে (রহমত) দিন ও পুলিশে চাকরি করেছে। বললেন, সেও তোমার সাথে থাকলো। তবে কঠিন সিদ্ধান্তগুলো তোমাকেই নিতে হবে। অস্ত্র বিতরণ শেষে এবার আমাদের দেওয়া হল গ্রেনেড বিস্ফোরক। ছোট ছোট কৌটার মতো এন্টি পারসনাল মাইন। জাম্পিং মাইনগুলো ছিল মাঝারি লম্বা কৌটার মতো। গ্রেনেড দেওয়া হল যথেষ্ট সংখ্যক। সবাই যার যার অস্ত্র নিয়ে তাবুতে ফিরে গেলাম। আজই সন্ধ্যায় আমাদের ভিতরে ঢুকতে হবে। পড়ন্ত বিকেলে ক্যাপ্টেন হুদা স্যার আমাকে বললেন, একথা সেকথার পর আমার হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিলেন। বললেন, এটা সাবধানে ও নিভৃতে রেখো। এমনভাবে প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া যাতে বৃষ্টিতে না ভেজে। আজকাল মোবাইল সিম যেরকম থাকে ঠিক সেইরকম। বললেন, মহেশপুর থানার পদ্মপুকুর গ্রামে আন্ডার গ্রাউন্ড পার্টি তোমাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে গুপ্ত হামলা চালাতে পারে। প্রয়োজনে তোমরা গ্রামটা উড়িয়ে দেবে। তোমাদের গ্রুপ লিডারদের এই রকম নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। আর অফিসে টানানো বাংলাদেশের ম্যাপে স্টিক দিয়ে জায়গাটা আমাকে দেখালেন। কোরিয়ার তোমাদের যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তাকেও নজরে রাখবে। তাবুতে এসে বসে নানান কথাই ভাবছি। আকাশে প্রচণ্ড মেঘ। কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টির কারণে আমাদের ভিতরে ঢোকা পিছিয়ে গেল। হঠাৎ কবির এসে বললো, দাদা, যোশীর দেওয়া ব্যাগে আর কিছু নাই। শুধু মুখ আঁটা

একটা খাম আছে। পুরো ব্যাগটাসহ আমাকে দিল। ওর সামনেই খামটা খুলতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো পাঁচখানা একশো রুপির নোট। আর একটা চিঠি ইংরেজিতে লেখা। নোট কয়টা কবিরের হাতে দিয়ে বললাম রাখ এগুলো। এরপর চিঠি নিয়ে বসলাম যার বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়–

প্রিয় সামস্
টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে তোমাদের দিয়ে ঘাস তোলানোর সন্ধ্যাটা খুব মনে পড়ে। হয়তো সারাজীবনই মনে থাকবে। তোমাদের কাঁচা কাঁচা মুখগুলো যুদ্ধে যাচ্ছে এটা ভাবতেই আমার কষ্ট হয়। কিন্তু যেতেই হবে। তোমরা জিতবে। তোমাদের আছে মেধা, সাহস আর দেশপ্রেম। তোমাদের সাথে আর দেখা হবে না। যে অভিযানের তোমরা সৈনিক তাতে শহীদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রার্থনা করি ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন। তুমি, কবির , মতিন, ইন্তাজ, ওমর, আজিজ, আরজু, তোমাদের কচিমুখ গুলো বুকের মধ্যে পুরে নিয়েছি। তোমরা নাই তাই দোকানের আড্ডাটা আর জমবে না। আমাদেরও হয়তো অন্য কোথাও বদলি করা হবে। তোমরা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখ মন তোমাদের পিছে পিছে থাকবে। গেরিলা যুদ্ধের ঝুঁকি বেশি। সামান্য রুপি কয়টা তোমরা খরচ করলে আমার মন খুশি হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সুযোগ বুঝে বেড়াতে যাবো। আশা রাখি।

শুভেচ্ছান্তে
যোশী (মেজর)
বি.দ্র. ভিতরে ঢোকার আগে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলো

সবাইকে ডেকে চিঠিটা শুনালাম। অবাক বিস্ময়ে সবাই বললো, যোশী, মেজর ? রুপির কথাও ওদের বললাম। চিঠি খামে পুরে মনে মনে বললাম, বিদেশি বন্ধু, তোমার কথা ভুলবো না। তোমার আশির্বাদে শত্রুরা আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। স্বাধীনতা আমাদের চাই-ই। সকাল হল, আকাশ পরিষ্কার। বিকেলেই আমাদের বাংলাদেশে প্রবেশ নিশ্চিত। আমরাও তৈরি। তাই বিকেলেই আমরা ঢুকে পড়লাম। যোশীর চিঠিটা আমি ছিঁড়ি নাই। বুকপানি পথে হাঁটার সময় ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। ফেলে দেই।

চাকুলিয়ার ট্রেনিং প্রাপ্ত যারা আমার সহযোদ্ধা তাদের নাম–

মো. সামসুদ্দিন
জয়কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

আ. রাজ্জাক
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

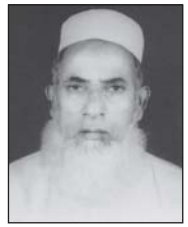

আ. মতিন
বকসীপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

ইন্তাজ আলী
কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মরহুম মির্জা হারুন
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

আবু ওবায়দুল্লাহ ঝন্টু
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

তপন
হাবাসপুর, মিয়াপাড়া
পাংশা, রাজবাড়ী

বাদশা
হাবাসপুর, মিয়াপাড়া
পাংশা, রাজবাড়ী

ওমর আলী
উদয়পুর
পাংশা, রাজবাড়ী

আজিজুল ইসলাম
উদয়পুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. আরজু
উদয়পুর
পাংশা, রাজবাড়ী

নওয়াব আলী
মাছ পাড়া
পাংশা, রাজবাড়ী

মরহুম মোহাম্মদ আলী
কালুখালী
পাংশা, রাজবাড়ী

আ. মাজেদ মন্ডল
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

এদের অনেকেই আজ আর নেই। যারা আছে তাদেরও বার্ধক্য ঘিরে ধরেছে। পৃথিবী থেকে যাবার সময় আসন্ন হয়েছে। আমাদের মতিন (মন্টু) আজ আর স্মরণ করতে পারে না অনেক কিছু। অথচ ঐ ছিল আমাদের মধ্যে বেশি মেধাবি ও দক্ষ। আমরা সবাই একদিন বিধির নিয়মে হারিয়ে যাবো। বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশ মাথা উঁচু করে টিকে থাকুক অনন্তকাল এটাই আমাদের বাসনা ও প্রার্থনা।

দেশে ফেরা ও যুদ্ধ শুরু

দত্তপুলিরা থেকে হাতিয়ার পাওয়ার পর অতি বৃষ্টির কারণে আমাদের মুভ করা হোল না। পরের দিন প্রায় চারটায় বের হলাম। ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর গঙ্গা কপোতাক্ষ নদী পার হয়ে সারারাত হাটলাম। এবার আমাদের বিশ্রাম দরকার। সকালে এক বাড়িতে উঠতেই খবর এলো সামনে পাক সেনাদল। আমরা অপ্রস্তুত। বাড়ি ছেড়ে মাঠে নামলাম। কারা যে কোন দিকে ছুটে গেল তার খোজ পেলাম না। সারা দুপুর বিলের পানিতে, আখের ক্ষেতে পার করে বেলা হেলে গেলে রাস্তায় উঠলাম। সন্ধ্যায় সবাই একত্রিত হলাম। আমার গ্রুপের কিছু ছেলের খোঁজ পেলাম না। কোন দুঃসংবাদ ও পেলাম না। ভাবলাম, আমরা দুভাগ হয়ে গেছি।

কোরিয়ারকে বললাম, সামনে যাবে না, পিছু হটো। পিছু হটে সীমান্ত ঘেষা এক গ্রামে উঠলাম। এখানেই একরাত ও একদিন থাকলাম। কোরিয়ারকে বললাম, আজ ভিন্ন পথ ধর, কোন রাস্তা নয়। সারারাত হেটে পাকা রাস্তা এড়িয়ে, শেষ রাতে আবার এক গ্রামে আশ্রয় নিলাম।। আমার মনে আছে আমি ও আমার দল যে বাড়িতে উঠলাম, সে বাড়িতে পান্তাভাত ছোট মাছের চচ্চরি দিয়ে খেলাম। এক এক বাড়িতে ৪/৫ জন উঠেছে। সবে শুয়েছি এমন সময় মায়ের বয়সী এক মহিলা তড়িঘড়ি করে ঘরে ঢুকে বললো বাবারা উঠো, আর্মি এসে গেছে। তড়াক করে হাতিয়ার তুলে ঘর থেকে বের হলাম। মহিলা আমাদের তার বাড়ির পিছনে গর্তের মধ্যে বসতে বললেন। গর্ত ভাটির গাছে ভরা। আমরা নীচে, মহিলা উপরে দাড়িয়ে আর্মির গতিবিধি লক্ষ করছেন। আর আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আমরা মাঝে মাঝে গর্ত পরিবর্তন করে ওনার কথা মতো হামা গুড়ি দিয়ে এগুচ্ছি। বেলা এগারটার দিকে মহিলা আমাদের গর্ত থেকে তুলে তার বাড়িতে নিয়ে এলেন। ভালো করে খাওয়ালেন। গ্রামের সামনেই বিরাট একটা বাগান। ঝোপঝাড়, সাথে বিরাট বিল কচুরি পানায় ভরা। যে যেখানে ছিল সবাইকে খবর দিয়ে জড়ো করা হলো। মহেশপুর থেকে এখানে আসার একটি মাত্র পথ। শুনা গেল এদিকে আর্মি আবার মুভ করেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম প্রতিরোধ করা হবে। গ্রামবাসির সহায়তায় আমরা অ্যাম্বুসে চলে

গেলাম। এবার ওদের ছাড়া হবে না প্রায় গোটা বৃহত্তর ফরিদপুরের মুক্তিবাহিনী এখানে। আকাশ আর ট্যাংক ছাড়া ওরা কোন ক্রমেই ঢুকতে পারবে না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আগের কোরিয়ারকে বাদ দিয়ে ঐ গ্রাম থেকে চারজন যুবক বেছে নিলাম। আগের কোরিয়ারের একজনকে জম পিটুনি দেওয়া হোল। এই কোরিয়াদের বললাম আমাদের কোথায় নিতে হবে। মনে হলো ছেলে গুলো সাহসী ও নির্ভরশীল। (সন্ধ্যার আগেই আমরা বিল অনেক নৌকায় পার হলাম) বিকেলেই আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছি। কেরিয়ারকে বললাম, আমাদের তোমরা নেবে চৌগাছা। চৌগাছা থানাকে পাশ কাটিয়ে ঐ থানার কোন এক গ্রামে আমরা অবস্থান নেবো। ওরা বললো ঠিক আছে। এবার আমরা হাঁটছি ধান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে। পায়ে চলা পথ। আমার দল মাঝখানে। হঠাৎ আমাদের সামনে থেকে মুক্তিরা যে যেদিকে পারে দৌড় শুরু করলো। কেন যে দৌড় শুরু করলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি আমার সঙ্গীদের বললাম বসে পড়ো। আমার সামনে যারা তারাও কিছু বলতে পারে না। কোন শব্দ নাই, গুলির আওয়াজ নাই কোন আলোও নাই। সামনের দল থেকে কে যেন বললো, সামনে আর্মির গাড়ি ছিল। আমি বললাম, ধান ক্ষেতে আর্মির গাড়ি ? ধান আমাদের মাথার উপরে। পায়ের তলায় চিটচিটে কাদা। আমার দলকে দৌড়াতে না দেখে সামনের ও পিছনের কিছু মুক্তি থেমে গেল। ব্যাপারটা বুঝে উঠার জন্য আমরা আবারও বসে পড়লাম। আমার মনে পড়ে গেল Captain হুদা সাহেবের কথা। গেরিলা নিয়ম অনুযায়ী চলার পথে ধুমপান নিষেধ। ঘুট ঘুটে অন্ধকার, কাছে কোন আলো নেই। আমার মনে হল নৌকায় পার হওয়ার পর থেকে ঘণ্টা তিনেক হেঁটেছি। পথ কর্দমাক্ত হওয়ায় চলার গতি স্লথ থাকায় বড় জোর ১২/১৩ মাইল অতিক্রম করেছি। হঠাৎ পূর্বদিকে তাকাতেই একটা বাড়ির আলো চোখে পড়লো। চারদিকে আর কোন আলো নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ঐ আলোর কাছে যাবো। আমার সিদ্ধান্তে বসে থাকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুক্তিরাও যোগ দিল। দু'হাতে ধান ফাঁক ফাঁক করে করে আমরা পথ তৈরি করে পথ চলছি। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই অনেক গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। অনেক গলা আমাদের চেনা। আমরাও বাড়িতে উঠে পড়লাম। দেখি সবাই এখানে এসে গেছে। কবিররাও এসে গেছে।

পরে জানা গেল সবার আগের দল পাকা রাস্তায় আর্মির গাড়ি মনে করে ওরা এলোপাতাড়ি দৌড় শুরু করে। আমাদের পথ দেখানো যুবকদের জিজ্ঞাসা করতেই বললো, স্যার আমাদের কথা কেউ শুনে নাই। আমাদের ফেলেই দৌড় শুরু করেছে এরা। আমরা কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানে থাকা যাবে না। রাত বেশি হয়নি। কোরিয়ারদের বললাম, রাস্তা কতদূর। ওরা বললো ঐ তো স্যার, ওদের বললাম আমি সামনে থাকবো, আমার সামনে তোমরা দু'জন, পিছনে দু'জন। চলো। দশ মিনিট হাঁটার পরই পাকা রাস্তার পাশে এসে গেলাম। গেরিলা টেকনিক অবলম্বন করে ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হলাম। কোরিয়ার বললো, স্যার আমরা নিরাপদ।

এখন আমরা দ্রুত পা চালাবো। মেসেজটা সব গ্রুপের কানে দেওয়া হলো। অতি ভোরে আমরা চৌগাছার কালা নামক গ্রামে পৌছে গেলাম। কোরিয়াররা বললো, আজ আর না। আমরা আর বাড়িতে উঠলাম না। একটা ফাঁকা জায়গায় জড়ো হলাম। জায়গাটা আম গাছে ভরা, ছায়া ঘন। আমার কোরিয়ারকে খুব জানাশুনা মনে হল। যে পথে সে আমাদের এনেছে সে পথে জন্তু জানোয়ারও চলে না। ভোর হতেই গ্রামের লোকজন ছুটে এলো। ছুটে এলো ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে। এতো মুক্তি একসাথে এরা আগে দেখেনি। আমরা মুরুব্বি গোছের কয়েকজনকে বললাম, আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন শুধু খিচুড়ি । টাকা আমরা দেবো। বললাম, গ্রাম থেকে কোন লোক চৌগাছা যাবে না। ওখান থেকে ঢুকবে না। একটাই পথ। পথে আমরা সেন্ট্রি দিয়ে দিলাম। আমরা জন প্রতি টাকা তুলে ওদের হাতে দিলাম। ওরা পাকে লেগে গেল। নারী পুরুষ সবাই। যার যা কাজ। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, কোন বাড়িতে থাকার জন্য আর উঠবো না। কারণ বিপদ এলে জড়ো হতে দেরি হয়, সিদ্ধান্ত নিতে সময় যায়। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিও নেওয়া যায় না। গাছতলাতেই হবে আমাদের থাকা খাওয়াসহ যাবতীয় কাজ। আমরা গ্রুপওয়ারি একটা পুকুর থেকে গোসল সেরে নিলাম। লাইন দিয়ে বসে খয়রাত খাওয়ার মতো জনগণের জোগাড় করা প্লেটে গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে নিলাম।

গাছতলাতেই শতরঞ্জি পেতে বোচকা মাথায় দিয়ে কাত হলাম। এটা এমন একটা জায়গা এখানে আসা যাওয়ার একটা মাত্র রাস্তা চারপাশে প্রায় বিল ও ঝিলের মতো। কচুরিপানায় ভরা। গাছতলায় আমরা প্রাণভরে ঘুমালাম। গ্রামের মুরুব্বিরা আমাদের জন্য দুপুরের খাবার

আয়োজন করেছে। বাড়ি থেকে খাবার এনে জড়ো করেছে। আমরা দুটোর সময় খেয়ে নিলাম। বললাম, বিকালে আমাদের শুধু ডাল-ভাত খাওয়াতে হবে। আমরা টাকা দিয়ে দিলাম। আমরা ৫/৬ মুক্তি একসাথে কোরিয়ারদের নিয়ে বসলাম। একরাতে মাগুরাতে বা তার আশপাশ পৌঁছাতে পারবো কিনা ? ওরা বললো, পারবো। পথে পাকা রাস্তা পড়বে। আমরা দেখে শুনে পার হবো। এবারও আমি সামনে। বিকাল ৪ টায় খাওয়া শেষ করে আমরা বিল পার হতে সন্ধ্যা নেমে এলো। আবার হাঁটা। পাকা রাস্তার কাছে আসতেই কোরিয়ার আমাদের থামিয়ে দিলো। ওরা দুজন রাস্তায় চোরের মতো উঠে আশপাশ রেকি করে এলো। ওদের একজন সবুজ সংকেত দেওয়ায় আমরা দলে দলে রাস্তা পার হলাম। একদম নিরাপদে পার হলাম। আমরা যেন কোন অ্যাম্বুশ এ না পড়ি, এটা ওদের বলে দেওয়া আছে। পানি কাদার রাস্তা গ্রামের ছোট ছোট রাস্তা। গ্রাম এড়িয়ে যতটা চলা যায়, সেভাবেই ওরা আমাদের নিয়ে এগুচ্ছে। দলছুট হওয়া যাবে না। পথে কোন বিশ্রাম নেই। বেলা উঠার পর আমরা মাগুরার আশপাশে পৌঁছে গেলাম। সিদ্ধান্ত আগের মতোই, কোন বাড়িতে উঠবো না। গাছগাছালিতে ভরা বাগান আমরা খুঁজে নেবো। ওপেন জায়গা, চারদিক যাতে দেখা যায়। সেইভাবেই আমরা বেছে নিলাম। যতদূর মনে পড়ে একটা নিরিবিলি বাগানে আমরা আশ্রয় নিলাম। পাক আর্মির পায়ে হেঁটে আসা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমাদের টাকায় খাওয়ার ব্যবস্থা হল। দুপুরে গ্রামবাসী খাওয়ালো। এবার ভাগ হওয়ার পালা। গোপালগঞ্জ, মুকসেদপুর, ভাঙ্গা, আলফাডাঙ্গার ছেলেরা মধুমতি পার হয়ে ওদের এলাকায় ঢুকবে। আমরা মাগুরা থেকে লাঙলবাদ চলে আসবো। কবিরদের চোখের জলে বিদায় দিলাম। সবাই সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। সে কি কান্নাকাটি ! কোরিয়ারদের আমরা এখান থেকেই টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় দিলাম। ওরা আর যাবে না। কারণ ওরা আর চেনে না।

এখানে কোন ঝামেলা হল না। এলাকাবাসী নতুন কোরিয়ার ঠিক করে দিল। আমরাও তাদের বাজিয়ে নিলাম। এবার আমাদের টার্গেট শ্রীপুর থানার গড়াই নদীর পাড়। কোরিয়ারদের বললাম, এমন পথে যাবে, যে পথে পাক আর্মির টহল পড়বে না। পাকা রাস্তার সমান্তরাল চলবে। আমরা সুযোগ বুঝে রাস্তা পার হবো। মনে পড়ে সারা পথই প্রায় হাটু পানি কোমর পানি

দিয়ে হাঁটতে হল। এক জায়গায় এসে কেরিয়ার থেমে গেল। আমাদের বললো, সামনে পাকা রাস্তা তারপরে নদীর মতো খাল। তারপরই শুরু হবে শ্রীপুর থানা। রাত শেষ প্রহরের প্রথম দিকে পৌঁছে গেছে। না, রাস্তায় কোন জিপ চলাচল করছে না। আমরা গ্রুপ বাই গ্রুপ পার হয়ে নদীর পাড়ে চলে এলাম। নদী পারের কোন ব্যবস্থা নাই।

এক বাড়িতে উঠে ডাকাডাকি শুরু করলাম। বাড়ির লোকজন কোন জবাব দিতেই চায় না। বললাম, আপনাদের কোন ভয় নেই, আমরা ডাকাত নই, পাকসেনাও নই। আমরা অন্য দল। আপনারা উঠুন, আমাদের সাহায্য করুন। আর যদি না করেন, আপনাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবো। কথায় কাজ হল। প্রথম বেরুলো মেয়েরা, তারপর এলো পুরুষেরা। বললাম, বাপুরে, আমাদের নদী পারের ব্যবস্থা করে দিন। ওরা ১০ মিনিটের মধ্যে এক নৌকা নিয়ে এলো। আমরা নদীর ওপারে এসে বসে পড়লাম। ঐ লোকদের কাছ থেকে জানলাম, আমরা বিপজ্জনক এলাকা পার হয়ে এসেছি। এখানে কোন রাজাকার নেই। পাক আর্মি ঢুকে না। এটা কমান্ডার আকবর চেয়ারম্যানের এলাকা। শরীর এতো ক্লান্ত যে আমরা আর পারছি না। রাস্তার পাশে, বাড়ির আঙিনায় পাটখড়ির গাদাগাদা করে জড়ো করেছে গৃহস্থরা। ওদের বললাম, সকাল হওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে আপনাদের থাকতে হবে। সবাই হাতিয়ার কোলে নিয়ে রাস্তার উপর পাটখড়ির বিছানা পেতে নিলাম। আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। সকল মুক্তিযোদ্ধা একসাথে ঘুমোয় না। এই অভ্যাস মেনে চলতে হয়।

ভোর হয়ে গেলে আমরা উঠলাম। গ্রামের লোকজনও উঠে গেছে। আমাদের খবর পেয়ে কমান্ডার চেয়ারম্যানের যোদ্ধারা এগিয়ে এসেছে আমাদের নিতে। আমরা ওনাদের ক্যাম্পে উঠলাম। খবর পেয়ে কমান্ডার সাহেব এলেন দুপুরে। আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। বললেন, আমার এলাকায় তো কারফিউ থাকে রাতে আপনারা ঢুকলেন কি করে ? নদীই বা কারা পার করে দিল ? সব ঘটনা বললাম। মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের খাবার রেডি হয়ে গেল। গোসল করে খেয়েই আমরা ঘুমে চলে গেলাম। দুপুরে আমাদের খাসি জবেহ করে খাওয়ানো হল। চেয়ারম্যান বলে গেলেন, ওনারা আমার মেহমান। খুবই ক্লান্ড ৩/4 দিন বিশ্রামে থাকবে। তারপর সুযোগ বুঝে পার করে দেবো। গড়াই নদী ভরা, পাকসেনারা টহল দিচ্ছে।

অনেক যোদ্ধার সাথে পরিচিত হলাম। দেখা গেল আমাদের এলাকার

অনেকের আত্মীয় স্বজন আছে। এই প্রথম আমরা পূর্ণ বিশ্রাম পেলাম। আমরা চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। মনে পড়ে ৩ দিন বাদে এক সন্ধ্যায় দুইটা নৌকায় আমাদের পার করে দেওয়া হল। নাড়ুয়া ঘাটে আমরা উঠলাম। এটা আমাদের থানার মাটি। এ মাটিতে আমাদের জোরই আলাদা। তিন মাস মতো এ মাটির কোথায় কি আছে জানিনে। ভেবে চিন্তে পা ফেলতে হবে। কোথায় উঠি, কোথায় খাই, এমন চিন্তা করছি, এমন সময় আমার দলের মোহাম্মদ আলী বললো, সামছু ভাই, কাছেই আমার ভগ্নিপতির বাড়ি, চলুন সেখানে উঠে খেয়ে নিই। তারপর অন্য ব্যবস্থা করবো। রাজবাড়ীর গ্রুপের যোদ্ধারা এবার তাদের পথ ধরলো। এবার শুধু আমরা পাংশার। মোহাম্মদ আলীর ভগ্নিপতির বাড়িতে উঠলাম, বিরাট বাড়ি, বিরাট কাচারি ঘর। ভদ্রলোক ঐ রাতে পুকুর থেকে লোক দিয়ে মাছ ধরে আমাদের মাছ ভাত খাওয়ালেন। এবার ঘুমানোর পালা। সবাই চায় এখানেই ঘুমাতে। আমি বললাম, না এখানে না। সোজা হাঁটো পশ্চিমে। মোহাম্মদ আলীর দুলাভাই আমাদেরও ভাই হয়ে গেল। রাতে ৩ মাইল হেঁটে এক বাড়িতে উঠলাম। মুক্তিবাহিনী বলে পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক আমাদের অতিকষ্টে থাকার ব্যবস্থা করলেন। একটু বেলা উঠতেই শুনলাম, আমরা আসার পর মোহাম্মদ আলীর ভগ্নিপতির বাড়ি পাংশা থেকে পাকবাহিনী গিয়ে ঘিরে ফেলেছিল, আমাদের ধরার জন্য। ভাগ্যিস ঐ বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ রাতে ছিল না।

মেয়েদের জিজ্ঞেস করে কিছু বের করতে পারে নাই। হঠাৎ দেখি মাছ পাড়ার মতিন এসে আমাদের মাঝে হাজির। মতিন আমার কলেজের বন্ধু। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলো। এই অঞ্চলের কোন ছেলে আমাদের সাথে নেই। আছে মাছপাড়ার নওয়াব আর কালুখালির মোহাম্মদ আলী। রেলের দক্ষিণ অঞ্চল আমাদের অচেনা। বেলা হলে কাউকে না জানিয়ে মোহাম্মদ আলীর ভগ্নিপতি ও তার আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে খোঁজ খবর শুরু করলাম। আমি আর মতিন ঐ বাড়িতে গেলাম। কেমন করে কীভাবে আর্মি আমাদের অবস্থান জানতে পারলো কে খবর পাঠালো ?

মোহাম্মদ আলীর ভগ্নিপতির সাথে দেখা হল। সে বললো, আমরাও অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। না কোন হদিস বের করতে পারলাম না। আমি আমার দলের রহমত ও মন্টুর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম, সন্ধ্যার আগেই আমরা খেয়ে নেবো। যেখানে খাবো, সেখানে ঘুমাবো না। সেন্ট্রি জোরদার

করতে হবে। দুপুরে ঐ গ্রামও ছাড়লাম। সন্ধ্যায় আর এক বাড়িতে খেলাম। সবাইকে বললাম, এখানে রাত কাটাবো। রাত ১২ টা বাজতে না বাজতেই সবাইকে তুলে নিয়ে আবার হাঁটা। এবার রাত কাটালাম এক গৃহস্থের গোয়াল ঘরে। বাইরে সেন্ট্রি নিয়োগ করা আছে। সকালে শুনি ঐ বাড়িও আর্মি রাতে ঘিরে ফেলেছিল। আমরা সবাই হতবাক। কে আছে আমাদের পিছনে যে পাক আর্মিকে আমাদের লোকেশন জানাচ্ছে ? যে কয়টা ছেলে আমাদের সাথে আছে বা মাঝে মাঝে আমাদের ফাইফরমাশ খাটছে তাদের একজন হিন্দু। হিন্দু সন্দেহের বাইরে। মতিনকে বললাম, দোস্ত, তোমার এলাকা নিরাপদ নয়। তুমি আমাদের ছাড়। আমাদের পথ দেখিয়ে দাও কোথা দিয়ে রেল পার হবো। মতিনও খুব চিন্তিত। সেও বুঝতে পারছে না। কে এমন আগুন নিয়ে খেলছে ? এবার সিদ্ধান্ত নিলাম, কোন বাড়িতে আর উঠবো না। খাবো রাস্তায় বসে স্কুলে বা খোলা মাঠে। এবার আমরা তারা ভাই এর শ্বশুর বাড়ির কাছে চলে এসেছি। হাবাসপুরের তারা ভাই। মুক্তিযোদ্ধা ফটিকের ভাই।

এরা জাঁদরেল গৃহস্থ। দিনে রাতের খাবার এই বাড়িতে পাক হতে লাগলো। গ্রামটার নাম শিয়ালডাঙ্গা। দিনে এখানে এসে ঘুমাই রাতে কেটে পড়ি আমাদের মতন করে। মতিনকেও বলি না। তারা ভাই আমাদের সাথে যোগ দিয়ে সব কাজ করে যাচ্ছেন। রাজা নামে একজন লোক মতিনের দলে আছে। মাছপাড়া স্টেশনের কাছেই ওদের বাড়ি। ওর মাথা ভরা ভাজ করা বাবরি চুল। সুন্দর চেহারা। একসময় পাক সেনাবাহিনীতে ছিল। উর্দু জানে। স্মার্ট। ও মতিনের সাথে আমাদের এখানে আসাতে পরিচয় হল। আমি একদিন মতিনকে বললাম, যে রাজাকাররা রেল স্টেশন পাহারা দিচ্ছে তাদের তো আমরা মেরে দিয়ে হাতিয়ারগুলো নিয়ে নিতে পারি। তুমি ওখানে হাত দিচ্ছো না কেন ? ও বললো, আমরাই ওদের বসিয়ে রেখেছি। ডাক দিলেই ওরা আমাদের সাথে চলে আসবে। তাছাড়া ওদের কাছ থেকে পাকসেনাদের, মিলিশিয়াদের, বিহারিদের চলা ফেরার খবর পাচ্ছি। ওদের আরো কিছুদিন ওখানে রাখতে হবে। এক বিকালে রাজা এসে আমাদের ও মতিনকে জানালো খবর আছে। খবর সবাইকে বলা যাবে না। দুই, তিন জন জানবে। আমি মতিন আর রাজা একটা ফাঁকা জায়গায় চলে গেলাম। রাজা বললো, এক রাজাকার খবর দিয়েছে আগামীকাল দুপুরের ট্রেনে রাজবাড়ী থেকে একজন লোক আসবে রাজাকারদের সাথে কথা বলার জন্য। কি কথা বলবে

তা রাজাকারদের জানায়নি। ওরা পাংশার রাজাকারদের কাছ থেকে খবর পেয়েছে। ঐ লোকটাকে কীভাবে চেনা যাবে তাও ওরা বলে দিয়েছে। আমি মতিনকে বললাম, মাছপাড়া রেলস্টেশনে যারা পাহারায় থাকে আমরা আজ রাতে তাদের সাথে বসবো। রাজাকে বললাম, তুমি ব্যবস্থা করে আমাদেরকে জানাবে। রাতে ওদের সাথে বসলাম। ওরাও বেশি কিছু বলতে পারলো না। একজন লোক আসবে শুধু এই ওরা জানে। আমরা প্লান করলাম রাজা স্টেশনে থাকবে তোমাদের সাথে। তোমরা ঐ লোককে বলবে ইনি (রাজা) রাজাকার কমান্ডার।

রাজা কথা বলবে ওনার সাথে তোমরা শুধু শুনবে। এরপর ঐ লোককে তোমাদের ঘরে এনে বসাবে। সেখানে কোন লোক থাকবে না। ঐ ঘরে তোমাদের কথাবার্তা হবে শুধু এই নয়, তার জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা রাজাকে সে মতো টাকা দিয়ে দিলাম। তাকে যদি বিপজ্জনক মনে না হয় আমরা তাকে কিচ্ছু বলবো না। মোটকথা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ওদের বিদায় দিয়ে আমরা একত্রে বসলাম। আমার সিদ্ধান্ত হল, রাজা ওদের সাথে স্টেশনে গেলে, আমাদের ৭/৮ জন অস্ত্র ও গ্রেনেডধারী মুক্তি ওকে অনুসরণ করবে। যদি রাজার কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখে তড়িৎ অ্যাকশনে চলে যাবে। প্রয়োজনে গ্রেনেড চার্জ হবে। আর যেখানে আপ্যায়ণের ব্যবস্থা তার পাশের রুমে আমাদের লোক থাকবে।

এখানেও অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। রাজবাড়ী থেকে ট্রেনটা আসে প্রায় আড়াইটায়। প্লান মোতাবেক রাজা রাজাকরদের সাথে স্টেশনে গেল। এই সময়ে বেশি লোক যাতায়াত করে না। কয়েকজন লোক নামলো। রাজা রাজাকারদের বর্ণনা মোতাবেক সেই লোককে চিনে ফেললো। ওরা ঐ লোকটাকে স্যালুট করে নিজেদের পরিচয় দিলো। রাজা লোকটাকে জানালো, সে রাজাকারদের কমান্ডার। ট্রেন চলে গেলো। একজন লোক থাকায় আমাদের ছদ্মবেশি মুক্তিরা সরে গেল। রাজা ঐ লোকটার সাথে বাংলায় ও উর্দুতে কথাবার্তা চালাতে লাগলো। ওরা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে রাজাই ঐ লোকটাকে বললো, চলুন ঐ আমাদের ঘরে। ওখানে বসে চা খাওয়া যাক। লোকটা রাজি হলো। ওরা ঘরে এসে বসে চা সিগারেট নাস্তা খেয়ে আলোচনা শুরু করলো। রাজার কথাবার্তায় লোকটা খুশি হয়ে বললো, আপনি একজন দক্ষ রাজাকার কমান্ডার। এরকম আমি বেশি পাইনি। বলুন, এ এলাকার অবস্থা

কী ? রাজা বললো, প্রচুর মুক্তিবাহিনী এই এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এখানে আর্মি অপারেশন দরকার। আমরা এই সামান্য কয়জন খুব ভীত ও তটস্থ অবস্থায় থাকি। রাতে ঘুমোতে পারিনে, যদি হামলা করে। তাছাড়া আমাদের মথুরাপুর ব্রিজ পাহারা দিতে হয়। জনগণ আমাদের পক্ষে থাকলেও মুক্তিবাহিনীর ভয়ে কথা বলে না। এরা পাকিস্তান চায়।

লোকটা বললো, আমার কাছেও এই খবর আছে। আমি আগে সৈয়দপুর এলাকায় কাজ করেছি। সেখানে আমি সাফল্য পেয়েছি। আমাকে রাজবাড়ীতে ১০/১২ দিন হল বদলি করে আনা হয়েছে। রাজবাড়ীতে আমার আত্মীয় স্বজন আছে। আমাকে পাংশা ও মাছপাড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর্মি দুইবার রেইড দিয়েছে, ধরতে পারে নাই। আমার সোর্স কাজ করছে। আমি সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যাবো। আবার আসবো। আপনারা ব্রিজটা খেয়াল রাখবেন। আর কোন কাজ আপনাদের করতে হবে না। বলুন তো ৫/৭ টা গ্রামের নাম, যেখানে ওরা অবস্থান করে।

রাজা এমন সব নাম বললো, যেগুলো সব পড়ে গড়াইয়ের ওপারে। নাস্তা আসছে আর ওরা খাচ্ছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে ফেরত যেতে দেওয়া যাবে না। কী করবো? সবগুলোকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাবো। ট্রেনটা আসে প্রায় সন্ধ্যা ঘেঁষে ঘেঁষে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যা পারও হয়। আজানের একটু আগেই ঐ ঘরে ঢুকে হ্যান্ডস আপ করালাম। ওদের অস্ত্র নিয়ে নিলাম। সবগুলোকে চোখ বেঁধে ফেললাম। রাজাকেও, রাজার সাথে খারাপ ব্যবহার করলাম বেশি। রাজাকারদের সাথেও। কিন্তু ঐ লোকটার সাথে না। সন্ধ্যা হলেই আজকাল লোকজন পথে থাকে না। আমাদের রাজাসহ রাজাকারদের ধোলাই দিলাম। চলার পথে যাদের সামনে পড়লাম, তাদের ইশারায় বললাম, মুখ বন্ধ রাখতে। আমরা জানি খবর বসে থাকবে না। খবর রাজবাড়ীতে সেনা ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে। ৫/৬ মাইল হাঁটলাম। এবার রাজাকারদের পৃথক করে ফেললাম। ওদের আমাদের এক গ্রুপের হাতে তুলে দিলাম। চোখ খুলে দিয়ে বলে দিলাম, সর্বক্ষণ আমাদের সাথে থাকতে। এবার আমাদের রাজা আর লোকটাকে আমাদের সাথে রাখলাম। এই লোকটার ধারের কাছেও আমরা কাউকে আসতে দেই না। রাজার চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা সরে গিয়ে রাজাকে বললাম, তুমি কথা বের করো। রাজা কিছুই বের করতে পারলো না। রাজাকে আমরা সরিয়ে দিলাম অন্যত্র। এইবার আমরা তাকে মোলায়েম সুরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম।

কাজ হলো না। শুধু কান্নাকাটি করতে লাগলো। আমি সাধারণ বাঙালি, নাম সোবহান কোন গুপ্তচর নই। রাজাদের কাছে যা যা বলেছিল বেমালুম তা ভুলে গেল। এসবের ধারের কাছেও গেল না।

ওর সারা শরীর ও ব্যাগ তন্ন তন্ন করেও কিছু পেলাম না। রাতে আমরা ওকে নিয়ে অন্যত্র সরে গেলাম। বললাম, তুই যদি একটা কথা সঠিকভাবে বলিস তোকে ছেড়ে দেবো। আর না বললে আজই তোর শেষ রাত। পাক আর্মি যে দুই বাড়িতে ঘেরাও করে মুক্তিবাহিনী পায়নি এর খবর দাতা কে বা কারা ? আমরা তোকে মারধর করবো না এর উত্তর না পেলে যা বলেছি তাই হবে। তুই ভেবে দেখ। মুখোশ পরা আমাদের ছয়জন সেন্ট্রি পালাক্রমে একে পাহারা দিচ্ছে। শুধু খাবার সময় আর প্রাকৃতিক কাজ সারার সময় চোখ খুলে দেওয়া হয়। দুই ঘন্টা পর পর আমরা ওকে নিয়ে স্থান বদল করছি। এই এলাকার গ্রামগুলোর ঘর বাড়ি ফাঁকা ফাঁকা গোছালো নয়। এক বাড়িতে কিছু ঘটলে অন্য বাড়ি টের পায় না। দুই রাত পার হওয়ার পর আমরা ওকে টর্চার শুরু করলাম। সব স্বীকার করলো। খবর দাতার নামটাও বলে ফেললো। নাম তার পলাশ। সে হিন্দু। রাতেই লোক পাঠিয়ে পলাশকে ধরে আনা হল। এই ছেলেটাই আমাদের সাথে থেকে ফাইফরমাশ খেটেছে। এবার দুজনকে সামনাসামনি করলাম। আর একজন ছিল তার নাম শংকর সে গত রাতে ভেগেছে। শংকরই একাজে পলাশকে জড়িত করে টাকার লোভ দেখিয়ে। আমাদের তারা ভাই বললো, ওর প্রয়োজন শেষ। এ বোঝা ফেলে দিতে হবে। পলাশ চোখ বাঁধা অবস্থায় আমাদের সাথে থাকবে। ঐ রাতেই আমরা সোবহানকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলাম। আবার আমরা একসাথে বসলাম, মতিনকে বললাম, শোন দোস্ত, পলাশকে মারা যাবে না। ওকে মারলে খবর ভারতে চলে যাবে। পলাতক শংকরই প্রচার করবে মুক্তিবাহিনী হিন্দুদের খুন করে চলেছে। এর সাথে আরো যা যা বলা সম্ভব সে বলবে। ওখানে প্রতিক্রিয়া হলে স্বাধীন বাংলা সরকার হোঁচট খাবে। আমাদের উপর বিরাট চাপ আসবে। আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বানানো হবে। অথচ ভেতরের ঘটনা কেউ বুঝবে না, জানতেও চাইবে না। হ্যাঁ, শংকর যদি ধরা পড়তো, তাহলে অন্য ব্যবস্থা করা যেতো। আমার কথার যুক্তি ওরা মানলো। পলাশকে বলে

দিলাম, সর্বক্ষণ আমাদের সাথে থাকবে। তাকে অভয় দিলাম, সে তার বাড়িতে খবর পাঠালো মুক্তিবাহিনীর সাথে আছে। ভালো আছে। আমরা খুব সতর্ক। এক গুপ্তচর নিখোঁজ হওয়াতে, আরো গুপ্তচর আসবে। আসবে আর্মি, মিলিশিয়া, বিহারি। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম মথুরাপুর ব্রিজ উড়িয়ে দেবো। আমরা এখন তিন জেলার মিলনস্থলে। কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর। আমরা একরাতে মথুরাপুর ব্রিজের একটা গার্ডার উড়িয়ে দিলাম। দুটো উড়ানো গেল না। রেললাইন তুলে ফেললাম।

২২ অক্টোবর, আমরা সন্ধ্যায় মতিনের বাড়িতে ঈদ-উল-ফিতরের খানা খেলাম। পরদিন ভোরে আমরা রাস্তা পার হয়ে যশাই এসে উঠলাম। আব্দুল্লাদের বাড়িতে। আজও বাড়িটা চিনি। আব্দুল্লাহ আমাদের নীচের ক্লাসে হাবাসপুর হাইস্কুলে পড়তো। দুপুরে আব্দুল্লাদের ওখানে খেলাম। আমার সাথি ওমর আলী, আজিজ, আরজুদের বিদায় দিলাম। প্রয়োজনীয় করণীয় বলে দিলাম। সন্ধ্যাবাদ আমি ,মতিন আর ইন্তাজ রওনা হলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। যশাই থেকে জয়কৃষ্ণপুর। কোন বাড়িঘর নেই। শুধু মাঠ। এ মাঠ আমাদের চেনা। এ মাঠ যেন সে মাঠ নয়। মাঠ যেন আমাদের চিনতে পারছে না। পানি কাদা ভেঙে গ্রামে ঢুকলাম। ইন্তাজকেও বিদায় দিলাম। গ্রাম থমথমে। কোন বাড়িতে বাতি নেই। কুকুরও ডাকছে না। তখন আমাদের গলিতে কাদা আর পানি। বাড়ির উপর দিয়ে পথ চলে গেছে রাস্তায়। প্রথম ঢুকলাম বক্তার প্রমাণিকের বাড়ি। আমাদের বাড়ির ঠিক পশ্চিমের বাড়ি। এটা আবার মন্টুর ভগ্নিপতির বাড়িও। ঘরের দরজায় টোকার শব্দে ওরা জাগলো। কে কে বলে উঠলো। বললাম, সামছা আর মন্টু। ওরা হতবাক! আমাদের সারা গায়ে কাদা। মন্টুকে বললাম, তুই থাক আমি বাড়িতে ঢুকি। বক্তার প্রামাণিকের মুখ বন্ধ করে দিলাম। বললাম, দাদা, কেউ যেন না জানে। আমাদের পাড়াটা ঘন বসতি বাড়ির সাথে বাড়ি লাগানো। এবার চুপিচুপি বাড়ি ঢুকলাম, কেউ টের পেলো না।

মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়ালাম, দেখি মা আমার বারান্দায় ভিজে মাটির উপর পড়ে আছে। আমার কাঁধের বোচকা মাটিতে নামিয়ে তার উপর এসএমজি রাখলাম। এবার মায়ের মাথার কাছে গেলাম। একবার মনে হল, মার দেহে প্রাণ নেই। আস্তে করে ডাকলাম, মা। ডাক শুনেই মা তড়াক করে উঠে বসলো। আমি তোমার সামছা মা। আঁধারে আমার মুখে হাত

দিয়েই বললো, বাবা তুই বেঁচে আছিস ? বলেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি মাকে বুকের মধ্যে পুরে নিলাম। মা কথা বলছে না, আমার চোখে মুখে গায়ে হাত বুলাচ্ছে। চুমু খাচ্ছে।

আমি মায়ের প্রথম সন্তান। ফিসফিস করে বলছে, তোরা বেঁচে আছিস। তোরা বেঁচে আছিস ! মাকে বললাম, রহমানও ভালো আছে। খুব ভালো আছে। আমাদের কানাকানি দাদুর কানে চলে গেল। দাদুর বয়স ৭০ এর উপরে। সবসময় সজাগ থাকে। কে কথা কয় সামছার মা ? মাকে ছেড়ে দাদুর কাছে চলে গেলাম। বললাম, আমি।

শুধু বললো, হে খোদা ! তুমি আমার কথা শুনলে। আমার কাকা, চাচীরাও উঠে এলো। বাবাও উঠে এলো। সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। কাকাকে বললাম, এই বোচকাটা আর অস্ত্রটা তোমার ঘরে রাখো। আমার সারা গায়ে কাদা আগে গোসল করে নিই। চাচীকে বললাম, খুব খিদে পেয়েছে। আমি পুকুর থেকে গোসল করে এলাম। আমার ব্যাগ থেকে লুঙ্গি জামা বের করে পরলাম। বারান্দায় বসলাম। সবাই আমাকে ঘিরে গা ঘেষে দাঁড়ালো। চাচী রান্না ঘরে চলে গেল। কাকা খুব খুশি। বললো, কলেরা ধরা গ্রাম, সারাদেশে অভাব, খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে। তারপর তোদের খোঁজ নেই। সন্ধ্যে হলেই ঘরে ঢুকে যাই?। কিন্তু কেউ ঘুমায় না। সবার কান খাড়া। কোন বাড়িতে কলেরা ঢুকলো অথবা তোদের ডাক এলো। কলেরা এলো না। তোদের ডাকই এলো। পাশের বাড়ির পচা দাদা শুয়ে শুয়ে হাক দিলো কী হলো রে পিরালি ? আমার কাকার ডাক নাম পিরালি। ভালো নাম আব্দুস সাত্তার মোল্লা। আমি হাতের ইশারায় না করে দিলাম। কাকা বললো, না কিছু না। গোয়াল ঘরের গরু দেখলাম। ভর্তা ভাত। অনেকদিন পর মা চাচির হাতে ভাত খেলাম। সে কি খাওয়া! যেন স্বর্গের প্রসাদ। বাপ চুপচাপ শুধু সামনে আসছে, আর দেখে চলে যাচ্ছে। তাকে বুঝা যায় না। শক্ত মানুষ ছট্‌ফট ছট্‌ফট করছে। খাওয়া শেষে চাচাকে আর মাকে কিছু টাকা দিলাম। দাদুকেও দিলাম। বললাম, ভারত থেকে পাওয়া এ টাকা। মাকে বললাম, ঘুমাবো।

মা বললেন, না এবার বউ বাচ্চা দেখে আয়। তার আর শ্রী নেই। এবার পাটির পর কাত হলাম। ক্লান্তি চেপে ধরেছে জুত করে। মা বললেন, তুই শুলি যে। যা বাবা একবার চোখের দেখা দিয়ে আয়। আমরা সবাই তোদের মরার খবর পেয়েছি। বাঁচার কথা কেউ বলে নাই। দুই তিন দিন আগে

তোর বাবা জেনেছে তোরা দক্ষিণে আছিস। আমি বিশ্বাস করি নাই কেউই করে নাই। বলেছি ধোঁকা। মা আমাকে জোর করে উঠিয়ে দিল।

আমার বোচকাটা কাকাকে দিয়ে বললাম, এটা লুকিয়ে রাখো আমাদের বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও। ওটা নাড়াচাড়া করতে যেও না। আমার এসএমজিটা তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে বের হলাম। আমার সাথে সিগারেট দিয়াশলাই। চাচী পথ বলে দিল। যে পথ আমরা ফেলে গিয়েছিলাম সে পথ আর নাই। দুইবারের বন্যায় পানি সরলেও পানির তলানি সব জায়গায়। বাড়ির উঠানে হাটু সমান পলিমাটি জমেছে। বিলের পানি সরছে ধীরে ধীরে। সেতো দেখেই এসেছি। কাদাপানি ভেঙে বড় রাস্তায় উঠলাম। আমার শ্বশুরবাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে হেঁটে গেলে বড়জোর ১০ মিনিট লাগে। একদম বড় রাস্তার লাগোয়া। সিগারেট টানছি আর ভাবছি, যে মানুষটাকে দেখতে যাচ্ছি সে আমার জীবন সাথী। দেশ ছাড়ার সময় তাকে সত্য বলে যায়নি। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছিলাম ২/৩ দিন পরই ফিরবো। সে তখন ছিল অন্তঃসত্তা। ব্রিজ পার হয়েই ডানে ওদের বাড়িতে ঢুকলাম। সোজা উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বারান্দায় চোখ পড়তেই দেখি খুঁটি হেলান দিয়ে কে যেন বসে আছে। একেবারে কাছে গিয়ে বললাম, কে রে বসে ? চিনে ফেললাম, ঝর্নার মা। অর্থাৎ আমার স্ত্রী আমেনা বেগম। শুধু আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। কোন কথা না বলে মাথার কাঁপড় তুলে দিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল। শুয়ে শুয়েই ঘরের ভেতর থেকে শ্বাশুড়ি জিজ্ঞেস করলো, কে রে আমেনা? হঠাৎ আমার অনেক উপকারী বড় ভাবির কথা মনে পড়ল। ওদের ঘরের সাথেই ঘর। কোন উপায় না দেখে ভাবির ঘরের সামনে গিয়েই ডাক দিলাম, 'ভাবি'। ভাবির কান খাড়া ছিল। হুড়মুড় করে বিছানা ছেড়ে দুয়ার খুলে বারান্দায় এসেই দেখে আমি দাঁড়িয়ে। আমাকে ধরে ফেলে কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলো, 'তুই বেঁচে আছিস ?' 'তুমি বেঁচে আছো ? '

আঙুল তুলে চুপ করতে বলেই বারান্দায় মাটিতে বসে পড়লাম। আমার শাশুড়ি উঠে গেছেন। জিজ্ঞাসা করলো, কে রে ফজির মা ? ভাবি মুখে কিছু বললো না। দৌড়ে উঠে গিয়ে মনে হয় বলে এলো ? শাশুড়ি সামনে এলেন না। মনে হল সবাই সময় নিচ্ছে নিজেদের সামলাতে। মনে হচ্ছে ওরা ভূত দেখছে। ভাবি উঠে গেল আমেনার ঘরে। আমি বারান্দায় একা বসে রইলাম। এই ভাবিটা আমাদের কাছে মায়ের মতো।

আমাদের মান অভিমানের অনেক সমস্যাই সমাধান করে দিতো। ভাবি ওর ঘরে যেতেই ও নাকি ভাবিকে বললো, ভাবি ঝর্নার বাপের মতো একটা লোক এসে ওকে বললো, কে রে বসে ? আমি ভয়ে কোন কথা না বলে উঠে ঘরের ভেতর চলে এসেছি। আমার দারুন ভয় করছে। বাইরে শুনি একরকম। ও কোত্থেকে আসবে ? ও কি আছে যে আসবে ? ভাবি ওর হাত ধরে আমার সামনে নিয়ে এলো। একদম ঠান্ডা। কোন কথা নেই। আমি সিগারেট ধরাচ্ছি আর ফেলছি। ইতিমধ্যে ভাইয়েরা উঠে আমাকে ঘিরে ধরেছে। সবাই কত কিছু জানতে চায়। যারা সিগারেট খায় তাদের সিগারেট দিলাম। বললাম, আজ কোন কথা বলা যাবে না। এ বাড়ি রাস্তার ধারে দেওয়ালেরও কান আছে। আমি বেঁচে আছি দেশে ফিরেছি এখন এটাই সত্য। আমি উঠবো। আমার শাশুড়ি নাড়ু মুড়ি খেতে দিলেন। কিছু খেলাম। বাকিটা শার্টের পকেটে ভরে নিলাম। আর হেসে হেসে বললাম, কাল কোথায় থাকি তার তো ঠিক নাই, নাই খাওয়ারও ঠিক। তাই নিয়ে নিলাম। খাওয়া জুটবেই। এটা নেওয়া আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এবার সবাই সরে পড়লো। আস্তে করে ওর মাথায় হাত রাখলাম। সদ্য কাটা লাউয়ের ডগার মতো, আমার কাঁধে ঢলে পড়লো। সাথে বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস। চুপচাপ, কথা বলতে চাইতেই মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দিল। মনে হল, জীবন ফিরে পেয়েছে। প্রাণভরে অক্সিজেন নিচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে আপনাআপনি মাথা তুলে বললো, চলো বাবুকে দেখবে। ওর পিছু পিছু গেলাম। বাবু ঘুমিয়ে আছে। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। মেয়েকেও। মেয়ের বয়স ৭১ শেষ হলে দু'বছর হবে।

কাউকে কোলে করলাম না। সবাই সহজ হয়ে এলে বললাম, এখন আমাকে কেটে পড়তে হবে। তুমি আমার খবর পাবে। তোমাকে কেউ এসে ডাকবে ভাবি বলে। বুঝবে ও আমার সাথী, ওর কাছেই আছি। চেনা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আবার ২/১ দিনের মধ্যে আসবো। ঘরের বাইরে এসে ইউসুফ ভাইকে ডেকে হাতে বেশ কিছু টাকা গুঁজে দিলাম। পথে বের হয়ে পড়লাম। পিছন ফিরে তাকালাম না।

খবর বসে থাকে না। আমাদের বার্তা বাতাসের পাখায় ভর করে ছড়িয়ে পড়লো। কেউ আমাদের দেখতে পায় না। আমার সকল আত্মীয়কে সাবধান করে দিলাম। আমেনাকে বললাম, সন্ধ্যার পর ভাবিদের সাথে অন্য কোথাও

চলে যেতে। ঘরে থাকা যাবে না। অনেকেই আমাকে দেখতে আসে দেখা মেলে না। এই আছি, এই নাই। আমাদের থানা হেড কোয়ার্টারে পাক আর্মির ঘাঁটি আছে। পাশে পদ্মা নদীতে আর্মির বোট টহল দেয়। মতিনের এলাকায় গুপ্তচর নিখোঁজ, রাজাকার রাইফেলসহ গায়েব, মথুরাপুর ব্রিজের গার্ডার উড়ানো এসব কারণে ঐ এলাকায় পাক আর্মি তাদের তৎপরতা জোরদার করেছে। মতিনরা স্থান পরিবর্তন করে কখনও আমাদের এলাকায় কখনও কুষ্টিয়া জেলার অজ পাড়াগায়ে থাকছে।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের নেটওয়ার্ক গড়ে ফেলেছি। হিট অ্যান্ড রান করতে প্রস্তুত। আমরা বকসিপুর গ্রামের বিজা সরকার এর বাড়িতে ঘাঁটি গাড়লাম। এখানেই খাওয়া দাওয়া এখানেই থাকা। মাঝে মাঝে আমাদের ক্যাম্পে অন্য গ্রুপের মুক্তিরা আসে এবং রাত কাটায়। এবার আমরা সব গ্রুপ একসাথে বসে ঠিক করলাম, পাংশার সাথে বাইরের সব যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেবো। একরাতে আমরা সবাই মিলে কালুখালীর পাশে রেললাইন তুলে ফেললাম। ইচ্ছে আছে কালিকাপুর ব্রিজ উড়িয়ে দেবো। কিন্তু পাহারা কঠোর। ওরা ব্রিজ মেরামত করে, আমরা তুলে ফেলি।

এই খেলা কয়েকবার চলার পর মিলিশিয়ারা এক সকালে পাংশা থেকে চলে গেল। আমার গ্রুপ সে সময় অবস্থান করছিল পাংশার ঠিক পশ্চিমে এক মাঠের মধ্যে। আমার গোয়েন্দা সবার আগে এই খবরটি আমাকে জানালো। আমরা তড়িৎ গতিতে মুভ করে থানায় ঢুকে পড়লাম। পুলিশদের হ্যান্ডসআপ করিয়ে বাইরে লাইন ধরে দাঁড় করালাম। সোজা হুকুম, বাধা দিলে ব্রাশ চালাবে। ওদের বললাম, সিভিল কাপড় পরে যার যার বাড়ি চলে যান, এখানে থাকবেন না। ওসি সাহবে আগেই সরে পড়েছে। আমরা থানা লুট করায় ব্যস্ত। আধা ঘণ্টার মধ্যে মতিন তার দলবলসহ হাজির হলো। থানার অস্ত্র গোলাবারুদ সব একজায়গায় জড়ো করে আমি আর মতিন ভাগ করে নিলাম। ঘোড়া গাড়িতে করে, আমাদের ছেলেদের কাঁধে, মাথায় বোঝা বেঁধে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেললাম। আমাদের কাছে যে বাংলাদেশের যে পতাকা ছিল তা উড়িয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে সব গ্রুপ এসে গেছে। পাংশার ছোটোখাটো নেতারাও এসে গেছে। সব গ্রুপ মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম পাংশাতে আর্মি, মিলিশিয়া আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। একমাত্র যোগাযোগ রেল তাও আমরা নানা জায়গায় উপড়ে ফেললাম। আমাদের থানার পতন হয়ে গেল।

আমার মনে আছে জনাব ইয়াছিন ফকির, ওহাব প্রফেসর কোত্থেকে বাংলাদেশের একটা বিরাট পতাকা জোগাড় করে এনে সব নেতারা মিলে থানায় উড়িয়ে দিলেন। চর আফড়া এবং বকশীপুরের ক্যাম্প ক্লোজ করে পাংশায় নিয়ে এলাম। নতুন ক্যাম্প হলো ব্রজেন কুন্ডুর বাড়িতে। এবার সকল দল পাক আর্মির সোর্সদের আটকে দিলাম। পাংশায় একটা বিরাট উঁচু ওয়ারলেস টাওয়ার ছিল। আমার বন্ধু ফুলবাড়িয়ার আব্দুস সাত্তার সেখানে চাকরি করতো। সে আমাকে গোপনে বললো, এই টাওয়ারের ৭/৮ টা ছোট ব্যাটারি আছে। ওগুলো খুব দামি। ওগুলো তোমরা নিয়ে গেলে, টাওয়ারের সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। আমার অফিসারকে চার্জ করো। আমার কথা বলো না। ওর কথা মতো অফিসারকে সোজা বললাম, ওয়ারলেসের ব্যাটারিগুলো দিন।

ভদ্রলোক ভাবতেও পারেনি আমরা ব্যাটারির খোঁজ পাবো। আমার হাতে ব্যাটারিগুলো উনি তুলে দিলেন আর বললেন, এগুলো খুব দামি, দেশ স্বাধীন হলে, স্বাধীন দেশের জন্য এই ওয়ারলেস চালু করতে ওগুলো লাগবে। কারো কাছে দিবেন না। নিজের কাছে রাখবেন। যদি আমি এখানে থাকি, দেশ স্বাধীন হলে এর খোঁজ পড়বে। তখন আপনার কাছ থেকে ওগুলো নেবো। ঐ জিনিসগুলো কারো হাতেই দেইনি। কাচারি পাড়া গ্রামের আমার বন্ধু মজিবর মন্ডলের কাছে জমা রাখলাম। তাকে সাবধান করে দিলাম, এগুলো যেন না হারায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঐ ভদ্রলোক আমার সাথে যোগাযোগ করেন।

ওয়ারলেস চালু করার জন্য ব্যাটারিগুলো ফেরত চান। আমি আমার কয়েকজন বন্ধুর সামনে ঐ লোকটার কাছ থেকে বুঝে পেয়েছি লিখিত নিয়ে ফেরত দিলাম। অস্ত্র নিয়ে দেশে ঢোকার পর যেসব মানুষের, নারীদের সাহায্য পেয়েছি তাদের কথা না লিখলে অকৃতজ্ঞ থেকে যাবো। আমাদের থাকার ব্যবস্থা, খাবার তৈরির ব্যবস্থা, এমন কি রাত জেগে পাহারা তারা আমাদের দিয়েছে। মনে পড়ছে সেই মহিয়সী নারীর ডাক, 'বাবারা উঠো আর্মি এসে গেছে।' আঁচলের তলে ঢেকে নিয়ে ভাটির বনে আমাদের লুকিয়ে রেখে পাহারায় বসে গেল। চুয়াল্লিশ বছর পরও ঐ ডাক আমার কানে বাজে, 'বাবারা উঠো, আর্মি এসে গেছে।' সে কি মমতাময়ী ডাক! নাড়িছেড়া ডাক! উদ্বিগ্ন মা তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য দিশেহারা।

আমার চোখের উপর আজও ভাসে সে দৃশ্য। চৌগাছায় আম বাগানের

নারীরা আমাদের খাবার তৈরি করছে, দুই তিন শ জনের খাবার। কেউ বাটনা বাটছে, কেউ কুটনা কুটছে, কেউ পানি আনছে, খড়ি আনছে, কেউ বারবার চুলার উপর খাবার পরীক্ষা করছে। শাড়ির আঁচল কোমরে শক্ত করে বাঁধা, মাথার চুল শক্ত করে আটকানো, কোন ঢিলেঢালা ভাব নাই। আগুনের তাপে সুন্দর মুখগুলো আরো সুন্দর হয়েছে। শ্রান্তি-ক্লান্তি বলতে কারো কিছু নাই। মনে হল এরা যুদ্ধ করছে। যদি এদের হাতে হাতিয়ার তুলে দিতাম ওরা নির্ভীক চিত্তে গুলি চালাতে পারতো।

নারী যখন গর্জে ওঠে পুরুষ তার সামনে টেকে না। আমি পরাণভরে এ দৃশ্য দেখেছি আর আমার দুঃখিনী মা আর স্ত্রীর কথা ভেবেছি। এসব মেয়েদের কেউ না কেউ যুদ্ধে গেছে। তাদের কথা স্মরণ করে বুকভরা মায়া নিয়ে, দরদ নিয়ে আমাদের কাজ করে যাচ্ছে। এদের হাতে যখন বটি দেখি, দা দেখি, কুড়াল দেখি, কাঠের লাকড়ি দেখি তখন কালিদেবীর খড়্গ হস্তের কথা মনে পড়ে। আমাদের বিদায় দেওয়ার সময় এদের অনেককে নীরবে আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছতে দেখেছি। আল্লার হাতে সঁপে দিয়ে আমাদের বিদায় দিয়েছে। চেনা নেই, জানা নেই, জাত পাতের ঠিক নেই, তাদের জন্য মানুষ কখন কাঁদে ? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের এই অবদান কোনদিন স্বীকৃতি পাবে না, তবে খোদার খাতায় জ্বলজ্বল অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে এদের নাম। তাদের অন্তরের কথা, অন্তরের ব্যথা আর কেউ না জানুক, খোদা তো জানে। মনে পড়ে গেল, রবীন্দ্রনাথ এর 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতার শেষ কয়েকটি লাইন,

"পথে চলা এই দেখাশুনা
ছিল যাহা অগোচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে
চিত্তে আজ তাই জেগে উঠে
এই-সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে"।

এদের সাথে কি আবার দেখা হবে ? হবে না। আমরা অনেকেই হারিয়ে যাবো। মনের গভীরে আঁকা এই সব ছবি, উপেক্ষিত ছবি আমাদের মনের পর্দায় ভেসে উঠবেই। এবার আমরা অনেকটা ফ্রি হয়ে গেছি। চলা ফেরাও জন সমক্ষে চলে এসেছে। আমি ২/৩ দিন

পর পর আমেনাকে দেখতে যাই। দিনে বেশ সময় কাটাই। রাত থাকিনে। পাক আর্মিরা মরণ ছোবল মেরে চলেছে। রেলপথ সবল করতে না পারায় নদী পথ বেছে নিয়েছে। আর্মি বোটে টহল জোরদার করেছে। কিন্তু পাড়ে নামে না। আমরাও নদীর ঘাটে লোকজনকে যেতে নিষেধ করেছি। ইতিমধ্যে বোট থেকে গুলি এসে নদীর পারে কর্মরত এক চাষী মারাও গেছে। তাই সতর্কতা। আমি ও রাজ্জাক আমাদের গ্রুপকে বলে দিয়েছি, আমাদের ছাড়া কেউ আসামি ধরতে বেরুবে না। এখন আসামি ধরা মানে টাকা আদায় করা। তারপর ছেড়ে দেওয়া। কিছু কিছু নেতা এসব কাজে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করছে। সহজ সরল ছেলেরা ওদের বিশ্বাস করে। ঘটনা সত্য ভেবে কাজ করে চলেছে। আমরা একাজে পা বাড়ালাম না। জানি এর ফল ভালো হবে না।

আমরা দেশে ঢোকার আগে সালাম বিশ্বাসের বাড়ি লুটপাট হয়েছে। কারণ ওরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দেয়নি। মুখে উল্টা-পাল্টা কথা ছাড়া পাক বাহিনীকে সাহায্যও করেনি। সমর্থন ছিল নৈতিক। ৭০ এর নির্বাচনেও আওয়ামীলীগকে ভোটও দেয়নি। আমার বাড়ি থেকে ১০০ গজ দূরে ওদের বাড়ি। বাড়ি এসে সব শুনলাম। সালাম বিশ্বাস পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কুদ্দুস বিশ্বাস দেশ ছাড়া। সেই আসল টার্গেট। তাকে ধরতে পারে নাই মুক্তিরা। আজিজ বিশ্বাসকে নিয়ে আটকে রেখে আবার ছেড়ে দিয়েছে। এ লোকটা রাজনীতিতে নেই, সে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে থাকে। আমরা ইয়াংরা তাকে ভালোবাসি। আমার ধারণা মুক্তিবাহিনীতে তার কিছু ভক্ত ছিল বলে, সে ছাড়া পেয়েছে। এই পরিবারটা খুব বিপদে আছে। ঐ বাড়িতে প্রকাশ্যে অপারেশন হতে পারে সব গ্রুপের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। একদিন মা খেতে দিয়ে পাশে বসে খাওয়া দেখছে। হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বললো, বাবা তুই ভাত ছুঁয়ে কসম কর, ছালাম বিশ্বাসের আর যেন কোন ক্ষতি না হয়। আমি হতবাক! খাওয়া বন্ধ করে মা'র দিকে তাকিয়ে আছি। মা আমাকে বারবার বলছে, বল না বাবা।

আমি একটু সময় নিয়ে বললাম, ঠিক আছে মা। তোমার কথা জান প্রাণ দিয়ে রাখার চেষ্টা করবো। মা আমার হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। পরে জেনেছি বাবলুর মা অর্থাৎ সালাম বিশ্বাসের স্ত্রী এসে আমার মা'র হাতে পায়ে ধরে এসব ফন্দি বের করেছে। তবে মাকে বললাম, কুদ্দুস যদি হাতে পড়ে তাকে

বাঁচানো যাবে না।

আমাদের রহমত পুলিশে চাকরি করেছে সিপাহি পদে। আমাদের গ্রুপের সবাই ওর চাইতে বেশি শিক্ষিত। ঐ যে হুদা সাহেবের কথা, 'সেও তোমার সাথে থাকলো।' সাথে আছে ঠিকই, সকল হুকুম, সকল প্লান, সকল ম্যানেজমেন্ট আমাকেই করতে হয়। মতিন, আজাদ, সাচ্চু সবাই উচ্চ শিক্ষিত। সাচ্চু, আজাদ আমার সামান্য জুনিয়র। প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করে। মতিন আমার কলেজ সহপাঠি আগেই বলেছি। এদের ফেস করার ক্ষমতা রহমতের নেই। ওরা ছাত্র জীবনে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত।

এই অভ্যাস ছিল আমারও। ওরা আমাকে বড় হিসেবেই দেখে। সকল গ্রুপ কমান্ডদের মিটিং ডাকা হল হাবাসপুর ফটিক ভাইয়ের বিল্ডিংয়ে। মুজিববাহিনী এবং এফ, এফ বাহিনীর প্রধানরা উপস্থিত থাকবেন। আমার বন্ধু মজনুও থাকবেন। ওরা বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা হলেও অন্য এলাকায় থাকে। চাকুলিয়া থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত। এদের সাথে আলোচনার ক্ষমতা এবং মাথায় কুলিয়ে উঠার ক্ষমতা রহমতের নেই। তাছাড়া ওরা আমাকে যেভাবে নেবে অন্য কাউকে নেবে না। অন্য গ্রুপেও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আছে। তারাও আমার ব্যাপারে আস্থা রাখে। যাই হোক আমরা মিটিং এ বসলাম। আলোচনা আমরা কোথায় কোথায় অপারেশন করবো। এবার সালাম বিশ্বাসের কথা উঠে এলো। মজনু পরিষ্কার বললো, এদের সবাই কিলিং এর যোগ্য, শুধু আজিজ মেম্বার বাদে। ওরা ঘোর মুসলিম লীগ। তাছাড়া কুদ্দুস পিন্টুর বাবাকে বিশ্রীভাবে অপমান করেছিল। কেউ কোন কথা বলছে না। আমার মনে হল, ফটিক ভাই ছাড়া অন্য সবাই মনে মনে সিদ্ধান্ত মেনে নিল। আমাদের রহমত ও চুপচাপ।

আমার দলের অনেকেই সালাম বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী, আবার অনেকে সালাম বিশ্বাসের পক্ষে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, এই ব্যাপারে আমার কিছু কথা আছে। সালাম বিশ্বাস আমার নিকটতম প্রতিবেশি। তাদের যদি কিলিং করতে হয়, সে কাজটা আমি করবো। রাতের আঁধারে অন্য কেউ কিলিং করলেও এর চাপটা আজ হোক, কাল হোক আমার উপর আসবে। সুতরাং একাজ আমি অন্য কাউকে করতে দেবো না। কিন্তু তার অপরাধ ? সেকি রাজাকার ছিল ? ওরা কি লুটেরা ছিল ? ওরা কি পাকবাহিনীর সাথে থেকে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটে সুযোগ নিয়েছিল ? ওরা কি পাক আর্মির সাথে যোগাযোগ রাখতো ? ওরা কি পাক আর্মি ডেকে কোন

মুক্তি বাহিনীর দলকে খুন করিয়েছিল ? এমন প্রমাণ কেউ দিতে পারবেন ? যদি এগুলোর কোন একটা করতো, আমি আগে জানতাম। আর ক্ষতি করলে আমাকেই আগে মারতো। একটু বানিয়ে বললাম, ওদের সাথে আমাদের জমিজমা নিয়ে মামলা আছে, দাবড়া দাবড়ি আছে। আছে পাচু শেখের সাথে, আমার তো কোন কমপ্লেন নেই। নাই পাচু শেখের গোষ্ঠির কারও। যদিও বিহারিরা ওনাকে শহীদ করেছে। কেউ তো আজ পর্যন্ত সালাম বিশ্বাসের নাম বা ঐ বাড়ির আর কারও নাম উচ্চারণ করে নাই। শুধু মুসলিম লীগকে সমর্থন করার জন্য যদি উনি কিলিং এর যোগ্য হন, তাহলে আমি তাকে মেরে ফেলবো প্রকাশ্য দিবালোকে অনেক লোকের সামনে। এখন আপনারা বলুন সে কিলিং হওয়ার যোগ্য কি না ? ফটিক ভাই গলায় পানি পেল। সে বললো, না যোগ্য না। সাচ্চু, আজাদ আমার বক্তব্য সমর্থন দিল। মজনু আমার কথা মানতে নারাজ। সে বললো, কুদ্দুস ? বললাম, তাকে যেখানে পাবে, সেখানেই গুলি করবে। আজিজ মেম্বার একজন প্লেয়ার, খেলা ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। কেন তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল ? কেন ঐ বাড়ি লুটপাট করা হল। আমরা কি লুটপাটের জন্য হাতিয়ার নিয়ে এসেছি। আমি আমার কথা বলি, 'আমার সেক্টর কমান্ডরের আদেশ, যে তোমার উপর হাতিয়ার তুলবে, তুমি তার উপর হাতিয়ার তুলবে।' "আর কোন জীবিত গুপ্তচর রাখবে না"। মুসলিম লীগকে সমর্থন করে, পাংশা থানায় এরকম একশত জনের নাম আমার জানা আছে। তাদের কী হবে ? তাদের আপনারা কী ব্যবস্থা নেবেন ? যদি চান, এখনই তাদের তালিকা, আপনাদের সামনে পড়ে শোনাবো।

আপনাদের মনে হতে পারে সালাম বিশ্বাস আমাকে হাত করে ফেলেছে? না, আমরা ঐ বাড়িতে এক গ্লাস পানিও খাই নাই। আমাদের রহমত, ঝন্টুরা হয়তো ডাল ভাত খেতে পারে। আমি এই মুহূর্তে বিরোধীয় জমিগুলো সালাম বিশ্বাসের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারি। সে জীবনেও আর দাবি বা মামলা করতে পারবে না। আপনাদের সামনে আমি ওয়াদা করছি, আমার দ্বারা তা হবে না। কোর্ট যে সিদ্ধান্ত দেবে তাই মেনে নেবো। ওনাকে তো মেরে ফেলার কথা আমার। আমার স্বার্থ আছে, জমি লিখে নিয়েও মেরে ফেলতে পারি। আমি এখন যা চাবো ওরা তাই দেবে।

আমি একটা প্রস্তাব রাখছি। আপনাদের যার যার এলাকায় মুসলিম লীগার আছে আপনারা তাদের কিলিং করুন। সালাম বিশ্বাসকে আমি করি।

মজনুকে বললাম, দোস্ত ১৯৭০ এর নির্বাচনে তোমার বাড়ির কাছের কারা কারা গরুর গাড়িতে ভোট দিয়েছিল, তা তোমার খুব মনে আছে। ওরাও মুসলিম লীগার। তাদের কিলিং এর ভার তোমাকে নিতে হবে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সালাম বিশ্বাসের কিলিং করা অন্যায়। এটা আমার বদনাম। এ বদনাম আমাকে সারা জীবন টানতে হবে। আমি সারা জীবন কলঙ্ক টানতে পারবো না। এরপরও যদি কেউ ওনাকে হত্যা করার চেষ্টা করে, আবার ঐ বাড়ি লুট করার চেষ্টা করে, তাকে আগে আমাকে মোকাবেলা করতে হবে। এই বলেই উঠলাম। আমার দেখাদেখি আজাদ, সাচ্চু ও উঠলো। সাচ্চু আর আজাদকে বললাম, বন্ধুরা কোন অপারেশন এর প্লান থাকলে আমাকে জানাবেন। বিল্ডিংয়ের বাইরে আসতেই ফটিক ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, মনি, তুই আমাকে বাঁচালি। আমি ওদের সামনে কোন কথাই বলতে পারছিলাম না। আমি মনে প্রাণে চাই, ওদের অন্য ক্ষতি হোক, মেরে ফেলা যেন না হয়। সাচ্চু আর আজাদ বললো, সামছা ভাই, সালাম বিশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নাই। আপনি যেটা ভালো বুঝবেন তাই হবে। পিন্টু আমার পর ক্ষেপে আছে। ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। পরদিন ওর সাথে দেখা করলাম। মনটা ভার ভার। ওকে বললাম, কুদ্দুসকে আমি গরু খোঁজা খুঁজছি। হাতে পেলেই তোকে দিয়ে দেবো। তোর মনটা নরম করে আমার পর বিশ্বাস রাখ। তুই আমি ছোটবেলার সাথী। তোর অপমান আমার অপমান। সালাম বিশ্বাস আমার কেউ না।

ওরা মামলাবাজ। আমাদের সাথে মামলা চলছে। বিনা দোষে কিলিং করলে আমাদের উপর আল্লাহর গজব পড়বে। তোর আমার সন্তানেরা আমাদের ঘৃণা করবে। ওরা কিলিংয়ের যোগ্য কোন অপরাধ করেনি। রক্ত একবার মাটিতে পড়লে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এর রেশ ধেয়ে চলবে। আয় আমরা সহ্য করি। অন্যভাবে ওদের শায়েস্তা করি। এবার ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখ রেখে বললো, যা তোর কথা মেনে নিলাম। তুই আমার এতো কাছের যে আমার কোন অমঙ্গল তুই চাবিনে। তবে কুদ্দুসকে তুই একটা কিছু করিস। হ্যাঁ, তা করবো।

মিটিংয়ের পরদিন থেকেই সালাম বিশ্বাসকে বাড়িতে থাকতে বলে দিলাম। কারণ কেউ গেরিলা গিরি করে অঘটন ঘটাতে পারে। আর বলে দিলাম, আমার কথা না শুনলে দায় দায়িত্ব আমার না। আমি যা যা মিটিংয়ে বলেছি

ফটিক ভাই সব আজিজ মেম্বারকে বলে দিয়েছে। আজিজ মেম্বার সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নিচ্ছে। পিন্টুকে তোয়াজ করে করে একেবারে স্বাভাবিক করে ফেলেছি। আমাদের মন্টু সালাম বিশ্বাসের উপর ক্ষেপা। কারণ বর্গা জমি কেড়ে নেওয়া। এমন করেই সপ্তাহখানেক পার হলে উত্তেজনা মিইয়ে গেল। আমাদের গ্রুপ নেতাদের মাঝে মাঝে কথা হয়।

রাজবাড়ীর পতন দরকার। তবে ওখানকার গ্রুপ আমাদের না ডাকলে যাই কী করে ? পাংশার ক্যাম্পে সব গ্রুপ খায়দায়-আর এদিকওদিক ঘোরাফেরা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের চলা ফেরায় অনেকটা ঢিলেঢালা ভাব এসে গেছে। কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধা গোপনে সীমার বাইরে যেতে শুরু করেছে।

এমন সময় রাজবাড়ী থেকে খবর এলো, রাজবাড়ী মুখো মার্চ করতে হবে সব গ্রুপের মধ্যে একটা সাজ সাজ ভাব পড়ে গেল। রাজবাড়ীর অনেক যোদ্ধারা আমাদের সাথে ভিতরে ঢুকেছে। ওদের সাথে আমার দহরম মহরম বেশি। ভারতে থাকতে থাকতে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক হয়েছিল। ওদের আহ্বান আমরা ফেলে দিতে পারিনে।

লালী আমাকে বিশেষ করে চিঠি লিখে জানিয়েছে। চিঠিটা আজ আর নেই। তবে রাজবাড়ী বিহারি মিলিশিয়া আর্মির শক্ত ঘাঁটি। শক্ত প্রতিরোধ হবে। সবাইকে পাংশা ক্যাম্পে অবস্থান করার নির্দেশ দিলাম। তবে যে যাবে না তার হাতিয়ার আমাদের দিয়ে দিতে হবে। না দিলে আমরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ে নেবো। রহমত আমার সাথে একমত।

সবাই ক্যাম্পে অবস্থান করা শুরু করলো। সব গ্রুপের মুক্তিরাও রাজবাড়ী মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে নিল। শুধু দিন ক্ষণের অপেক্ষায়। আমাদের সবার মধ্যে টান টান ভাব। লোকালভাবে আমরা অনেককেই দলে ভিড়িয়েছি। অনেককে অস্ত্র দিতে পেরেছি, অনেককে পারি নাই।

এদের মধ্য থেকে শক্ত সামর্থ্য সাহসী দেখে বেছে নিলাম। আর কিছু নিলাম সহযোগী। যারা আমাদের গুপ্তচর বৃত্তির কাজে লাগবে। সাথে বাবুর্চি সাদেক আলী শেখকেও নিলাম, যদি কাজে লাগে। তখন কোথায় পাবো ? সামনে কী আছে তা আল্লাহই জানেন। মনোবল আমাদের প্রচণ্ড দৃঢ়। মৃত্যুভয় একেবারেই নাই। স্বাধীন দেশের বাতাস কবে বুকে পুরবো, সেই প্রত্যাশায় দিন কাটতে লাগলো।

রাজবাড়ীর যুদ্ধ

রাজবাড়ী আমাদের মহকুমা শহর। পাক আর্মি মিলিশিয়া ও আবাঙালিতে এখন ঠাসা এই ছোট্ট মহকুমা শহরটা। এর বুকের উপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত। পাকারাস্তা ফরিদপুর শহরের দিকে। দক্ষিণে পদ্মা নদী। রাজবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধারা আজও শহরটা আয়ত্তে নিতে পারে নাই। অবাঙালিদের নৃশংসতায় ওরা দিশেহারা। পাংশার পতন শুনেই ওরা আমাদের খবর পাঠালো রাজবাড়ী অভিমুখে মার্চ করার জন্য। আমরা সব গ্রুপ তৈরি। শুধু কে কখন যাবে এই যা। আমাদের সব গ্রুপেই মুক্তিযোদ্ধা বেড়ে গেছে। রহমত ও আমি স্থানীয়ভাবে ট্রেনিং নেওয়া ছেলেদের বাছাই করে ফেললাম। বিশেষ করে যারা সাহসী, নির্ভিক, পরিশ্রমী ও দেহে মনে বলিষ্ঠ তাদেরই অগ্রাধিকার দিলাম। আরও কিছু ছেলে অতিরিক্ত নিলাম। যেকোন সময় যেকোন কাজে ব্যবহার করা যাবে। বাবুর্চি সাদেক আলী শেখ ও বানাত আলী ম ল্লকেও নিলাম। রাজবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধা লালী বারবার মেসেজ পাঠাচ্ছে ত্বরিৎ যাওয়ার জন্য। সাচ্চু, আজাদ, মতিন, মজনুর সাথে কথা বলে দিন তারিখ ঠিক করলাম। কিন্তু সব গ্রুপ তারিখ ঠিক করতে পারলো না। শুধু মনে পড়ে ১০ কি ১১ ডিসেম্বর রওনা হলাম। আমরা পদ্মা নদীর পাড় ধরে চলছি। পথে রাত হয়ে গেল। এক গ্রামে ঠাঁই নিলাম। আমাদের রাতে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা ওনারা করলেন। পরদিন সকালে আবার রওনা হলাম।

আমরা যারা সচেতন তারা বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, রেডিও তেহরাণ ইত্যাদির মাধ্যমে খবর শুনি। শুনি এদের বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্লেষণ। ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের মতে মুক্তি বাহিনীর কাজ কি ? আমাদের প্রবাসী সরকার মুক্তিবাহিনীদেরকে দিয়ে কী করাতে চায় ? বুঝতে পারলাম,

১। আমাদের স্ব স্ব এলাকায় ফিরে যেতে হবে এই জন্য যাতে জনগণ মনোবল ফিরে পায় এই ভেবে মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ শুরু করেছে।

২। পাকসেনাদের মুভমেন্ট বন্ধ করে দিতে হবে। এমন কি তাদের খাদ্য সামগ্রীও যেন তাদের কাছে পৌঁছাতে না পারে। রেল, ব্রিজ, কালভার্ট ধ্বংস করে দিতে হবে।

৩। এদের সহায়তাকারীদের নির্মুল করতে হবে।

৪। সুযোগ বুঝে ওদের সামরিক কনভয়ের উপর আক্রমণ চালাতে হবে। গোলাগুলো লুট করে সমস্ত আগ্নেয় অস্ত্র নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে পাকবাহিনী ও তার সহকারীদের উপর ব্যবহার করতে হবে। যেসব যুবকরা ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পায় নাই। তাদের হাতে ঐসব অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের কাজে লাগাতে হবে। মোটকথা পাকবাহিনীকে নিজেদের রক্ষায় ব্যস্ত রাখতে হবে।

ভারত যুদ্ধ শুরু করলে এই সব মুক্তিবাহিনীকে পূর্বাঞ্চলীয় ফোর্সের সহায়ক হিসাবে পাওয়া যাবে। ২৩ শে অক্টোবর দিনের বেলায় প্রাক্তন গভর্নর আব্দুল মোনেম খানকে তার বাড়িতে গুলি করে মারা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো। স্টেট ব্যাংক ভবনে বোমা ফাটানো হলো। গভর্নর হাউসের লাগোয়া ডিআইটি ভবনে অবস্থিত টিভি কেন্দ্রে আগুন ধরানো হল। ১১ অক্টোবর ঢাকায় প্রথম বারের মতো মর্টার ব্যবহার চালালো মুক্তিরা। এসব খবর আমরা পাচ্ছি আর উজ্জীবিত হচ্ছি। আমরা বর্ডারে দেখে এসেছি ভারতীয় বাহিনীর রণসজ্জা। শুধু আদেশের অপেক্ষা। অক্টোবর মাস থেকেই ধাক্কাধাক্কি চলতে থাকে। নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহে শুরু হয় অঘোষিত যুদ্ধ। এই সব যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী অগ্রবর্তী দল। পিছনে মিত্রবাহিনীর জোরালো সমর্থন। পাকিস্তানিরা চিৎকার করতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর সর্বাত্মক আক্রমন শুরু হয়ে গেছে।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় বিকেলে জনসভা শেষ করে, সন্ধ্যায় প্লেনে উঠলেন। সাথে ডি. পি ধর এবং পশ্চিম বাংলার দুইজন রাজনীতিবিদ ও তিনজন মধ্যমানের অফিসার। প্লেনটি লাকনো (লক্ষ্ণৌ) বিমানবন্দরের পৌঁছানোর আগে পাইলট ককপিট থেকে বের হয়ে ডিপি ধরকে ককপিটে ডেকে নিয়ে বললেন, দিল্লী থেকে জরুরি মেসেজ এসেছে। মি. ধর ককপিটে ৩/4 মি. থেকে বের হয়ে মিসেস গান্ধীর সাথে কথা বলে পিছনে নিজের সিটে বসলেন। ধর জানালেন, ইয়াহিয়া খান জম্মু, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিমান ঘাঁটির উপর বিমান আক্রমণ শুরু করেছে। আরো জানালেন, পাকিস্তানি সেনারা ভারতীয় সীমানায় আক্রমণ চালাচ্ছে (Launched ground attacks against Indian

Territory) ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মানেকশ প্রতিশোধমূলক পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে। উত্তর ও মধ্য উত্তর ভারতীয় অধিকাংশ শহরগুলোতে ব্লাক আউট চলছে। মিসেস গান্ধীর বিমান দিল্লিতে না নেমে লাক্‌নৌ বিমান বন্দরে ল্যান্ড করলো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম মিসেস গান্ধীকে রিসিভ করলেন। মিসেস গান্ধী সবাইকে নিয়ে দক্ষিণ ব্লকের সেনা হেড কোয়ার্টারে ঢুকে পড়লেন। মিসেস গান্ধী, জগজীবন রাম, শরণ সিং এবং অন্যান্য ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তারা সরাসরি অপারেশন রুমে ঢুকে পড়লেন। তাদেরকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হল।

সেনা প্রধান জে. মানেকশ প্রধানমন্ত্রী এবং তার ক্যাবিনেট সদস্যদের তাঁর আক্রমণের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করলেন, এবং পূর্ব রণাঙ্গণে আক্রমণের অনুমতি চাইলে, ক্যাবিনেট state war with Pakistan এর অনুমতি দিল। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে ত্বরিৎভাবে দিল্লিতে ডিপ্লোম্যাটিক মিশন খোলার অনুমতি দিয়ে দিল। ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভারতীয় সেনাবাহিনী পুরোদমে পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানে আক্রমণ শুরু করলো। ভারতীয় নৌ, বিমান পুরো আক্রমণ চলে গেল। ৪ ডিসেম্বর, ভারতীয় পার্লামেন্ট বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে দিল। জাতিসংঘে ভেটোর পর ভেটো চলছে। গুজব আছে আমেরিকার ৭ম নৌবহর বঙ্গোপসাগর মুখো ধেয়ে আসছে। ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ডের নির্দেশ, জাতিসংঘে কোন কিছু ঘটার আগেই ঢাকার পতন ঘটাতে হবে। মুক্তিবাহিনীকে দ্বিগুন বেগে কাজে লাগানো হয়েছে। বর্ডারে বর্ডারে পাকসেনাদের ঘাঁটিকে বাইপাস করে ভারতীয় সেনারা পঙ্গপালের মতো চারিদিক থেকে ঢাকার দিকে ধেয়ে আসছে। বিমান আক্রমণ শুরু হয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনী পূর্বপাকিস্তানে যে কয়টি স্যাবর জেট ছিল প্রায় সবই ধ্বংস করে দিয়েছে।

আমরা রাজবাড়ীর উপকূলে পৌঁছে গেলাম। আমাদের হাতিয়ারের সংখ্যা ৩১ কি ৪১। তবে জনবল প্রায় ৬০ এর কাছাকাছি। জনগণ আমাদের ঘিরে ধরলো। তখনও আমরা সবাই একটা গাছতলায় বসে আছি। জনগণকে সরিয়ে দিলাম। বললাম, আমরা পুরো এলাকা রেকি করতে চাই। আমাদের কয়েকজন লোক দিন। ওরা লোক দিল।

রহমতকে বললাম, তুমি এদের সাথে থাকো। আমি আমাদের সেকেন পুলিশ আর মন্টুকে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। সেকেন বললো, বাপু,

রাজবাড়ী শহরে ঢোকার এবং বেরুনোর পথগুলো আগে দেখে নেও। যে পরিমাণ জায়গা আমাদের বেরিকেড দিতে হবে তাও অনুমানে মেপে নিলাম। বিকেলের আগেই গাছতলায় একত্র হলাম। শহরের দক্ষিণের এবং পূর্বের খবর পাচ্ছিনে। লালীদের সাথেও যোগাযোগ হচ্ছে না। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় অবাঙালি এবং মিলিশিয়ারা প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ শুরু করলো। দূরে আগুনের ধোয়াও দেখা দিল। ভাবলাম ওরা কি আমাদের অবস্থান জানতে পেরেছে ? হয়তো, হয়তো বা না। আমাদের সাথে দুইজন পুলিশ এবং একজন বিডিআর আছে। সেকেন পুলিশ ও রহমত পুলিশ। রহমতের আপন ভাই হল বিডিআর নবাব। নবাবকে বললাম, ভাই আপনি সবার সিনিয়ার, বর্ডারে মাঝে মাঝে এরকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন।

আপনি আমাদের কমান্ড করুণ। প্রচণ্ড গোলা বর্ষণে আমাদের অনেকে ভয় পেয়ে গিয়েছে। নবাব ভাই, রহমত, আমি ও সেকেন পুলিশ দূরে গিয়ে পরামর্শে বসলাম। দেখলাম নবাব ভাইয়ের ইচ্ছা রাতে এখান থেকে কেটে পড়া। সব দল আসলে আবার আমরা আসবো। আমি আর সেকেন বললাম, তা হয় না। রহমত আমাদেরও সায় দিল। জনতা কেমন করে যেন অনুমান করেছে আমরা রাতে কেটে পড়তে পারি। ওরা আমাদের ঘিরে ধরলো। বললো, আপনারা চলে গেলে অবাঙালি ও মিলিশিয়ারা আমাদের হত্যা করবে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। তার চাইতে আপনারা আমাদের মেরে যান। আপনাদের দোহাই লাগে আমরা আপনাদের সাথে আছি। যা লাগে তাই দেবো আপনাদের। দরকার হলে আপনাদের সাথে মরবো। আমি, রহমত, আর সেকেন পাবলিকের মধ্যে মাতব্বর গোছের কয়েকজনের সাথে বসলাম। বললাম, জনা তিরিশেক যুবক চাই, মাইক চাই, খাবার চাই। যদি দিতে পারেন তো থাকবো। না হয় চলে যাবো। ওরা সব জোগাড় করে ফেললো। আমি আমাদের সবাইকে বললাম, ধরে নাও, ওরা আমাদের অবস্থান জেনে গেছে। আজ রাতেই আমাদের অবস্থানে যেতে হবে। তা না হলে, ওরা আমাদের ঘিরে ফেলে শেষ করে দেবে। এক এক গর্তে দুটো হাতিয়ার, অতিরিক্ত দুই জন যুবক। মোটকথা এক গর্তে ৪ জন। পদ্মা নদীর অদূর দিয়ে বাধ তৈরি করা হয়েছে। পূর্ব পশ্চিম লম্বা।

আমরা বাধের উত্তরের গর্তে। বাধের দুপাশেই গর্ত। ভাটির গাছে ভরা। দক্ষিণের গর্ত পার হলেই একটু খোলামাঠ তারপর অবাঙালিদের বাড়িঘর।

পুরো উত্তর এলাকা কভার করে বিশ ত্রিশ হাত দূরে দূরে প্রতি গর্তে হাতিয়ারসহ ৪ জন লোক দিয়ে দিলাম। গর্তে আমাদের আনা অতিরিক্ত যুবকরা আছে। আছে স্থানীয় যুবকরাও। এদের আমরা কার্ড করে দিলাম সই করে। পজিশনে বসানোর পর আমি, রহমত, আর সেকেন আবার রেকি করলাম। জনগণ জানালো, খাবার তৈরি হয়ে গেছে। স্থানীয় যুবকরা গর্তে গর্তে রাতের খাবার পৌঁছে দিল। প্রত্যেক গর্তে নির্দেশ দিয়ে দিলাম, তোমাদের সামনে যাকে পাবে তাকে ফেলে দেবে। এক মাথা থেকে আর এক মাথায় টহল দিচ্ছে রহমত, আর সেকেন। নবাব ভাইকে বললাম, আপনি ঘুমান। হাতিয়ারটা আমাদের দেন। ওনাকে ঘুমাতে পাঠালাম।

এ পর্যন্ত একটাও ফায়ার করিনি। সারারাত খাড়া। না, রাতে কোন আক্রমন হল না। পাবলিককে বলে দিলাম, আমাদের ধারের কাছে না আসতে। তাদের মেয়ে ছেলেদের সরিয়ে দিতে। সকাল হলে নাস্তা খেয়ে সিগারেট টানছি। হঠাৎ মনে হল, দিনে আবার রেকি করা দরকার। ইতোমধ্যে রাতেই আমরা একটা প্রাইমারি স্কুলে ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছি। গর্তেই খাওয়া গর্তেই শোয়া। ঘুমানো যাবে না। যেসব যুবক আমরা সাথে এনেছি। তারা অনেকেই অস্ত্র চালনা শিখে ফেলেছিল। প্রকৃতির ডাকে কেউ বের হলে ওরা অস্ত্র ধরতো। দুজন পাবলিককে সাথে করে আমরা দুজন আবার রেকি করতে বেরুলাম। গায়ে চাদর তার নিচে এসএমজি। ঘুরে ঘুরে দেখছি। সব ঠিক আছে। হঠাৎ একজন আমাকে বললো, স্যার আপনাকে এক কুয়া দেখাবো। দেখবেন কত লাশ ওরা জবাই করে ওখানে ফেলেছে !

আমি আর মতিন কুয়ার কাছে গেলাম। খুব গভীর কুয়াটা। কিছু দেখা যায় না। পানির রঙ যে কি বুঝতে পারলাম না। বিকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। মনের মধ্যে প্রতিহিংসা জেগে উঠলো। আমরা আবার গর্তগুলো রেকি করে ফিরে এলাম। সব ঠিক আছে। কোন ফাঁকে আমাকে না বলে মন্টু আর ইন্তাজ বেরিয়ে গেছে নদীর ধারে। হঠাৎ মন্টুর চড়া গলা শুনে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম। ঘটনাটা এরকম 'নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা ধরে আনা যুবকটাকে দেখতে পায়। যুবকটা ওদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের বাড়ি কোথায় ? ওরা মিথ্যে বলে, আমরা মেহমান আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। বাড়ি পাবনার নাজিরগঞ্জে। আপনাদের নাজিরগঞ্জের খবর কি ? মুক্তিবাহিনীর ভয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি। লোকটা বলে এখানেও নাকি মুক্তিবাহিনী এসে গেছে ? ওরা বলে, না,

এখানে এখনও আসেনি। তবে আসবে শুনেছি। লোকে তাই বলাবলি করছে। ওরা জিজ্ঞেস করে আপনার বাড়ি কোথায় ? রাজবাড়ী শহরে। আগে এদিকে বেড়াতে আসতাম। এখন আসিনে। বাঙালিদের সাথে আমাদের আর ভালো সম্পর্ক নেই। আমরা পারলে ওদের মারি, ওরা পারলে আমাদের। নদীর পাড়ের নিচে সিগারেট শুরু করে তিনজন, মতিন লক্ষ্য করে লোকটার কোমরে কি যেন গোঁজা। ও অনুমান করে পিস্তল। ও সাবধান হয়ে যায়। বলে, চলেন আমাদের আত্মীয়ের বাড়িতে।

নদীর পাড়ের উপরে উঠার সময় ও ইন্তাজের পায়ে পাড়া মেরে সতর্ক করে দেয়। উপরে উঠেই মতিন লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোমরের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার জন্য। ওর দেখাদেখি ইন্তাজও ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি। এক পর্যায়ে মতিন ওর পিস্তলটা কেড়ে নেয়। তারপর দুজন ওকে বেঁধে ফেলে গামছা দিয়ে। নিয়ে আসে আমাদের ক্যাম্প প্রাইমারী স্কুলে। স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করতেই বলে ও বিহারি, পাক আর্মি আর মিলিশিয়াদের সাথে সাথে ঘোরে।

আমরা দ্রুতগতিতে ওকে এক অন্ধকার ঘরে আটকিয়ে পাহারা বসালাম। রহমত আর ওমর আলীকে পাঠালাম ইন্ট্রোগেশন করতে। গর্তে গর্তে খবর পাঠালাম সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে। আজ আক্রমন আসবেই। দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই স্থানীয় ৩/৪ জন লোক একজন লোক নিয়ে হাজির। সাথে ওর স্ত্রী দুই বাচ্চা। লোকটা বললো, স্যার আমি অবাঙালি, বাড়িঘর ফেলে পালিয়ে এসেছি। আমি আপনাদের সঙ্গে থেকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই। বলে কি লোকটা !

সাথের লোকগুলো বললো, স্যার এই লোকটা খুব ভালো। ওর জন্য অনেক বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে গেছে। আমাদের সব সময় সাহায্য করেছে। দেখুন না সপরিবারে পালিয়ে এসেছে। রহমত এলে ওর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, আরো খোঁজ নেবো। একজন জানা পাবলিককে বললাম, ওর স্ত্রী ও বাচ্চাদের তোমার হেফাজতে রাখো। ও আমাদের কাছে থাক। যে আসে সবাই ওকে চেনে, ভালো বলে। ওর কাছে রাজবাড়ীর খবর জানতে চাইলে, আজ আপনাদের উপর আক্রমন আসতে পারে। এখনও পূর্ব দিক খোলা। দক্ষিণের পাকা রাস্তার ব্রিজগুলো নষ্ট। বাঁধ পার হলেই মাঠ। মাঠের পরেই ওদের বাঙ্কার। প্রতি বাঙ্কারে ওরা পালা করে পাহারায় থাকে।

এই বাঙ্কারের খবর আমরা জানতাম না। দুপুরের পরেই স্থানীয় লোকদের বললাম, 'আপনারা এখনই মাইকিং করুন। ঘোষণা হবে, কোন লোক রাজবাড়ী শহরে ঢুকবে না কেউ বেরোবে না। ২৪ ঘণ্টা কারফিউ জারি করা হল। বিকেলেই সব জনতা নদীর পাড়ে চলে আসবে। নারীরা আসবে না।' ঠিক সময়েই মাইকিং শুরু হয়ে গেল। প্রচ মাইকিং। এই লোকটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে দিলাম। পাবলিক সিআইডি ওর পিছনে রাখলাম। স্থানীয় নেতাদের বললাম, ওর এবং ওর পরিবারের যেন কোন ক্ষতি না হয়। এই লোকটাকে মন্টুদের ধরে আনা লোকটার কাছে নিয়ে গেলাম। ও দেখেই বের হয়ে বললো, স্যার ও একটা কসাই। ওর কাছে তো পিস্তল থাকে। ওকে ধরলেন কীভাবে? একটা ঠিক লোক ধরেছেন। ও না ফিরলে ওর খোঁজ পড়বে। না পেলে এসব পাড়ায় ওরা ঢুকে পড়বে আপনি এখনই সবাইকে সাবধান করে দিন।

মাগরেবের আজানের পরেই আমরা প্রত্যেক গর্ত থেকে এক সাথে গুলি বর্ষণ শুরু করলাম। আর নদীর পাড়ে জড়ো হওয়া জনতার গগন বিদারি স্লোগান। 'জয় বাংলা' রাজবাড়ীর উত্তর দিক কেঁপে কেঁপে উঠছে। জনতার হাতে লাঠিসোটা, সড়কি আরো কত কী। বললাম, সারারাত চলবে। জনতার সেকি উদ্যম আর উল্লাস। তা বর্ণনার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু আজও স্মৃতিতে ভাসছে। রহমত আর সেকেন পুলিশকে বললাম, কোন বিশ্রাম নেই। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

কোনরকম ঢিলেঢালাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো। বিদ্যুতের মতো রহমত আর সেকেন একমাথা থেকে অন্য মাথায় ছুটছে। পাবলিক নেতাদের বলেছি, রাজবাড়ী শহরে ঢোকার এবং বেরুবার পথ আপনাদের খুবই চেনা। কোন লোক যেন বেরুতে না পারে। আবার ঢুকতেও না পারে। আমাদের গর্তে গর্তে বলে দিলাম, মুক্তিবাহিনীর নামে বিহারিরা অস্ত্র নিয়ে আমাদের পিছনে চলে আসতে পারে। অতএব সাবধান। রহমত, সেকেন আসছে। ওমর, ইন্তাজ ছুটছে। আমরা পাবলিককে এমনভাবে ফিট করেছি, অস্ত্র নিয়ে মুক্তিবাহিনী ঢোকার চেষ্টা করলে আমাদের যেন জানায়।

সকাল হয়ে গেল। মজনু, সাচ্চু, মতিনকে চিঠি লিখলাম। তোমরা আজ বিকেলে না পৌঁছালে আমরা মারা পড়ে যাবো। পথেই আমাদের বাহকদের সাথে ওদের দেখা হয়। ওরা আমার লেখা চেনে। জিল্লুল হাকিমের

দলবলও প্রায় এসে গেছে। আমার উপর সাচ্চুর খুব টান। তার সাথে আমার অন্যরকম সম্পর্ক। সেই লিখে জানালো, আমরা রাতেই পৌঁছে যাবো। রাজবাড়ীর গ্রুপ দক্ষিণ পূর্ব ঘিরে ফেলেছে। এমন একটা খবর কানে এলো।

রাতে আমি, রহমত, সেকেন, ও দলের অন্যান্যদের সাথে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, রাত ১২টার পরে আমরা বাঁধ পার হয়ে দক্ষিণের গর্তে অবস্থান নিবো। সবাই পার হবে ক্রলিং করে। এর আগে আমি আর রহমত আমাদের কাছে ফিরে আসা বিহারি সোবহানকে নিয়ে দক্ষিণের গর্তগুলো চেক করে নিলাম। ঠিক সময়েই আমাদের ছেলেরা গর্ত পার হল। গর্তে গর্তে গিয়ে আমরা বলে দিলাম, আমরা এখন খুব বিপজ্জনক অবস্থায় আছি। রাতে সর্বক্ষণ চোখ খোলা রাখবে সামনে। যাকে সামনে পাবে তাকেই ফেলে দিতে হবে। হাত উঁচু করে এলেও।

আমাদের স্থানীয় যুবক ভোলেন্টিয়াররা জীবন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এদের মূল কাজ পানি আর খাবার গর্তে জোগানো। বিহারি সোবহানের দৃঢ় বিশ্বাস ওরা আজ হামলা করবেই। অতএব সবাই হুশিয়ার, আজ রাতে কেউ আমরা বিশ্রাম নেইনি। হাঁটার পর খাওয়া ও অন্যান্য কাজ শেষ করেছি। গর্তে গর্তে বারবার ঢু মারছি। যারা স্থানীয় তারা সবাই অল্প বয়সী। অমনোযোগী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভুল করার সম্ভাবনা আছে। আমরা কয়েকজন যেরকম সিরিয়াস ওরকম ওরা নাও হতে পারে। এটা ওদের দোষ নয়। বয়সের দোষ।

ভোর হয়ে আসছে। কুয়াশার চাদর নেমে এসেছে। হঠাৎ দেখা গেল, গ্রুপ গ্রুপ করে কিছু লোক খোলা মাঠের দিক থেকে আমাদের গর্তের দিকে ছুটে আসছে। টার্গেটের মধ্যে এলেই আমরা ফায়ার শুরু করলাম। সবগুলো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ওদের পিছনে ছিল আর একটা গ্রুপ বাঙ্কারে। এবার বাঙ্কার থেকে আমাদের দিকে গুলি আসতে শুরু করলো। আমাদের হাতিয়ার গুলোকে জবাব দিতে না করে দিলাম। গুলি অপচয় করা ঠিক হবে না। সকাল হতেই হাজার হাজার মানুষ স্লোগান দিচ্ছে। আর মাইকিং করছে। তোমরা ঘেরাও হয়ে গেছো। জানে বাঁচতে চাইলে অস্ত্র ছেড়ে দাও।

এই ছিল মাইকের ঘোষণা। ওরা সব শুনতে পাচ্ছে। সাথে সাথে হতোদ্যম হচ্ছে, আর হতাশা ওদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে। ঘোষণায় যে কাজ হয়েছে

তা পরে জেনেছি। এটা ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। বড় একটা গ্রুপ অস্ত্র ফেলে রাতের আঁধারে ঢাকামুখী কেটে পড়ে।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। এখন গর্তে খানা যাচ্ছে ডাব, চিড়া মুড়ি, গুড় আর পানি। অন্যান্য গ্রুপ এসে গেছে। আমাদের মজনুর গ্রুপ খাওয়া দাওয়া করে রেডি হয়ে গেছে। এবার ওরা গর্তে গেল। আমাদের চোখে আনন্দ। ক্লান্তির কোন ছাপ নেই। একেই বলে দেশ পাগল মুক্তিযোদ্ধা। পরাধীনতার আঁধার ছিন্ন করতে বুকের রক্ত ঢেলে দিতেও প্রস্তুত। এরা গোসল সেরেই খাবার খেয়ে ঘুমে চলে গেল। এখন শুরু হয়েছে পালাক্রমে গর্ত বদল। লোকের অভাব নেই। হাতিয়ারের অভাব। অবাঙালিরা থেমে থেমে বাঙ্কার থেকে গুলি বর্ষণ করছে। আমরা এর জবাব দিচ্ছি না। মাথার উপর দিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে ঢাকার দিকে উড়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। আমাদের সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

সোবহান বিহারিকে নিয়ে বাঙ্কারগুলোর অবস্থান ভালো করে দেখে নিলাম আমরা। ৪/৫ টা সাইকেল দিয়ে পাংশা আমাদের লোক পাঠালাম গ্রেনেড আনতে। বিকেলের আগেই গ্রেনেড এসে গেল। আমরা আবার বসলাম একসাথে। গ্রেনেড বাহিনীও ঠিক করে ফেললাম। এক গ্রুপের হাতে থাকবে গ্রেনেড ও ছোট হাতিয়ার আর এক গ্রুপের হাতে শুধু অস্ত্র। আমরা সব বাঙ্কার একসাথে আক্রমন করবো না। প্রথম যেটা আমরা সুবিধাজনক স্থানে পাবো সেটাকেই প্রথম আক্রমন চালাবো। এবার সোবহান বিহারিকে কাজে লাগালাম। তোমাকে সবার আগে থাকতে হবে। মুখ বেঁধে। ওকে ক্রলিং করা শিখিয়েও দিলাম। সোবহান একদম পশ্চিমের বাঙ্কারটা বেছে নেওয়ার কথা বললো। গ্রেনেডে আমরা ভারতীয় ট্রেনডরাই অংশ নেবো। অন্য গ্রুপের ছেলেরাও থাকবে। অতো নাম আজ আর মনে নেই। বাইরের মনে আছে উদয়পুরের খলিল আর জিলানীর নাম। আমার গ্রুপের বাদশা, হারুন, ওমর আলী, মন্টু, মাজেদ। অন্যদের বয়স কাঁচা বলে বিরত রেখেছি। অস্ত্র হাতে আমি, সেকেন, রহমত আরো যেন কে কে ? প্রথম বিপদ, ওরা টের পেলে আমরা মারা পড়বো। কালো কাপড়ে মাথা বেঁধে মোরগ ডাকা ভোরে squad অগ্রসর হলো। কারটা যে পড়লো আর কারটা যে পড়লো না বাঙ্কারে সে মুহূর্তে ঠাহর করতে পারলাম না। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বাঙ্কার উড়ে গেল। আবার চার্জ আবার বিস্ফোরণ। আমরা অস্ত্রধারীরা বাঙ্কারে ঢুকে এসএমজি দিয়ে ব্রাশ করলাম। এবং বাঙ্কারে ঢুকে

পড়লাম। অন্ধকার বাঙ্কার। ধূয়ায় ছেয়ে গেছে।

এবার গ্রেনেড গ্রুপ অনতিদূরে ২য় বাঙ্কারে গ্রেনেড চার্জ করলো। কিছু অস্ত্রধারী ঐ বাঙ্কারেও ঢুকে পড়লো। উভয় বাঙ্কারেই অস্ত্রধারী অবাঙালিরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। কারো হাত নাই, মাথা নেই, পা নেই। এমনি করেই আমরা বেলা ১২টার আগেই সকল বাঙ্কার নিয়ে নিলাম। পরের বাঙ্কারগুলোয় অবস্থানরত অবাঙালিরা গ্রেনেডের শব্দ শুনে ছেড়ে দিয়েছে। এখন গ্রুপ ওয়ারি আমরা বাঙ্কারে অবস্থান নিচ্ছি। জনগণের সহায়তায় লাশগুলোকে পদ্মায় ছেড়ে দেওয়া হল।

এই ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১। সকাল ১১.১৫ মিনিটে ভারতীয় মিগ গভর্নমেন্ট হাউস আক্রমণ করে প্রধান হলের ভারি ছাদ উড়িয়ে দেয়। গভর্নর তাঁর মন্ত্রীসভা এবং পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক কর্মচারিরা এই দিনেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়ে আশ্রয় নেন। এই হোটেলটিকে আন্তর্জাতিক রেডক্রস নিরপেক্ষ জোনে পরিণত করেছিল। ১৪ ডিসেম্বর ছিল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শেষ দিন। বাংলাদেশের জন্ম আসন্ন হয়ে পড়েছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিও আসন্ন আত্মসমর্পনের সংবাদ ১৪ ডিসেম্বর সকাল থেকেই প্রচার করতে থাকে। এই প্রচার ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানের অবাঙালিদের আতঙ্কগ্রস্থ করে তোলে, তাদের অধিকাংশই বাড়িঘর ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছুটতে শুরু করে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে নিজেদের ভাগ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করার জন্য। পথে পথে তারা মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং জীবন লীলা সাঙ্গ হয়। এই প্রভাব আমাদের রাজবাড়ীতেও পড়েছিল।

রাতে আমরা কোন অপারেশন চালালাম না। খুব সতর্ক থাকলাম। ১৫ ডিসেম্বর সকল মুক্তিরা অবাঙালিদের পথে পথে তল্লাশি শুরু করলো। মেয়েদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা হল। পুরুষদের ভিন্ন ব্যবস্থা করা হল। খোলামাঠে এদের জড়ো করে পাহারা নিয়োগ করা হল। আমি রহমতের সাথে পরামর্শ করে মেয়েদের পাহারার ব্যবস্থা কঠোর করলাম। যাতে তাদের কেউ ধর্ষণ করতে না পারে। অবাঙালি যুবকদের বেছে বেছে গভীর রাতে সরিয়ে নেওয়া হল নদীর ধারে। রাতের বেলায় আমি আর রহমত মেয়েদের পাহারাটা চেক করে দেখি। আমাদের আক্রমণের গতি কমে গেছে। ধড়পাকর শুরু হয়েছে। বাঙ্কারে বাঙ্কারে বাংলাদেশের পতাকা

উড়িয়ে দিয়েছে নানা দলের মুক্তিবাহিনীরা। সব মুক্তিরা যে যা পারছে হাতের কাছে তা নিয়ে এসে স্কুলে জমা করছে। আর যেগুলো দামি, সেগুলো গোপনে রাখছে।

স্কুলে আমার ডানপাশে বানাত আলী ম ল, বামপাশে আনোয়ার। এরা আমার অনুমতি নিয়ে বাইরে যায়, আর আসে। বারবার যায় বারবার আসে। আমি ভাবলাম, পরাজিতদের সম্পদ গনিমতের মাল, এটা মুক্তিদের জন্য বৈধ। কিন্তু নারী ভোগ বৈধ নয়, বিয়ে না করা পর্যন্ত। এটা হতে দেওয়া যাবে না। আমি বের হইনে। বের হলেও একখানে গাদা করা বিহারীদের দেখতে যাই। এমন সময় খবর পেলাম আমাদের মতিন গ্রুপের ৮ জন শহীদ হয়েছে। ভুলের কারণে এ ঘটনা বিহারিরা ঘটাতে পেরেছে। ৭/৮ জন অবাঙালি অস্ত্রধারী ওদের পজিশনে থেকে হাত উঁচু করে বলে, আমরা মুক্তিবাহিনী। আমরা আমাদের দলের কাছে যাওয়ার জন্য এই পথ দিয়ে যাবো। এই মুক্তিরা ওদের বিশ্বাস করে। পিছনে যেতে দেয়। পিছনে গিয়েই ওরা ব্রাশ করে। ফলে ঐ গর্তের সবাই শহীদ হয়। আমি চমকে উঠলাম। মতিনের ছেলেরা এই ভুল করলো ? আমি আর রহমত জানতাম, ওরা যদি একবার আমাদের পিছনে যেতে পারে, তাহলে আমাদের খুটে খুটে মারবে। আর একটা খারাপ খবর কানে এলো আমার প্রিয় বন্ধু আরশেদ এর মাথায় গুলি লেগেছে। আমি বা আমরা যে স্থান ত্যাগ করে দেখতে যাবো, তাও পারছিনে। নিজেদের মধ্যেও গোলাগুলি হতে পারে।

কারণ সবাই সবাইকে চেনে না। আমি আমার ছেলেদের বললাম, সাবধান ! সীমার বাইরে যাবে না। যুদ্ধের অব্যবহিত পরের সময়টা মারাত্মক। কেউ কাউকে মেরে দিলেও কিছু বলা যাবে না। তাছাড়া জানা গেছে অবাঙালি মেয়েরা এখনও অস্ত্র হাতে ঘরের মধ্যে বসে আল্লাহকে ডাকছে। মারবো না হয় নিজে মরবো পণ করে আছে। আমি আর রহমত সবাইকে ডেকে বললাম, ভিতরে ঢোকা যাবে না আপাতত: আরশেদের কথা, মতিন গ্রুপের ছেলেদের শহীদ হওয়ার কথা ওদের জানালাম। রাতে কোথাও বেরুলাম না। কারও বের হতে দিলাম না। স্থানীয় পাবলিকদের দিয়ে পাহারা বসালাম। শুধু অবাঙালি মেয়েদের পাহারা ঠিক রাখলাম। ভোরে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে পায়চারি করছি। ভাবলাম একটু শুয়ে রেস্ট নিই। রেস্ট নেওয়া হল না। আরশেদের কথা, কে কে শহীদ হল তাদের খবর জানার জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠলো। ওরা কোথায় আছে ? ওদের নিয়ে কী করা

হচ্ছে জানার জন্য উঠে বসে পড়লাম। একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছি আর ভাবছি। আমার পাশেই একটা ঢাউস মার্কা রেডিও পড়েছিল।

ভাবলাম দেখি কোন খবর পাওয়া যায় কী না। নব ঘুরাতেই ঢাকা বেতারে ঘোষণা এলো। পাকবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পন করছে। খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়। একলাফে খাড়া। ঘরের বাইরে যে যেখানে ছিল, সবাই চিৎকার করে উঠলো। জয় বাংলা, জয় বাংলা সারা আকাশে বাতাসে ঐ একই ধ্বনি। কেমন করে কী ঘটলো তা আমরা তখনও জানতে পারিনি। আর এই মুহূর্তে তা জানার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করলাম না। ঢাকা বেতার থেকে বারবার ঘোষণা আসছে স্বাধীন বাংলাদেশের। কী যে আনন্দ ! এক সাগর রক্ত দিয়ে কেনা এ আনন্দ। এবার জানালার কাছে দাঁড়ালাম। দিগন্তের পানে চেয়ে কী যে ভাবছি তা নিজেই জানি না। একি সত্যি ? এবার মাঠঘাট, গাছপালা উত্তরে বয়ে যাওয়া পদ্মার দিকে তাকালাম। ওদের ভাষা বোঝার চেষ্টা করলাম। সবাই কোলাকুলি করছে, অনেকেই আনন্দে কাঁদছে। কেউ খোদার দরবারে হাত তুলে মোনাজাত ধরেছে। আমি নিজেও যেন কেমন অবশ হয়ে গেলাম। হাতিয়ারটা নিয়ে কাঁধে ফেলে আনোকে আর স্থানীয় একটা ছেলেকে বললাম, চলো। ঘুরায়ে ঘুরায়ে সব আমাকে দেখাবে। সারা বাংলায় মুক্তির খবর জানাজানি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে খবর।

স্থানীয় যুবকটা ঘুরে আমাদের দেখাচ্ছে মৃত্যু কূপগুলো। যেখানে আর্মি আর অবাঙালি বাঙালি ধরে ধরে মেরে কূপে ফেলে রাখতো। কূপের দিকে তাকানো যায় না। মুখে গামছা বেঁধে তাকাতে হয়। না হলে বিকট দুর্গন্ধ তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। দেখালো বধ্যভূমি। যেখানে হত্যা করে ফেলে রাখতো বা পুঁতে রাখতো। শিয়াল শকুনে লাশ নিয়ে দিনে রাতে মাতামাতি করতো। আর দেখলো রেললাইনে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত বগিগুলো যেখানে নারীদের ধর্ষণ করে মেরে ফেলতো।

চোখ মেলে আমরা দেখছি আর কানে শুনছি ঐ ছেলের কথাগুলো। আমাদের সাথী মুক্তিযোদ্ধা খুশীকে ওরা ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। টগবগে যুবক মাথায় ঝাকড়া চুল। অসম্ভব সাহসী, ৬ ফুটের উপরে লম্বা। কোথায় ওর লাশটা ? এসব দেখে সারা শরীরে আগুন ধরে গেল। নিজেকে ঠিক রাখা কষ্ট হয়ে গেল। মেয়েদের জড়ো করা জায়গায় চলে এলাম। আমাদের

ঝন্টুর সাথে দেখা। ও দেখালো, ওর বুকে লাগা ছররা গুলির দাগ। একটা মেয়ে ওকে গুলি চালিয়েছে। ও নিয়ে গেল আমাদের ঐ মেয়েটার কাছে। দেখি চোখমুখ ঢেকে ছোট্ট কোরাণ শরিফ পড়ছে।

আমি কাছে গিয়েই ওর মুখের ঘোমটাটা একটানে ফেলে দিলাম। বন্ধ করো তোমার কোরাণ পড়া। চমকে উঠে মেয়েটা আমার পানে তাকালো। অপূর্ব রূপসী। মাথাভরা চুল, বিরাট খোপা করা বাঁধা। যুদ্ধের কয়দিনের ধকলে ধকলে রূপের করুণ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। যা দেখার মতো। তুমি গুলি চালিয়েছিলে ? চুপ। আবার প্রশ্ন করি। না কোন কথা বলে না। বললাম, সন্ধ্যার পরে আমরা আসবো। এর মধ্যে যতো পার তোমার ধর্মকর্ম করে নাও। তখন তোমার সাথে বোঝাপড়া হবে। আমার চোখে মুখে জিঘাংসা উতলে উঠছে, ফিরে যাচ্ছি। হঠাৎ মেয়েটা আমাকে ডাকলো, কি নাম বললো ? আজ আর মনে নেই। বললো, আমি কলেজের ছাত্রী। আমরা অবাঙালিদের সাথে থাকতে থাকতে বাঙালি বিদ্বেষী হয়ে গেছি। আমাদের মেয়েদের তো করার কিছু নেই। আমাদের যা যা বলা হয়েছে তাই আমরা করেছি। আপনারা আমাদের শত্রু। আপনাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য গুলি চালানো আমাদের কর্তব্য। আপনার কাছে অনুরোধ– হয় আমাকে মেরে ফেলুন, না হয় আমাকে বিয়ে করুন। আমাকে ধর্ষণ করবেন না। আপনার আল্লাহর দোহাই। যেকোন একটা করুন। আমার কাছে আমার বাবা-মার যে সোনাদানা টাকা পয়সা আছে তা অনেক। আমি সেগুলো সব আপনাকে দিয়ে দেবো। ভাবলাম, বেঁচে থাকার এটা একটা ফাঁদ। মাথায় কোন ভালো চিন্তা আসছে না। বললাম, ভেবে দেখি। ধর্ষণের শিকার তুমি হবে না। আমরা মুক্তিরা নারীদেরকে ইজ্জত করি। বাকি দুটো প্রস্তাব মাথায় থাকলো। চল, ঝন্টুকে বললাম। টুকাইগিরি বাদ দিয়ে ক্যাম্পে রেস্ট নে।

১৬ ডিসেম্বরের বিদায়ী সূর্য আমাদের গ্রামগুলোর উপর দিয়ে অস্ত যাওয়ার উপক্রম হলো। শীতল রোদের প্রলেপ আরো শীতল হতে চলেছে। আজকের দিনটা অর্ধেক পরাধীন অর্ধেক স্বাধীন। অনেকটা অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। এই পরিসমাপ্তির মধ্যে উল্লাসের পাশাপাশি একটা সুপ্ত যন্ত্রণাবোধের উপস্থিতি টের পেলাম নিজের মধ্যে। এতদিন যে রক্তপাত ও জীবনহানী দেখে শঙ্কিত হয়েছি, আজ সেই নৃশংসতা বন্ধ হয়ে জয়ের খবর শুনেও কম মর্মাহত হলাম না। সবার মধ্যে

একটা হকচকিয়ে যাবার ভাব লক্ষ্য করা গেল। মনে হল, আকস্মিক এই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা কোন মুক্তিযোদ্ধাই যুদ্ধ বিজয়ের পরিতৃপ্তির সাথে মেনে নিতে পারছে না। তখনো বাতাসে পচা লাশের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিকেলের নির্মেঘ দূরের আকাশে বিক্ষিপ্তভাবে উড়ছে মাংসভূক শকুনেরা। অগণিত মানুষের মৃতদেহ কূয়ার মধ্যে, বধ্যভূমিতে যা দেখে এলাম এই মাত্র। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের শক্ত আঙুলে ট্রিগারে চেপে শত্রু হননের উন্মাদনায় তখনো কাতর। এই হঠাৎ পরিস্থিতিতে আমাদের আত্মস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো। লক্ষ্য করলাম প্রায় সব মুক্তিযোদ্ধাই নির্জীব-নির্বিকার। কারো মুখে তেমন কোন কথা নেই। সুস্পষ্ট কোন জিজ্ঞাসাও নেই। যুদ্ধের এই দীর্ঘপথ অতিক্রম শেষে বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আজ মুক্তিযোদ্ধারা যেনো বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল। হঠাৎ করেই আমাদের প্রয়োজন হারিয়ে গেছে মনে হল।

বিকেলেই ঘোষণা এলো মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র বিরতির। এই ঘোষণা পাবার পর আমিও নির্জীব হয়ে পড়লাম। যুদ্ধময় গত জীবনের আকস্মিক ফলাফল আমাকে হতবাক করে দিল। মনে হল এরকম পরিসমাপ্তি তো আমি চাইনি। যুদ্ধ চালাতে গিয়ে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার পরিবার ভিটে ছাড়া হয়েছে, পাকিস্তানিদের হাতে বলি হয়েছে, স্বজন সম্পদ হারিয়েছে, পরবাসে দুঃসহ উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়েছে। যে মুক্তিযোদ্ধা রণাঙ্গণ থেকে তার বোন বা স্ত্রীর লাঞ্ছিত হবার কিংবা পিতা বা ভাইয়ের নিহত হবার খবর শুনেছে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেই মুক্তিযোদ্ধা এই প্রশ্ন নিয়ে কোন বন্দি পাকিস্তানির মুখোমুখি হবার সুযোগটি পেল না।

তখনও ভারতীয় বাহিনী রাজবাড়ীতে ঢুকেনি। জেনেভা কনভেনশনের আইনে পাকসেনারা নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু অবাঙালিরা ? চুক্তিতে কী কী বিষয় আছে, আমরা তা জানি না। যাহোক, ভারতীয় বাহিনী এসে পড়ার আগেই অবাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। বাংলার মাটিতে এরা থাকলে ভবিষ্যতেও ঝামেলা করবে। ওদের আদিবাস ভারতে থাকতে পারেনি। বাংলাতেও পারলো না।

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১। স্বাধীন দেশের প্রথম সকাল। শীতের কুয়াশা মোটামুটি। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করলো না। হঠাৎ মনে হল, আজকের সূর্যোদয় দেখবো। গাছপালা, তরুলতা, আকাশ বাতাস, নদী মানুষও

দেখবো। দেখবো দুই দিন আগের মানুষ আর আজকের মানুষের পার্থক্যটা, যা দেখবো মনের পর্দায় লিখে রাখবো। আনো উঠ। একটানে ওর গায়ের কম্বল ফেলে দিলাম। চল ঘুরে আসি। ও বললো, মাস্টার ভাই, হাতিয়ার নেবো ? নে ছোটটা। তোর চাদরের তলে ফেলে দে। ক্যাম্প পার হয়েই কিছুদূরে পথের ধারে একটা আমগাছ, ওকে বললাম, তুই দাঁড়া। বলেই আমি আমগাছের মগডালে উঠে গেলাম। একডালে বসে চারদিক তাকালাম। চারিদিকের ঠা া বাতাস বুকের মধ্যে ভরলাম আর ছাড়লাম। স্বাধীন দেশের প্রথম দিনের বাতাস, কী যে ভালো লাগলো। গাছ থেকে নেমে নদীর ধারে এলাম। নির্জন নদী। নির্জন তীর। বহমান পানিতে আজলা ভরে পানি তুলে প্রাণভরে হাতমুখ ধুলাম।

পারে উঠেই শিশিরে ভেজা সরষে ফুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে স্পর্শ নিলাম। কোথাও গাছপালা নড়ছে না। ঘন বাঁশঝাড় নুইয়ে ভূতলে চুমু খাচ্ছে। একটা পাখির ডাকও শুনা গেল না। পথের ধারের গাছটাতে কয়েকটা থাপ্পড় মেরে বললাম, কী রে তোরা জাগবি না ? তোরা তো বহু কিছুর স্বাক্ষী। এই নয় মাসে তোরা বহুকিছু দেখেছিস। শোনা আমাদের সেসব। মনে হল গাছটা সাড়া দিল। গাছের উর্দ্ধপানে তাকিয়ে থাকলাম। প্রতিদিন কাইয়োফলা গাছের ডাল দিয়ে দাঁত ব্রাশ করি। আজ আর করলাম না। বড় মায়া হল। সূর্যের আলো ফুটে উঠেছে। জামা খুলে স্বাধীন দেশের প্রথম সূর্যের আলো সারা গায়ে পড়তে দিলাম। নয় মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান হয়েছে। বাংলার মানুষ এবার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করবে। পথে প্রান্তরে পর্বতারোহনে,নদ-নদী, খালে বিলে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে বাঙালি আবার নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারবে। ছায়ার মত অনুসারী মৃত্যুর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবে না। রাতের অন্ধকারে প্রতিটি অচেনা শব্দ মৃত্যুর অশুভ পদধ্বনি হয়ে আসবে না। তাই চারদিকে আনন্দ আর উল্লাসের ঢেউ। মহিলারা নিশ্চিন্তে বেরুতে পারলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে চলছে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে, হাত মেলাতে।

সুখি মানুষের আনন্দ কোলাহলের সেএক অভূতপূর্ব সমাবেশ। অনেকে গাইছে, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা, সোনা নয় তত খাঁটি, বল যত খাঁটি তারচেয়ে খাঁটি আমার বাংলাদেশের মাটি।' মাইকে বাজছিল 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।' একজন নারী আনন্দের আতিশয্যে বাধভাঙা

চোখের জল সামলাতে শাড়ীর আঁচল কামড়ে রেখেছে দৃঢ়ভাবে।

আমরা যুদ্ধ করে অনেককে বাঁচাতে পেরেছি। আবার অনেককে পারিনি। পাকিস্তানিদের হাতে নির্মমভাবে নিহত অসংখ্য মানুষের ত্যাগ, আর গভীর জীবন বেদনা ছিল এই মহান অর্জনে। শ্রদ্ধায় নত হয়ে অনুচ্চস্বরে বললাম, 'আমরা তোমাদের ভুলবো না।' দূরে মাইকে বাজছে, 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না।'

স্কুলের মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম আমরা কী বিজয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত। না শোকের বেদনায় আপ্লুত ? নাকি বিজয় আর বেদনার অপূর্ব সংমিশ্রণ ? সকল শহীদদের কথা মনে পড়লো। পাকিস্তানি আর অবাঙালি মিলে এদের হত্যা করেছিল গ্রামেগঞ্জে, মাঠেঘাটে, নগরে বন্দরে, অনেককেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল আরো নিষ্ঠুরভাবে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার জন্য। এই মানুষগুলো আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। পাকিস্তানিরা যখন এদের বেঁধে নিয়ে যেতো হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেই মুহূর্তে এইসব অসহায় মানুষগুলো কি ভাবতো কে জানে ? এইসব মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করতো। রাস্তায় টেনে নিয়ে যেতো জীপের পিছনে, বেয়োনেট আর রাইফেলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতো। তখন মৃত্যুপথযাত্রী সেইসব মানুষ কি ভাবতো আমরা কোনদিন তা জানতে পারবো না। আমার মনে হচ্ছে যুদ্ধের এই শেষটা যেন হিসেবে মিলছে না। যুদ্ধ যেন ঠিক মতো শেষ হলো না। একজন দুর্দান্ত অগ্রগামী সৈনিককে কেউ যেন পিছন থেকে সহসা থামিয়ে দিলো হল্‌ট বলে।

একটি দেশের স্বাধীনতার জন্য এই নয় মাস কোনক্রমেই যথেষ্ট সময় নয়। স্বাধীনতার আস্বাদনের যাত্রাপথ কতো কঠিন তা উপলব্ধির জন্য এ যুদ্ধের মেয়াদ আরো দীর্ঘায়িত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

আবার ভাবি, প্রয়োজন ছিল না। যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হতো, স্বাধীনতার বিরোধীরা বিশেষ করে আমেরিকা যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়তো। একজন ভারতীয় রাজনীতিকের ভাষায়, 'সারা জীবনের সুযোগ' হাতে পেয়ে নয়াদিল্লী যে দুর্বল আর বিচ্ছিন্ন এক পাকিস্তানের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে যেকোন ঝুঁকি নেবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই কারো। বেশিরভাগ ভারতীয় মনে করেন, এছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। নয়াদিল্লীর কর্মকর্তারা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে আরো এক বছর শরণার্থীদের পোষার চেয়ে

সর্বাত্মক যুদ্ধে নামার খরচ ঢের কম হবে। ঐ হিসাব অনুযায়ী আগামি মার্চ নাগাদ শরণার্থীদের পিছনে ব্যয় দাঁড়াবে ৯০ কোটি মার্কিন ডলার, যা পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৬৫ সালে যুদ্ধের খরচের ১৩ গুণেরও বেশি।

বর্তমান সংকট চলতে থাকলে ভারতীয় বাজেটের উপর উদ্বাস্তুদের চাপ অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। ভারতীয়রা যে বিষয়টিকে বেশি ভয় পাচ্ছে, তা হলো প্যালেস্টাইন ধরনের একটি সংকটের আশঙ্কা। সেটা হলে ভারতকে একাধারে অসংখ্য শরণার্থী এবং পূর্ব বাংলার বৈরি পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে এক অব্যাহত ও ব্যয়বহুল সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হবে। একজন ভারতীয় কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা যুদ্ধের ঝুঁকিটা মেনে নিয়েছি। কারণ আমরা মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে দেওয়াটা ভারতের জন্য যুদ্ধের ঝুঁকির চেয়ে বেশি মারাত্মক।'

আরো অনেক কারণ আছে। ঠিক অংকের মতো যুদ্ধটা শুরু করা হয়েছে। আবার তা অংকের মতো মিলিয়েই শেষ করা হল। জাতিসংঘ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী শেষ কাজটি করে ফেললো। ভারতের প্রধান অস্ত্র যোগানদাতা সোভিয়েত ইউনিয়ন বারবার তাগাদা দিচ্ছিলো যুদ্ধ শেষ করে আনতে। তারা আর কতবার ভেটো দেবে? আমরা যারা মুক্তিবাহিনীর টুকরো দল, শুধু আমাদের মতামতটাই বলতে পারি। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে এ মতামতের কোন মূল্য নেই। শুধু ভাবছি, যারা চলে গেছে, তাদের কাছে এখবর কেমন করে পৌঁছাবো ?

১৮ ডিসেম্বর বিকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা গ্রুপ রাজবাড়ীতে ঢুকে পড়লো। ততক্ষণে আমরা আমাদের করণীয় কাজগুলো শেষ করে ফেলেছি। ওরা ঘুরে ঘুরে বাঙ্কার দেখলো। বধ্যভূমি দেখলো। লাশে ঠাসা কূয়াগুলো দেখলো। অবাঙালি মেয়েদের যেখানে জড়ো করে রাখা হয়েছে, সেখানে এসে এদের নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত করলো।

১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, পাংশা চলে যাবো। দুপুরে খেয়েদেয়ে পাংশা রওনা হয়ে রাতে ক্যাম্পে উঠলাম। কয়েকদিন পর জানা গেল রাজবাড়ীতে আমাদের হাতিয়ার নিয়ে চলে যেতে হবে। সেখানে অস্ত্র জমা দিতে হবে। হাতিয়ারটা জমা দেওয়ার সময় বড় কষ্ট লাগলো। আমার ৫/৬ মাসের নিত্যসঙ্গি, আমাকে নির্ভীক ও দুঃসাহসী করে রেখেছিল। স্বাধীনতা বিরোধীদের উপর গর্জে উঠতে একটুও দ্বিধা করে নাই। তাকে

ছাড়তে চোখে জল এসে গেল। চোখের জলেই তাকে জমা দিয়ে রাজবাড়ী ছাড়লাম। আজও ওটার কথা আমার মনে পড়ে। কার হাতে আমার প্রাণপ্রিয় এসএমজি ব্যবহার হচ্ছে তা আল্লাহ জানেন !

আত্মসমর্পনের দলিলে স্বাক্ষর করছেন পাকিস্তানের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি (ডানে); তাকে লক্ষ্য করছেন জগজিৎ সিং অরোরা (বামে)।

মুক্তিযোদ্ধা কবির/ সুহৃদ কবির

কবির আমার হৃদয়ের অনেকখানি দখল করে আছে। আমৃত্যু থাকবেও। ওর সাথে আমার পরিচয় চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে। বৃহত্তর ফরিদপুরের সকল থানার মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্যাম্পে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম। এ এক বড় মিলন মেলা। চেনা-জানার মেলা। সবার লক্ষ্য এক, দেশ স্বাধীন করবো। কে মরবে কে বাঁচবে তার হিসেব মনেও আসছে না। ওর সাথে প্রথম দেখা-দেখি তারপর কথা বলা। তাসের আড্ডা, পিটি প্যারেড বনে বাদাড়ে কাঠ জোগাড় করা, নানান ঘটনা আমাদেরকে কাছে টেনে আনে। চাকুলিয়ায় আমাদের বিরাট ছনের ঘরটা উত্তর-দক্ষিণ লম্বা। আমাদের বিছানা পুবের সারিতে। ওদেরটা পশ্চিমের। আমি লক্ষ্য করেছি ওদের থানার সাথীদের সাথে থাকলেও মিশতো আমাদের সাথে বেশি। আমি আবার ওদের সবার সাথে মিশতাম বলে, ঐ দলে আমার একটা ভালো অবস্থান ছিলো। আমার ধুমপানের অভ্যাস থাকায় এই জাতের যোদ্ধারাই আমার বেশি কাছের ছিল। ক্যাপ্টেন থেকে পাওয়া দামি সিগারেট ওদের মধ্যে মাঝেমধ্যে ছড়াতাম। কী যে খুশি ওরা! কবির ধূমপান করতো না। আমি বয়সে বড় থাকায় বড়ত্বের পাওনাটা ফাইফরমাশ খাটিয়ে আদায় করে নিতাম। মাঝে মাঝে সে আমার জন্য খাবারও লুকিয়ে রেখে অসময়ে বের করে দিতো। এমনিভাবেই সে আমার গভীর আস্থায় আসে। ও ছিল শ্যাম বর্ণ মাথায় ঘন কালো চুল। ৫.৫ ইঞ্চি মতো লম্বা। মুখটা সদা হাস্যময়। আমরা মুক্তিযোদ্ধা, পারিবারিক পরিচয় দেওয়ার সুযোগ কোথায়?

এখানে আমরা সবাই সমান। আমার মনে আছে ওর একবার পায়ে ২/৩টা ফোড়া উঠলো। ব্যথায় জর্জরিত; গায়ে বেশ জ্বর। বিকেলে ভারতীয় সেনা ক্যাম্পের ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ নিয়ে দিলাম। আমি সাথে ছিলাম। ওস্তাদদের বলে পিটিসহ সব ট্রেনিং ওর জন্য আপাতত স্থগিত করা হল। ক্যাপ্টেন এর সাথে আমার ভালো সম্পর্ক থাকায় ওস্তাদরাও আমার কথা শুনতেন। একমাত্র আমিই ক্যাপ্টেন এর তাবুতে যাতায়াত করতাম। আনন্দেই আমাদের চাকুলিয়ায় ট্রেনিং শেষ হল। প্রায় ১ মাস পর বর্ডারে চলে এলাম। একসাথে ভিতরে ঢুকলাম। আমার মনে আছে চৌগাছা থেকে একটু দূরে কালা নামক স্থানে অবস্থান কালে আমার এস.এম.জি'র একটা গুলি ভর্তি ম্যাগাজিন হারিয়ে যায়। কবিরকে ঘটনাটা বললাম। ও বললো,

চিন্তা করবেন না দেখি কোথায় গেছে ম্যাগাজিনটা। শেষ রাতে দেখি কবির আমাকে ধাক্কাচ্ছে। কী রে ! এতো রাতে কী ? ওর ঝোলা থেকে একটা ম্যাগজিন বের করে আমাকে দিলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ও কোন কথা না বলেই চলে গেল। আমি জানি ওর হাতিয়ার এস.এল. আর। অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে যখন মাগুরা পৌঁছালাম, তখনই আমাদের পথ ভিন্ন হয়ে গেল। ওরা মধুমতি পাড় দিয়ে ওদের এলাকায়, আমরা আরো হেঁটে লাঙ্গলবাধ এসে গড়াই পাড় দিয়ে পাংশায় ঢুকবো।

সবাইকে বুকে জড়িয়ে বিদায় দিলাম। মনে আছে ওর কপোলে একটা চুমা দিয়ে বললাম, ফি আমানিল্লাহ। এর আগেই আমরা আমাদের ঠিকানা লেনদেন করেছি। পথের সাথীদের পথেই ছেড়ে দিয়ে আমরা আমাদের পথ ধরলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ায় প্রথম সপ্তাহের মধ্যে একটা চিঠি পেলাম। দাদা বেঁছে আছি। আপনাদের খবর জানতে ইচ্ছে করছে। ওকে চিঠি লিখে দিলাম। আমি আসবো। পথের খবরটা লিখে জানা। পরবর্তী সপ্তাহেই চিঠিতে ও আমাকে পথের খবর দিলো। দুই একদিন পরে আমি আর বন্ধু সৈয়দ আলী রওনা হলাম। পাংশা থেকে ট্রেনে রাজবাড়ী ওখান থেকে ভাঙ্গা বাসে ফরিদপুর। সেখান থেকে আবার বাসে বরই তলা।

বরইতলা যখন নামলাম তখন বেলা ডুবে ডুবে। প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পরে নিলাম। কোন রাস্তা নাই। যাও ছিল তাও পানির নীচে। প্রায় রাস্তায় কোমর পানি। '৭১ এর বন্যায় রাস্তাঘাট সব ধুয়ে নিয়ে গেছে। সন্ধ্যা বাদ উঠলাম বাটিকামারী বাজারে। বাজারে ওদের একটা দোকান ছিল। জিজ্ঞেস করতেই দোকান পেয়ে গেলাম, সেই সাথে কবিরকেও। দেখে লাফ দিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো। এরপর গেলাম ওদের বাড়িতে। গোসল করে কাপড় বদলিয়ে বিছানায় গিয়ে বসলাম। কিছু খাবার দিলে খেয়ে নিলাম। রাতে ভাত খাওয়ার পর পরই ঘুমে চলে গেলাম। সারা শরীরে ব্যথা আর জার্নির ক্লান্তি।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা খাওয়ার সময় সবার সাথে পরিচয় হলো। ওর বাবা মাকে সালাম করলাম। বিকেলে বাটকেমারী হাইস্কুল মাঠে বসলাম। অনেক চাকুলিয়ার মুক্তিযোদ্ধার সাথে দেখা হল। আবার অনেককে পেলাম না। তার পরদিন নৌকা নিয়ে বেরুলাম। সারা মাঠ ভরা আমন ধান; কৈ জাল পেতে রাখা হয়েছে। কৈ মাছ ধরার জন্য এলাকাটা

আমাদেরই বিল এলাকার মতো। জ্যোৎস্নারাত প্রকৃতি বেশ হালকা মেজাজে। আমরা নৌকায় বসে। কবির কোত্থেকে বাঁশি বের করে ফুঁ দেওয়া শুরু করলো। ও গান জানে জানতাম, বাঁশি পারে জানতাম না। চাকুলিয়ায় আমরা সন্ধ্যাবাদ হরিতকি গাছে হেলান দিয়ে বসলে ও গান শুরু করতো। 'হলুদিয়া পাখি সোনারই বরণ; পাখিটি ছাড়িল কে ?' অনেক বার ওর গলায় বিভূইতে বসে মন যখন বাড়ির জন্য আকুলিবিকুলি করতো এ গান তখন প্রাণ ভরে শুনেছি। ও একটার পর একটা বাঁশিতে সুর তুলছে, আমরা তন্ময় হয়ে বসে আছি। দক্ষিণের হালকা হাওয়া সুরের লহরি আমন ধানের মাথার উপর দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

শেষ হলে বললাম, তুই তো ভালো বাজাস রে লেগে থাক, কাজ দেবে। চার দিনের মাথায় আমরা বাড়ি রওনা হলাম। ও বরইতলী পর্যন্ত এসে আমাদের বাসে তুলে দিল। ওকে আমার বাড়ি আসার পথের বর্ণনা বলে দিয়েছিলাম। একটা জিনিস বুঝেছিলাম ওদের সংসারের অবস্থা সবলও নয় আবার খুব দুর্বলও নয়। ভাইরা ওকে আর পড়াতে চায় না। বড় সংসারে যা হয়। বিশেষ করে গ্রামে। মাঝে মাঝে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ ছাড়া দেখা সাক্ষাৎ নাই। ১৯৭৬ এর শেষে মনে হয় চিঠি এলো। দাদা, আমি পুলিশে চাকরি নিয়ে চট্টগ্রাম আছি। বেরিয়ে যান। আমিও ১৯৭৭ এ ঢাকায় বি.এড করতে গিয়ে বি.এড শেষ হওয়ার পরপরই বাংলাদেশ বন বিভাগে চাকুরির নিয়োগপত্র হাতে পেলাম। যোগদান চিটাগাং এ।

চাকরিতে যাবো কী যাবো না করতে করতে হালকা গাট্টি নিয়ে রওনা হলাম। আমাদের মাজেদ খাঁ তখন চিটাগাং টেক্সটাইল মিলে চাকরি করে। উঠলাম ওর ওখানে। পরদিন অফিস আওয়ারে গেলাম ফরেস্ট কলেজে। যোগদান করলাম চাকরিতে। এই কলেজে এক বছর প্রি সার্ভিস ট্রেনিং করতে হবে। ট্রেনিং শেষে পোস্টিং। আমার রুমমেট মনসুর আলী। বিএফআইডিসি থেকে এসেছে বাড়ি কুমিল্লায়। সকালে পিটি, ১০ টায় ক্লাস, টানা ২ টা পর্যন্ত। আমাদের ক্লাস ৪ টায় শেষ। বিকালে মাঠে ফুটবল খেলা। প্রথম এক সপ্তাহ পালাই পালাই করে গেল। পালানো হল না। মনছুর আমাকে নানান কায়দায় টেনে রাখতে লাগলো। হঠাৎ এক ছুটির দিন কাউকে কিছু না বলে দাম পাড়া পুলিশ লাইনে চলে গেলাম। পাহাড়ে উঠার পথ তৈরি কেবল শুরু হয়েছে। বাড়িঘর দালানকোঠা, অফিস ব্যারাক কিছু তৈরি হয়েছে। আরও হচ্ছে। স্কুলের দিকে যাচ্ছি। এখন দেখি

আমারই বয়সী এক ভদ্রলোক নীচে নামছে। বললাম, ভাই একজনকে খুঁজছি। নাম মো. কবিরুল ইসলাম। বাড়ি ফরিদপুর। আমার নামও বললাম। বললো, উপরে আসেন। নিয়ে তার রুমে বসালো। বললো, আমি আর কবির এই রুমেই থাকতাম। ও পোস্টিং নিয়ে থানায় গেছে। আপনার কথা ওরা মুখে আমি বহু শুনেছি। চা বিস্কুট খাওয়ানোর পর বললো, চলুন আপনাকে ওর কাছে নিয়ে যাই। আমরা রিকশা নিয়ে কোতোয়ালী থানায় এলাম। থানার ভিতরে পূব পাশে দোচালা টিনের ঘরের একটা রুমে ও থাকে। উনি বললেন, এই ওর রুম। কিন্তু তালা দেওয়া। এই ভদ্রলোকের নাম নুরুল ইসলাম। আমাকে বাইরে দাঁড়াতে বলে উনি থানার ভিতরে গেলেন। কবিরের সাথে করে বের হয়ে এলেন।

আমাকে দেখে তো অবাক! কোন ব্যাগ নাই আমার হাতে। প্যান্ট আর শার্ট পরা। রুম খুলে আমাদের বসালো। নুরুল ইসলামকে বললো, নুরু ভাই। একটু বসেন আমি আসছি। আমার মনে হল থানায় ওর বসকে বলতে গেল, আমার মেহমান এসেছে। তাই ছুটি দরকার। ওর রুমটা ভালো করে দেখে নিলাম। খাটটা ডাবল, একটা টেবিল, ২টা চেয়ার। রশিতে সব কাপড় রাখার ব্যবস্থা। কোতয়ালী থানার পাশে নানা রকম হোটেল আর দোকান পাট। খুব ব্যস্ত এলাকা। আমাদের নিয়ে হোটেলে এসে খাবারের অর্ডার দিল। আমরা তিনজনই খেয়ে নিলাম। ওখান থেকে নুরুল ইসলাম আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আমরা ওর রুমে এলাম। আমি ওর খাটে পা তুলে সিগারেট টানছি আর ওর হরেক রকম প্রশ্নের কোনটার জবাব দিচ্ছি, কোনটা এড়িয়ে যাচ্ছি। একটা জিনিস খেয়াল করলাম, পুলিশে এসেও ও সিগারেট ধরেনি। বারবার জিজ্ঞাসা করছে ব্যাগ কোথায়? না অন্য কোন বাসায় রেখে আমার কাছে এসেছেন? বললাম, পরে শুনিস একটু আরাম করতে দে। দুপুরের খাওয়াও হোটেল থেকে খেয়ে এলাম। আজ আমি আর কোন প্রশ্ন করলাম না। সন্ধ্যা নামার আগেই বললাম, এবার উঠবো রে। যাবেন কোথায়? ব্যাগট্যাগ থাক, এখান থেকে যাওয়া যাবে না। শেষে বললাম, আমার ঠিকানা ষোল শহর, ফরেস্ট কলেজ। ওখানে কার কাছে? বললাম, আমার নিজের কাছে। উঠে পড়লাম, বাসে করে চলে এলাম। পরদিন বিকেলে কবির এসে হাজির। আমরা তখন খেলা থেকে ফিরছি। ওকে দেখেই ডাক দিয়ে কাছে এনে রুমে নিয়ে এলাম। মনছুরকে বললাম, আমার ছোট ভাই পুলিশে আছে।

আমাদের ধারের কাছে হোটেল নেই। অনতি দূরে এক বার্মিজের মরা এক চা এর দোকান আছে। ও বললো, দাদা আমি থাকবো। মনছুর ডাইনিং এ বাচ্চুকে বলে এলো রাতে একজন মেহমান আছে। ঐ মরা দোকানেই চা খেলাম। পাশের রুমের কলিগদের সাথে ও পরিচয় করে নিল। পুলিশে এসে বেশ চৌকস হয়েছে দেখলাম।

আমার বিছানার অবস্থা দেখে ওতো হতবাক! ওকে আমার বেড দিয়ে মনছুরের সাথে আমি ডাবলিং করলাম। কিছুক্ষণ পরে কবির আর মনছুর উঠে আমাদের রুমের সামনে দুবলোর চত্বরে গিয়ে বসলো। আমি গেলাম না। ঘুমিয়ে গেলাম। আমি জানি আলাপ যাই হোক, কবিরের পেট থেকে কথা বেরুবে না। কিন্তু মনছুর আমাদের সপ্তাখানেকের পরিচয়ে যা জেনেছে সব বলে দেবে। ও খোলা মনের মানুষ। এক সপ্তাহেই আমাকে আপন করে নিয়েছে। আমি ঘুমিয়ে গেছি। কখন যে মনছুর এসে ঘুমিয়েছে টেরও পায়নি। ফজরের আজান পড়তেই আমরা নামাজের জন্য উঠে গেলাম। নামাজ শেষে আমাদের পিটিতে যেতে হবে।

কথা বলার সময় নেই। কবির কাপড় পরেই মনছুরকে বললো, মনছুর ভাই, সন্ধ্যায় আমি আসবো। আমার মিল দিবেন। আমি বললাম, তুই আজ আবার কি জন্য আসবি ? তোর অফিস নাই? বললো, আমরা গেরিলা তো। আমাদের গলায় ছুরি দিলে রক্ত বেরুবে। কথা বেরুবে না। আর আপনার রক্তও না কথাও না। মনছুর ভাই আসি বলেই হাঁটা দিল। সারাদিন ব্যস্ততার সাথেই কাটলো। বিকেলে আজ আর খেললাম না। মাঠের ধারে আমরা দুজন বসে থাকলাম। মনছুর বললো, পরশু তোকে সারাদিন না দেখে ভাবলাম, তুই পালিয়েছিস। তুই যে চলে যাওয়ার পাঁয়তারায় আছিস তা কবিরকে বলেছি। সন্ধ্যায় কবির এলো ট্যাক্সি করে।

ট্যাক্সি বোঝাই তোষক, বালিশ, কোল-বালিশ, বিছানার চাদর, ইত্যাদি। বিরাট ঝুড়ি ভর্তি বাজারের সবরকম ফল-ফলাদি। ট্যাক্সিওয়ালা ওগুলো আমাদের রুমে নিয়ে এলো। আমাকে কিছু না বলেই সব বেডিং খুলে আমার খাটে পেতে দিল। বললো, 'দাদা, আমি গোসল করে আসি। ফলগুলো আপনাদের সকল কলিগদের বিলিয়ে দেন। আর কিছু রাখেন।'

ওর আনা নতুন বেড সিট নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। আমার কলিগদের মধ্যে যারা আমার রুমে এলো, মনছুর সবাইকে ফলগুলো দিল। আর

কবিরের পরিচয় দিতে লাগলো। প্রায় আধা ঘণ্টা পর কবির গোসল করে রুমে এলো। আস্তে আস্তে সবার সাথে পরিচয় হলো। রাতে খাওয়ার পর আমরা তিনজন রুমে বসে এটা সেটা আলাপ করছি। এবার কবির মূল কথায় এলো। দাদা নাকি পালাই পালাই করছেন? আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসছি। ও মতলব ছাড়েন, আমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আসবো রাত থাকবো। সকালে গিয়ে ডিউটি করবো। প্রতি শুক্রবার আপনারা দুজন আমার মেহমান। সকালে বেরুবেন, রাতে ফিরবেন।

আজও আমি কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। ও যে আবেগে চলছে আমি তার সাথে তাল রাখতে পারছিনে। মনছুরের কাছ থেকে আমার চাকরির চেহারা চরিত্র আয় ব্যায়ের হিসেব শুনে ও আকাশে উড়ছে। ওর ধারণা এই সোনার খনি ফেলে কেউ পালায়? ও প্রতি সন্ধ্যায় আসা শুরু করলো। খালি হাতে আসে না। যা আনে আমাদের সবার দিলেও ফুরায় না। শুক্রবার এলেই মনছুরের ঠেলায় কোতয়ালী যেতে হয়। কবিরও সেই অপেক্ষায় থাকে। খাওয়া দাওয়া হোটেলে, আড্ডা ওর রুমে। সব খরচ ওর। দেখতে দেখতে একমাস পার হলো। ক্লাস আমার ভালো লাগতো না, ভালো লাগতো সকালের পিটি আর বিকেলের ফুটবল। এর মধ্যে আমাদের ট্যুর এসে গেল। প্রথম দিকে আমরা দিনে দিনেই ফিরে আসতাম।

চিটাগাং শহরের বাইরে কোন এক ট্যুরে বন দেখা, বাগান দেখা, পাহাড় দেখা, নার্সারি দেখা। এগুলো আমাকে আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলতে লাগলো। কোন কোন ক্লাস ভালো লাগতো, কোনটা আবার লাগতো না। শিক্ষক কুদ্দুস সাহেব, বই রেখে তার জীবনের বই থেকে গল্প শোনাতেন। এই স্যারের পড়ানো মনে ধরলো। কবির আসে যায় আমরাও যাই। একদিন বেডের নীচে দেখি ১০ টা একশ টাকার নোট। আমার মনে হল, কবির সকালে যেভাবে যায়, ভুলে রেখে গেছে। আবার এলে নিয়ে যাবে। ও আসে যায়, কিন্তু টাকা নড়ে না। আমিও কিছু বলিনে। ও সপ্তাহ খানেক টাকার নড়চড় না দেখে বলেই ফেললো, 'দাদা টাকা খরচ করেননি কেন? কিছু না বলে, তীক্ষ্ণ চোখে ওর চোখের দিকে তাকালাম। এভাবে তাকানো দেখে ও থমকে গেল। আর কিছু বললো না। আমার জামা-কাপড় সবই সাধারণ মানের। তবে এর একটা স্নিগ্ধতা আছে। ও যেটা কিনে আনে তাতে আমি বাধা দেইনে, চুপ করেই থাকি। ও জানে আমাদের মাঝে মাঝে বেডিং পত্রসহ ট্যুরে যেতে হয়। এর জন্য যা যা লাগে সব কিনে আনলো।

২/৩ মাস চলে গেল। আমার আর পালানো হলো না। কিছু টাকা হাতে এলো। আমি একদিন তিন হাজার টাকা ওর বিছানার তলে রেখে এলাম। হিসেব করে দেখলাম, এ পর্যন্ত আমার জন্য ও যা ব্যয় করেছে তা শোধ না হলেও কাছাকাছি যাবে। দিন তিনেক পরেই ও টের পেয়ে গেল, এ আমার কাজ। সেদিন আমাদের রাতের খাবার শেষে ট্যাক্সি করে রুমে এলো। হাতে কিছু না কিছু আছেই। কাপড় চোপড় খুলে হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় জুত হয়ে বসে বললো, এই টাকাগুলো আপনি রেখে এসেছিলেন! আমি চুপ। তোষক তুলে দেখে সেই এক হাজার পড়েই আছে। একটুও নড়চড় হয়নি। আমি ভাবলাম, এসবের একটা ফয়সালা দরকার। মনছুর রুমে নেই। অন্যরুমে আড্ডা মারছে। বললাম, কবির আসল বন্ধুত্ব আর টাকা একসাথে থাকতে পারে না। আমার আগেরটা দরকার, পরেরটা নয়। আমি গরীব মানুষ, গরীব দেশের মানুষ। বাহুল্য ব্যয় আমি অপছন্দ করি। তুই আমাকে দাদা বলে ডাকিস সেই '৭১ সাল থেকে। তুই কি চাস এটা নষ্ট হয়ে থাক ? আমি চাইনে। এভাবে টাকার আদান প্রদান আমাদের মধ্যে বিষবৃক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। না পারবি তুই সইতে না আমি। আমার তিন হাজার আর তোষকের মধ্যে এক হাজার মোট চার হাজার। তোর কাছে রাখ। আর যদি আমার কথা অমান্য করিস, ঐ টাকা গুলো অন্য কোথাও যাবে। এখানে তোর আসা বন্ধ হবে। আমি না থাকলে তুই আসবি কার কাছে? একথা বলেই সিগারেট ধরায়ে অন্য রুমে আড্ডায় চলে গেলাম। যাওয়ার আগে বললাম, তুই তো সেই '৭১ থেকে আমাকে জানিস। তোর মেজর যোশীর কথা মনে আছে ? ঘুমো, আমার দেরি হবে। অন্যরুমে গিয়ে মনছুরকে বললাম, কবির তোকে ডাকে। কবিরের কথা বলতেই ও চলে এলো। আমি তাসে বসে গেলাম। অনেক রাতে রুমে ফিরে দেখি ওরা দুজনেই ঘুমে কেউ মশারি দেয়নি। আমি চুপচাপ ওদের মশারি দিয়ে কবিরের পাশে আস্তে করে শুয়ে পড়লাম। আমাদের তো সকালে উঠতেই হয়। পিটি আছে, কবিরের অফিস আছে। সবাই রেডি। কবির দাদা 'আসি বলে চলে গেল। আজ আর কিছু বললো না, আমিও না। আমার কাছ থেকে ও আজ একটু এড়ানো এড়ানো ভাব পেলো। ভাবলাম, পাক। বিকেলে খেলার মাঠে মনছুর বললো, হ্যারে কবিরের মনটা ভার ভার দেখলাম। ব্যাপার কি? তুইও কেমন যেন চুপুচুপু করছিস। বললাম, কই না তো? বোধহয় অফিসের তাড়া আছে। বুঝিস তো পুলিশের চাকরি ?

ধমকে-ধামকে চলে। যেমন দেয় তেমন খায়ও। রাতে বিছানা বালিশ তল্লাশি করে দেখি-টাকা নাই। ভাবলাম নিয়েই গেছে। ও ৪/৫ দিন এলো না। আমরাও এক সপ্তাহের জন্য বাইরে চলে গেলাম।

আমরা যেখানে যাই হাড়ি পাতিল, বাবুর্চি আমাদের সাথে যায়। প্রায় ১১/১২ দিন আমাদের যোগাযোগ নেই। ট্যুর থেকে ফিরে এলাম। ও তিন দিন পর এসে হাজির। আবার সেই সবার জন্য খাবার-দাবার। আজ ওকে হাসি মুখেই কাছে টানলাম। মনছুরকে বললাম, তুই বাচ্চুকে বলে আয় আজ আমরা খাবো না। মিল যেন না দেয়। আমরা বাইরে খাবো। এই কয়দিনে কবিরের অনেক টাকা বেঁচে গেছে। আমরা কাপড় চোপড় পড়ে ৮ টায় বেরিয়ে পড়লাম। কবিরকে বললাম, ভালো হোটেলে যাস। ওরাই হোটেল ঠিক করে ট্যাক্সিকে যেতে বললো, চিটাগাং ওদের দুজনেরই চেনা। রুমে ফিরতে ফিরতে রাত ১২.৩০ টা। সকালে কবির চলে গেল।

আমি আর মনছুর হিসেব করে দেখলাম, সরকারী ভাতাসহ আমাদের মাসিক খরচ ৭০০-৮০০ টাকা লাগে। বেশি খরচ করলেও ১০০০ টাকা। এখানে খরচ করার জায়গা নেই। শুধু বিকেলের নাস্তা চা ঐ মরা দোকানেই মেলে। আমি জানি, আমার টাকার অভাব থাকলেও টাকা আসার সোর্সের অভাব নেই। আমরা জানতাম এখানে আমাদের এক বছর ট্রেনিং নিয়ে ডিপ্লোমা করতে হবে। তারপর চাকরিতে যোগদান।

এ ব্যাপারে আমরা সবাই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা ডিপ্লোমা নিবো না। আমরা ফরেস্টিতে গ্রাজুয়েশন চাই। কারণ আমরা সবাই সায়েন্স গ্রাজুয়েট ও মাস্টার্স। আমরা আন্দোলন করে সফল হয়ে শেষে চিটাগাং ভার্সিটি থেকে ফরেস্ট্রিতে গ্রাজুয়েশন নিলাম। ফলে আমাদের সোয়া দুই বছর কলেজে পড়তে হলো। ভাবলাম, এই অতিরিক্ত সময় আমাকে সম্মানিত করলেও অর্থনৈতিকভাবে ভোগাবে আমাকে, আমার পরিবারকে। মনছুর জানে আমার টাকায় টান পড়ে না। তাছাড়া ব্যাকিং কবির তো আছেই। ওর তখনও সংসার হয় নাই। শুধু ছোট বোনকে কিছু টাকা দেয়। ভাগ্নেদের দেয় মাঝে মাঝে লেখাপড়ার জন্য। কবির আসে যায়, আমরাও। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি অথবা ভালো ফাংশন। আমার সাথে যাওয়াতে মনছুর আর বাদ পড়ে না। ও মাঝে মাঝে কুমিল্লা যায়। আমার ডাকে, আমি যাইনে। একদিন কবির এসে দেখে মনছুর নাই। আমার সহপাঠীরা

ওকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। সবাই ছোট ভাই বলে ডাকে, ওদের রুমেও ও মাঝে মাঝে ঢু মারে। খাওয়ার পরে দরজা খোলা রেখে, দুবিছানায় আমরা কাত হয়ে শুয়ে এটা সেটা আলাপ করছি। ও মাঝে মাঝে মুক্তিযুদ্ধের সাথী মতিন, ইন্তাজ, ওমর আলীসহ নানানজনের কথা জিজ্ঞাসা করে। আমরা কোথায়, কোথায় অপারেশন করেছি। তাও বলেছি। মনে পড়ে, ওদের কথা জিজ্ঞেস করলে বলেছিল, কোন এক ব্রিজ ভাঙতে গিয়ে ওদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেকে পালাতে পারলেও হাতিয়ার পানিতে ফেলে পালাতে হয়। শুধু ওদের ৪/৫ জনেরটা ছিল। বলিস কী রে ! বললো, জানে বাঁচলাম। কিন্তু হাতিয়ার বাঁচাতে পারলাম না। আজও অনেকে ইনজুরিতে ভুগছে। হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে বসলো। বললো, দাদা একটা বিষয়ে আপনার সাথে আমার পরিষ্কার হওয়া দরকার। যদি অনুমতি দেন তো বলি ? বললাম, বল্। আপনি তো জানেন টাকার সমস্যার জন্য উপরে লেখাপড়া করতে পারিনি। ভাইয়েরাও পড়াতে চায়নি। দোকানদারি করতাম। হঠাৎ এই চাকরি হয়ে গেল। থানায় পোস্টিং নিয়ে আমার হাতে মাসে ১০/১৫ হাজার টাকা আসে। ছোট ভাইয়ের পড়াশুনা বাবদ যা লাগে তাই দিচ্ছি। যাতে ওরা আমার মতো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। দোকানটার শ্রী বৃদ্ধি করেছি। সংসারেও টাকা দিচ্ছি। আমার বড় ভাইরা যেভাবে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তা আমি ভুলিনি। ভুলিনি ভাবীদেরও আচার ব্যবহারের কথা। মোদ্দা কথা বেকারদের যা হয়, তাই-ই হয়েছিল আমারও। ওদের আমি বিশ্বাস করিনে। দিলে খুশি না দিলে ঘুষি এই ওদের স্বভাব। বললো, আপনি আমার টাকা ফেরত দেওয়াতে কষ্ট পেলেও অবাক হইনি। আমার টাকা কালো বলেই কি আপনি ফেরত দিচ্ছেন ? আমি চাই আপনার ট্রেনিং চলা পর্যন্ত খরচটা আমি চালাই। এটা হবে আমার বিনিয়োগ। শর্তবিহীন বিনিয়োগ। বড়জোর পঁচিশ হাজার ব্যয় হবে দুই বছরে। তাও আবার একবারে নয়। আমি বললাম, তুই চেয়ার নিয়ে আমার কাছে এসে বস। একটা ভালো কথা তুলেছিস। এ নিয়ে আমিও খুব অস্বস্তিতে আছি। ট্রেনিং পিরিয়ডে আমাকে খরচ চালানোর প্রস্তাবের জন্য তোকে ধন্যবাদ। তোর বিনিয়োগ আমি নেবো আমার চাহিদা মতো। তার একটি পরিষ্কার লিখিত ডকুমেন্ট থাকতে হবে। স্টাম্প না হলেও চলবে। একটা রেজিস্টার হলেই হবে। তুই রাজি? হ্যাঁ, রাজি। বস, বাথরুম থেকে আসছি। তোকে একটা জিনিস দেখাবো।

রাত ১২টার কাছাকাছি। বাথরুম শেষে রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে টেবিলের উপর রাখা পাউরুটি নিয়ে খেতে লাগলাম। খাওয়া শেষে সিগারেট ধরালাম। এবার ব্যাগ খুলে ভিতরে রাখা একটা ছোট ব্যাগ থেকে একটা বাদামি রঙের খাম বের করলাম। খামের মুখ খুলে বললাম, ভিতরে যা আছে বের কর। কবির ভেতর থেকে ৩০ হাজার টাকার একটা চেক সোনালি ব্যাংকের আর একটা ছোট চিঠি বের করলো। চেক বাম হাতে রেখে ডান হাতে চিঠি নিয়ে পড়তে লাগলো।

পূজনীয় দাদা,

"আমার সালাম নিবেন। খবরাখবর না পেয়ে কাকীমার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি। অন্য কিছুর উপর নির্ভর না করে আমাদের দুলালকে পাঠালাম। সোনালী ব্যাংকে একটা হিসাব খুলে চেক জমা দেবেন। কাকীমা বললো, যাওয়ার সময় প্রায় কিছুই নিয়ে যান নাই। বলে গেছেন চাকরি ভালো না লাগলে চলে আসবেন। কিন্তু ২/৩ মাসে তো একটা কিছু হওয়ার কথা। স্বচক্ষে দেখার জন্য মা দুলালকে পাঠালো। বারবার বলছি, যত্নে থাকবেন"।

ইতি
আপনার স্নেহের সীমা।
রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বি. দ্র. টাকাটা আপনার কাছে বিনিয়োগ করলাম। বেশি পাওয়ার আশায়।

মনে হয় ৩/৪ বার পড়লো। কী বলবে ও কিছুই বুঝতে পারছে না। বললাম, দেখলি তো এখানেও বিনিয়োগ। এতো বিনিয়োগের ঠেলা কেমনে সামলাবো বল ? চিঠিটা খামের ভিতরে ভর। চেকটা আর একটা খামে ভরে তোর ব্যাগে রাখ। আগামীকাল চেকটা Acknowledgment Registry করে পাঠিয়ে দিবি। চিঠিটা আমার ব্যাগে রেখে দে। আজ আর কোন কথা নয়। তুই কোন কিছু আর জিজ্ঞেস করিসনে। যা ঘুমো। এ ব্যাপারে ঠোঁট যেন ফাঁক না হয়। ও কি করবে বুঝতে পারলো না। লাইট অফ করে ধমকের সুরে ঘুমোতে যেতে বলতেই চুপ করে কথা মেনে শুয়ে পড়লো।

৩/৪ দিন আর কবিরের খোঁজ নেই। বৃহস্পতিবার রাতে এসে হাজির। বললো, খেয়েই এসেছি। কবির এলে আমার সহপাঠিরা খুশি হয়। সবার

রুমে রুমে মনছুরকে দিয়ে যা আনে পাঠিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে পিয়ন দারোয়ান, বাবুর্চি ওর হাত হয়ে গেছে। ওরা ভালো বকশিস পায়। জানে আমার ভাই। তার উপর পুলিশ। বিপদে আপদে কাজে লাগতেও পারে। শুক্রবার ছুটি। সবাই আজ রাতে জেগে আড্ডা মারবে। আমরাও আড্ডায় মেতে উঠলাম। রাতে কিছুই জিজ্ঞেস করার সময় হলো না। ভোরে ফজর আদায় করে আবার ঘুমুতে গেলাম। একটা ব্যাপারে আমরা তিনজন এক। নামাজ আমরা আদায় করি। কবির আজ নড়েচড়ে না। বললাম, তোর অফিস নাই রে। বেলা হয়ে গেল? কাত ফিরে বললো, যাবো না। ছুটি নিয়েছি। দাদা একটু ঘুমোই। ঘুমো বলেই, আমি উঠে পড়লাম। মনছুরও উঠে পড়লো। আমাদের সকালে ঘুমানোর অভ্যাস নাই। শুক্রবার কাপড় চোপড় ধোয়ার দিন। বাথরুমের অভাব নেই। কাপড় চোপড় ধুয়ে গোসল সেরে রুমে আসতে আমাদের সকাল ৮ টা বেজে গেল। এবার কবির উঠে দেখে আমাদের কাজ শেষ। বললাম, তাড়াতাড়ি কর। খিদে পেয়েছে। কবিরও আধা ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নিল। আমরা লুঙ্গি পরেই মেইন রাস্তার পাশে বাইরের রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। আজ বিল দিল মনছুর। মনছুর বললো, তোরা এগো, আমি আসছি। এইবার ফাঁকা পেয়েই জিজ্ঞেস করলাম, কাজটা করেছিস? না, দাদা পারলাম না, দুই দিন গিয়ে ফিরে এসেছি।

যে কাজ আপনি নিজে পারেন না, সেকাজ আমার দিয়ে করাতে চান। ফেরত দিবেন তো! দুলালের কাছে দিলেই পারতেন। আপনার সাহস হয় নাই। জানি দিদি ভাববেন আপনিই ফেরত পাঠিয়েছেন। কিন্তু বিধাতা! তার খাতায় তো আমার নামও উঠবে। এটা একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই তখন আমার নামটাও উঠবে। তখন দিদি বলবেন, কুলাঙ্গার কবিরের কুবুদ্ধিতে চেক ফেরত দেবার কুমতি হয়েছিল। তাছাড়া দিদি কত আঘাত পাবেন! আপনি ফেরত দেওয়ার বুদ্ধি ছাড়েন। গটগট করে এতগুলো কথা ও বলে গেল। মনছুর এলেই আমরা একসাথে রুমে এলাম। ঠিক করলাম, দুপুরে এখানেই খাবো, রাতে বাইরে। বাচ্চু এসেই কবিরকে জিজ্ঞাসা করলো, স্যার আছেন তো? ও মাথা নাড়লো, আজ আর কথা তোলা বা বলার সুযোগ নেই। মনছুর, দুলাল আসার খবর জানে। জানে, মা ওকে পাঠিয়েছেন। দুলালের কথা উঠতেই বললাম, দাঁড়া, দাঁড়া। ওর ব্যাগটা খোলাই হয়নি। খুলে দেখি, চিড়ে, মুড়ি, মুড়কি, নাড়ু, শুকনো মিষ্টি,

খেজুরের পাটালি। ওরা বের করে খাওয়া শুরু করলো।

জুম্মার নামাজ শেষে দুপুরের খাওয়া খেয়ে রুমে এসে শুয়ে পড়লাম। আজ ছুটির দিনে যাদের ধারে কাছে আত্মীয় আছে তাদের বাসায় যায়। মনছুরও যায় মাঝে মাঝে ওর বোনের বাসায়। আমাকেও নেয়। মনছুরকে বললাম, উঠ। শুবো না। আজ বিচে যাবো। ওটা আমার দেখা হয়নি। কবির লাফ দিয়ে বললো, ঠিক কথা। দাদার মাথার আইডিয়াটা এলো কি করে? আমরা বিকাল ৩টায় বেরিয়ে পড়লাম। বাসে না, ট্যাক্সিতে। প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো তীরে আসতে। এই আমার প্রথম সমুদ্র দেখা। সমুদ্রের বর্ণনা দেবো, সে ক্ষমতা আমার নেই। সেদিন সূর্যাস্ত দেখলাম। কী অপূর্ব ! মেঘশূন্য আকাশ। কূলে আছড়ে পড়ছে বিকট গর্জনে, বিশাল বিশাল ঢেউ। সাগর যেন ফুঁসছে। তিনজনই খুব উপভোগ করলাম। পাড়ে বসে কত কী যে দেখলাম। সাগরের ঝিনুকে যে কত কী হয় তাও দেখলাম আজ। কবির বললো, দাদা নেবো কিছু? বললাম, আমাদের ব্যবহারে আসে এমন কিছু দেখ। পছন্দ না হওয়ায় কিছুই নেওয়া হল না। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম, নিউ মার্কেটের কাছে। ও বললো চলেন আমার রুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আবার বেরুই। ট্যাক্সি ঘুরিয়ে থানায় ওর রুমে এলাম। দেখি রুম খোলা। একটা ছেলে আর একজন কবিরের বয়সী লোক বসে আছে। ছেলেটাকে দেখিয়ে কবির বললো, আমার ছোট ভাই দিলু। উনি আমার বন্ধু বন বিভাগে চাকরি করেন। আমাদের এলাকায়ই বাড়ি, মাঝে মাঝে আসে। ঘরের পাশে টিউবওয়েল থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলাম। কবিরের বন্ধুটা আমাদের জিজ্ঞাসা করলো, স্যার, আপনারা কবে বেরুচ্ছেন? বললাম, ভালোয় ভালোয় হলে আরো একবছর লাগবে। কবির হাতমুখ ধুয়ে থানার ভিতরে গেল। আধাঘণ্টা পর ফিরে এসে ওর ভাই দিলুকে টাকা দিয়ে বললো, তোরা খেয়ে নিস। আমি সকালে আসবো। আমরা উঠে পড়েই হেঁটে হেঁটে ভালো একটা রেস্টুরেন্টের সামনে এলাম। ধীরেসুস্থে খেয়ে দেয়ে আবার কলেজ হোস্টেলে ট্যাক্সি করে রওনা হলাম। ছবি দেখার সময় পার হওয়াতে, হলে ঢোকা হলো না। রুমে এসে আবার ফ্রেশ হয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে বিছানায় বসলাম। দিলু কোন ক্লাসে পড়ে রে ? নাইন। খেয়াল রাখিস আর কোন কথা হলো না। সবাই রুমে চলে গেলাম। সকালে কবির চলে গেল। আমরাও আমাদের কাজে চলে গেলাম। ৩/৪ দিন আর কবিরের খবর নেই। সাপ্তাহিক ছুটির আগের রাতে

এসে হাজির। দিলুকে বিদায় করে এলাম। হাতমুখ ধুয়ে এসে বাচ্চুকে বললো, আমার মিল দিস। জি, স্যার বলে বাচ্চু চলে গেল। আমি বুঝতে পারি আমি একটু রুমের বাইরে গেলেই তোষকের তলা, ব্যাগ ইত্যাদি গোপন জায়গাগুলো ও হাতায়। কী খোঁজে তাও জানি। দেখে আমার টাকা পয়সা কী পরিমাণ আছে। আর খোঁজে সীমার কোন চিঠি এসেছে কী না ? আগেরটা যাই হোক, পরেরটা আসল। আমিও সীমার ব্যাপারে একদম চুপচাপ। এক ফাঁকে বললো, দাদা ওটা ফেরত পাঠাতে পারি, এক শর্তে। কী শর্তে রে? আপনি একটা চিঠি লিখে দেন। এতো কম টাকায় বিনিয়োগ হবে না। তাই ফেরত পাঠালাম। বলেই হাসতে লাগলো। তুই তো পাজির নচ্চার রে! তোর পাঠানোর দরকার নেই। ওটা রেখে দে। কী করা যায় পরে ভেবে দেখা যাবে।

আগামী সপ্তাহে আমরা আবার ট্যুরে যাবো। একদিন আগে কবির এলো, আগেই বলেছি ও আসার সময় সবার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে। সবাই ওকে ভালোবাসে। মাসের শেষে স্পেশাল আয়োজনে সবাই ওকে দাওয়াত করে। ওর হাতে একটা খাতা। বললো, দাদা এতে তারিখ দিয়ে লেখেন। কবির থেকে লোন করা টাকা। আমি লিখলাম ৩০০ টাকা। ও মন খারাপ করলো। বললাম, দে তিনশ টাকা। বড় কষ্টে ৩০০ দিল। আমি সই করে দিলে খাতাটা বড় ব্যাগের ভিতর ফেলে রাখলো। আমরা জুম্মার নামাজের আগে বেরোই না। ইতিমধ্যে কবিরের ধারণা জন্মেছে, সীমার চিঠি আসে ঠিকই আমি অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছি। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে, সীমার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। বললো, দিদির আর কোন চিঠি নাই। বললাম, না। কতদিন হলো ? তিন মাসের উপরে। আপনি দিয়েছেন ? না। কেন দেন নাই ? দিলে আমার হিসেব নম্বরও দিতে হবে। ও বললো, তাই তো ? বললো, দাদা হিসেবটা খুলে ফেলি। বললাম হিসেব তো একটা খোলাই হল। আজ ৩০০ টাকা তুললাম। এটাতেই চলবে।

ও বললো, দেখবেন দিদি একদিন হুট করে দুলালের সাথে চলে আসবে। কথাটা আমারও মনে জেগেছে। আজ একটা চিঠি লিখবো ট্যুরের খবর দিয়ে। কিন্তু আমি জানি, সীমা কোন মন্দ খবর না পেলে আসবে না। পাঠাবে দুলালকে। এবার আমাদের ট্যুর পার্বত্যজেলা রাঙামাটি ও তার উপরে নদী পথ। কাপ্তাই থেকে লঞ্চে উঠবো। উপরে যতদূর যাওয়া যায়।

আমরা রওনা হলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই জেলা। উপরে যাওয়ার সময় প্রতিটি রেঞ্জেই আমরা থামি। রেঞ্জের কাজ-কর্ম দেখি। একমাত্র বন বিভাগের লোকের পক্ষে সম্ভব বনের ভিতরে ঘুরে ঘুরে দেখা। স্যাররা চলমান অবস্থায়ই লেকচার দেন। কোথাও বা বসে। আবার রওনা। কোথায় রাত থাকবো তার একটা কপি সংশ্লিষ্ট অফিসকে আগেই দেওয়া হয়েছে। তাঁরাও জানেন কলেজ থেকে টিম আসছে। সাতদিনের ট্যুর শেষে আটদিনের মাথায় কলেজে ফেরত এলাম। পিয়ন জানালো, কবির এসে একবার ঘুরে গেছে। আমরা ফিরেছি কী না এসব জানতে। ডাকবক্সে আমার অনেক চিঠি। একটা মায়ের, একটা সিরাজের, একটা ছাত্র নাসিরের, আর একটা সীমার। সবগুলোই পড়লাম সীমারটা বাদে। এটা নিভৃতে পড়বো। রাতেই কবির এলো। খাওয়া দাওয়া শেষে রুমে আড্ডায় বসলাম। ঐ যে কবিরের হাতানো অভ্যাস। একটু বাইরে যেতেই সবগুলো চিঠিই উল্টিয়ে গেছে। সবটার মুখ খোলা, শুধু সীমারটা বাদে। আমাকে কিছু বলবার আগেই বলে উঠলো, দাদা বাড়ির খবর কী? দিদির কোন খবর টবর আছে। একবার ভাবলাম লুকাই। আবার মনে হল, না ঠিক হবে না। বললাম, ঐখানে দেখ চারটা খাম আছে বের কর, বলা মাত্রই বের করে আনলো। মনে হল ঐ জায়গাটা ওর খুবই চেনা। বললো, দিদির চিঠির মুখ বন্ধ। খুলবো? বললাম, না। ওটা আমায় দে। অন্যগুলো পড়। ও মায়েরটা পড়লো। সিরাজেরটাও। কারণ সিরাজ ওর চেনা। ১৯৭১-এ পরিচয়। এবার আমি সীমার চিঠি খুললাম শঙ্কিত মনে।

পূজনীয় দাদা,

“সালাম নিবেন। প্রায় ৪ মাস খবর পাই না। আমার পরীক্ষা চলছিল। শেষ হয়েছে। আমাদের স্যার পণ্ডিত রামচন্দ্র বাবুর অসুখের কথা শুনে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। আপনার কথা কয়েকবার তুললেন। কী যে স্নেহই না করেন আপনাকে। ঐ পথে কুষ্টিয়া গেলাম মা-বাবাকে দেখতে। আমার যাওয়ার খবর শুনে দুলাল কাকা বকশীপুর থেকে পদ্মা নদীর প্রায় ১০ কেজি ওজনের রুই মাছ নিয়ে হাজির। সাথে যে আরো কত কি? বাবার সাথে কি কি পরামর্শ করলো ওরাই জানেন। আমার কানে এলো বাবা বোধহয় দুলাল কাকার সাথে করে চিটাগাং যাবেন। বাবা ভারতের মাটিতে যা আছে তা একেবারে বেচে দেবেন বললেন। আর না দিয়েই বা কি করবে ? বেদখল হয়ে যাবে। কুষ্টিয়ার বাড়িটা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দুলাল কাকা নিজে

থেকে এসব করিয়েছে। হিসেব খুলেন নাই? চেকটা কি ছিঁড়ে ফেলেছেন! ছুটিছাটা কি একদমই পান না? আপনার রুমমেট মনছুর ভাই দুলালকে নাকি খুব আদর যত্ন করেছে। আর একজনের কথা বললো। তিনি নাকি আপনার সাথী ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা। সবাইকে আমার সালাম দেবেন। মা ঈদে আপনাকে বাড়িতে আসতে বলেছে"।

ইতি
আপনার স্নেহধন্য সীমা।
রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কবিরকে বললাম, এই নে। এটাও পড়। কবির দুই তিনবার পড়লো। শেষ হলে বললাম, খামের ভিতর রেখে দে। কবির ওটা নিয়ে আলোচনা করতে চায়। আমি বলি, না কবির তা হবে না। তুই যাই কল্পনা করিস তা আমার সাথে নাও মিলতে পারে। বললাম, পন্ডিত মশাই অসুস্থ দেখতে যেতে পারছি না। এটাই আমার সবচেয়ে বড় কষ্ট। আমার এ পর্যন্ত আসার পিছনে ওঁনার অবদান বিরাট। বয়স হয়েছে। আমার এ জীবনে দেখা একজন সত্যিকার পন্ডিত, সেরা পন্ডিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক। ৭ম স্থান অধিকারী। ভাইদের চক্রান্তের জ্বালায় আর পড়তে পারেনি। অবশেষে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। আমাদের স্যার। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে রে। তোর ভোগান্তি আর ওঁনার ভোগান্তি একই রে। আজকেই স্যারকে একটা চিঠি লিখবো। সীমাদের বৈষয়িক ব্যাপার ও জানতে চাইলো। বললাম, সবই তো লেখা আছে। আবার কি জিজ্ঞাসা করবি ? দাদা চেকটার কি হবে? তাই তো ভাবছি রে। বললাম, হ্যাঁরে কাকা আর দুলাল যদি আসেন, এখানে তো রাখা যাবে না। একটা হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। কবির বললো, তা করা যাবে। সীমা দিদি এলেও। আমার মনে হল সীমা ওর বাবার সঙ্গী হতে পারে, কথাটা বলে নাই। এসব কথায় আর এগোলাম না। শুয়ে পড়, ঘুমো। বলে আমি শুয়ে পড়লাম।

আমরা ফজর পড়ে আবার শুয়েছি। এই সময় আমার ঘুম আসে না। হাঁটতে বের হই। ওরা ঘুমেই থাকলো। আমি হাঁটতে বের হলাম। বন গবেষণাগারের মধ্যে আমাদের কলেজ। কোন এক সময় এটা বন অধিদপ্তরের সাথে ছিল। পাহাড়ে ঘেরা। বাংলোগুলো পাহাড়ের উপরে। ঢালে আর সমতলে অফিস ও গবেষণাগার। বিরাট এরিয়া। গাছগাছালিতে

ভরা। ভরা হয়েছে গবেষণার জন্যই। আমার মনে হয় ২/৩ শ একরের বেশি। আরো বেশি খালি পড়ে আছে। রাস্তার পাশে পাইন গাছের সারিগুলো অসাধারণ। ৭ টায় রুমে ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে গোসলে চলে গেলাম। গোসল সেরে টেবিলে বসলাম। ওরা ঘুমুচ্ছে। একটু জোরে জোরেই বললাম, দুই সাবজেক্ট এ ফেল মেরে এত ঘুম আসে কোত্থেকে ? আমারও ফেল দুই বিষয়ে। গোসল সারলেই খিদে লাগে। চিড়েমুড়ি খাওয়া শুরু করলাম। শেষে স্যার পন্ডিত রামচন্দ্র বাবুকে ছোট্ট একটা চিঠি লিখে খামে ভরে ফেললাম। আজ ছুটি, আজ আর যাবে না। তবুও বিকেলে ফেলবো বক্সে। আমার ভালো না লাগায় ওদের ধাক্কায়ে ধাক্কায়ে উঠালাম।

আমাদের ১১ জনের মধ্যে ২/৩ জন ফুল পাশ। ৯ জনেরই দুটো বিষয়ে ফেল। আমরা যারা ফরেস্ট্রি ডিগ্রির জন্য আন্দোলন করেছিলাম তারা একটাও পাশ করে নাই। নাস্তা শেষে ওখানেই মিটিংয়ে বসলাম আমরা। ফেল করানো ডাইরেক্টরের শয়তানি। ভার্সিটিকে দেখাতে চায়, এরা ডিগ্রির অযোগ্য। ঠিক হল, আমরা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে আবেদন করবো। আমাদের সব খাতা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দিয়ে Examine করানো হয়। আর প্রশ্নগুলোও যেন ভার্সিটির স্যাররা করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা কাজ করলাম। ভার্সিটিও আমাদের আবেদন মঞ্জুর করলো। ডাইরেক্টরের হাতে আর কিচ্ছু থাকলো না। আমার মনে পড়ে আর.আই. চৌধুরী নামে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের মূল শক্তি ছিলেন। চিটাগাং ভার্সিটিতে ওনার বিপুল আধিপত্য ছিল। ওনাকে সবাই জানতেন। উনি না থাকলে আমরা এই অসাধ্য সাধন করতে পারতাম না। এই জন্যই বিদ্বানরা চিরদিনই নমস্য।

কবির গেল না। দুপুরে জানা গেল আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এক মাসের ট্রেনিং হবে নাটোরের দয়ারামপুর ক্যান্টনমেন্টে। এটা ট্রেনিং এর একটা অংশ। কোন এক স্যারের কাছ থেকে খবরটা জানা গেছে। কবিরও খবরটা জানলো। আমাদের একমাস দেখা হবে না এটা বড় কষ্টকর। ট্রেনিং এর শেষেই কোরবানি এসে যাবে। ৯ টায় শোতে তিনজন হলে ঢুকলাম। বের হতে হতে রাত ১২ টা। হোটেলে খেয়ে দেয়ে রুমে ফিরলাম। সকালে কবির চলে গেল। আরও জেনে গেল আমরা পরীক্ষায় ফেল করেছি। অফিস খুলতেই জানা গেল ট্যুরের খবর সত্যি। এবার পুরো বিছানাপত্র সাথে যাবে। খাওয়া দাওয়া ক্যান্টনমেন্টে। আমাদের বিল দিলেই হবে।

লম্বা ট্যুর সামনে তাই হালকা পাতলা ক্লাস হচ্ছে। আমরা সামনের পরীক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি। সীমাকে লিখে দিলাম আগামী মাসে চিটাগাং থেকে নাটোর। সেখানে একমাস ক্যান্টনমেন্টে লাফ ঝাপ। এসে যাবে ঈদের ছুটি। ছুটি লম্বা হলে ঐ পথে বাড়ি যাবো। কোন চিঠি না লিখতে বলে দিলাম। ইতোমধ্যে কবির এসেছে, থেকেছে, চলেও গেছে। অন্য কোন আলাপে আমরা মাতিনি। মনছুরকে বললাম, দুই তিন বিষয়ের বই নিয়ে চল। আমরা আলোচনা করে পড়বো ফাঁকে ফাঁকে, যদি ফাঁক মেলে। বই নিলামও ভাগ করে। কবির এলো ঠিক আগের রাতে। খাতা খুলে বললো, দাদা খাতায় লিখলাম তিন হাজার। আমি বললাম, এক হাজার। শেষমেষ দেড় হাজার। ওকে বললাম, তুই চিন্তা করিস নে। টাকার অভাব হবে না, হবে তোর অভাব। বলেই সিগারেট ধরায়ে রুমের বাইরে গেলাম। ভোরে কবির চলে গেল।

আমরাও সকাল ৯ টায় রওনা হয়ে গেলাম। আমাদের বাসে ঢাকায়। পরে ভাড়া রিজার্ভ বাসে দয়ারামপুর ক্যান্টনমেন্ট। পৌঁছনোর দিন কোন ক্লাস হল না। আমরা আর্মির নিয়ন্ত্রণে চলে গেলাম। আরামে বিরামে একমাস কেটে গেল। বিদায়ের দিন সেনা কর্তৃপক্ষ আমাদের বিশেষ ভোজ দিলেন। আমাদের পরিচালকও উপস্থিত ছিলেন। সেনা কর্তৃপক্ষের সাথে নানা রকম ছবি তোলা হল। এবার বিদায়। সেনাদের বাস আমাদের রেলস্টেশনে পৌঁছে দিল। আমার বেডিং মনছুরকে দিয়ে দিলাম। ঢাকায় আমাদের বাসে ফেলে রাখার জন্য। পরিচালক সাহেবকে বড় অনুরোধ করে ঈদের ছুটি বাদে আরও ৭ দিন ছুটি বাড়িয়ে দিলাম। এ ক্ষমতা ওনার আছে। স্যারকে খুব খুশি খুশি মনে হল। আমরা যে ভালো পারফর্ম করেছি, সেনা কর্তৃপক্ষ ওনাকে জানিয়েছেন। আসলে সকল ক্রেডিট তো ওনারই। আমি সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে পড়লাম। পোড়াদহ এসে নামলাম। গোয়ালন্দ গামী ট্রেন এলো সন্ধ্যায়, নামলাম কুষ্টিয়াতে। ভাবলাম বাড়ি যেতে রাত হয়ে যাবে। সীমাদের বাসায় যাই। আবার ভাবলাম যদি কেউ না থাকে। হেঁটেই ওদের বাড়ির গেটে নক করতেই গেট খুলে গেল। সামনে সীমা। দাদা বলে আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো। মনে হল কতদিনের প্রতীক্ষার অবসান হল। আলো আঁধারিতে ওর সারা কপোলে চুম্বন এঁকে দিলাম। ও কাঁপছে। ওকে নিয়ে কাকীমার সামনে এলাম। কাকীমা তো হতবাক! মোড়ায় বসলাম। সীমা আমার ব্যাগ নিয়ে রুমে রাখলো। পায়ের জুতা মোজা খুলে দিল।

গায়ের জামাটাও খুলে নিল। পাখা নিয়ে পিছনে দাঁড়ালো। চারদিক তাকিয়ে বললাম, বাড়িটা দারুণ সুন্দর করেছেন। এবার দেখার মতো হয়েছে। এখন রুম চারটা। ডাইনিং, বৈঠকখানা আলাদা আলাদা। রুচির ছোঁয়া লেগেছে। সীমা আদেশের সুরেই বললো, এসব দেখার প্রচুর সময় পাবে, আগে গোসল সেরে নাও। ওখানে সব দেওয়া হয়েছে। ভালো মতো শাওয়ারে ভিজে পরাণভরে গোসল করে বের হলাম। সীমা পলকহীনভাবে আমার খালি গায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি অনেক ফর্সা ও সুন্দর হয়েছো। একটু মেদও নেই। আগেও তো ছিল না। এখন একদম জিরো। ওর পিছে পিছে রুমে ঢুকলাম। ধোয়া কাপড় পড়লাম।

কাকীমাকে বললাম, ভাত খাবো। অন্য কিছু নয়। টেবিলে খেতে গিয়ে দেখি ভর্তা আর মাছে ভরা, সাথে মুরগি। কাকীমা বললো, তুমি ঈদে আসবে শুনেছি, এই পথে আসবে তা ভাবিনি। তোমার কাকা দোকানে আছেন। ফিরতে রাত বারটা বাজবে। খেয়ে উঠেই কাকীমাকে বললাম, কোন রুমে যাবো ? চোখ আমার সীমার দিকে। যেটা আপনার ভালো লাগে। বলেই একদম কর্নারের যেটা নতুন করা হয়েছে সেটায় নিয়ে গেল। সীমার সারা মুখে আলোর লুটোপুটি চলছে। দাদা তুমি শোও, আমি আসছি। না, তুই বয় আমার মাথার কাছে। একদম চোখের আড়াল হবিনে। যতক্ষণ থাকবো। চোখে চোখ রেখে থাকবো। কতকাল তোকে দেখিনি। চোখ মন সব শুকিয়ে গেছে। মনটাও হয়ে গেছে মরুভূমি। সিগারেটের প্যাকেটটা দেতো। ও প্যাকেট ও লাইট দিলে সিগারেট ধরায়ে টানতে লাগলাম। আমার মাথার কাছে ও আমার চুলে হাত বুলাচ্ছে। ধোয়ায় মুখটা ঢেকে গেলো বলে উঠলো, থামাও না তোমার ধোয়া। মুখটা ভালো করে দেখি। সিগারেট খাওয়া শেষ হলে আমার মাথার উপর মাথা দিয়ে কাত হলো। এতো সান্নিধ্যে আমরা আর কোনদিনও আসিনি।

অনুভব করলাম আমার অনুপস্থিতি ও অবহেলা ওকে অনেক পুড়িয়েছে। টপ টপ করে ওর চোখের তপ্ত জল আমার গাল মুখ ভিজিয়ে দিল। অনেকক্ষণ পরে নিজ হাতে ওর মুখ মুছিয়ে কপোলে একটু আদর দিয়ে বললাম, যা খেয়ে আয়। কাকীমা বসে আছেন। বাবা আসুক, তার পরে। আধা ঘণ্টা পরেই কাকা ফিরলেন। কাকীমা আস্তে গেট খুলেই বললেন, শুভ এসেছে। রুমের সামনে এসে ডাকতেই আমরা দুজনই বেরিয়ে প্রণাম করলাম। তোমরা একটু বসো, হাতমুখ ধুয়ে নেই। এবার আমরা সবাই

খাবার টেবিলে। বললাম, কাকা আমি খেয়েছি। না, তুমিও বসো। একসাথে অনেকদিন বসা হয়নি। আবার খেলাম। সীমা আমাকে রিকশা নিয়ে একটা খবর দিলেই আগে চলে আসতাম।

আমার কলেজের গল্প, তার সংসারের গল্প করতে করতে রাত অনেক হয়ে গেল। তুমি জার্নি করে এসেছো ঘুমোও সকালে আমরা বেরোবো। আমি আমার রুমে গেলাম। সীমাও পিছু পিছু এলো। মশারির ভিতর ঢুকেই শুয়ে পড়লাম। তুই শুয়ে পড় গে। যদি না যাই। তাহলে এখানেই থাক। বললো, আমি আজ ঘুমাবো না। তাহলে বসে মশার কামড় খা। তুমিই তো বললে চোখে চোখে থাকবি। তাই থাক, হাঁ করে আমার চোখের দিকে চেয়ে থাক। আমি ঘুমোই। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে আমার নামাজ পড়ার অভ্যাস। দেকি জায় নামাজ, টুপি রাখা আছে। ভোরে উঠে রুমেই নামাজ আদায় করলাম। কাকা উঠে পড়েছেন। চলো আমরা বেড়িয়ে আসি। চলতে চলতে কাকা বললেন, তুমি এসে ভালোই হয়েছে। তোমার কাছে আমরা সবাই যেতে চেয়েছিলাম। বললাম, সবাই কে কে ? দুলাল, সীমা, তোমার কাকীমা ও আমি। সাগর পাহাড় তো জীবনে দেখিনি। দুলালের কাছে শুনেছি দারুণ শহর। কল্যাণীর বাড়ি আর জায়গা বেচে দেবো ভাবছি। ওখানে কেউ না থাকলে আমার আত্মীয়রাই দখল করে নেবে। এক টাকাও পাবো না। সীমারও তাই ইচ্ছে। তোমার মতটা বলো। ওখানে আমাদের ভালোও লাগে না। সবাই বাঁকা চোখে দেখে। আমি আমার জন্মভূমিতেই চিতায় উঠতে চাই। বকশীপুরের বাড়ি দুলালের ও সীমার। এ বাড়িটাও সীমার। সীমা তো ভারত দুচোখে দেখতে পারে না। মেডিকেলে ও এবার নাকি প্রথম হয়েছে। এখানকার একটা মেয়ে ওর সাথে পড়ে। তার কাছে শুনা। জিজ্ঞেস করলাম, ও শুধু হাসলো। তুমি থাকলে ও বড় আনন্দে আর খুশিতে থাকে। দেখনা সারা বাড়িটা মাথায় করে রেখেছে। তুমি ঘুমানোর পর, আমার কাছে এলো। বললো, বাবা চিটাগাং যাওয়ার প্লান বাদ দিয়ো না। দাদাকে যেতে দিয়ো না। আমরা একসাথে বকশীপুর যাবো, দুলাল কাকাকে খবর দাও, আরও কত কথা। সেকি ফুরাতে চায়। আজ নাকি আমার সাথে বাজার করতে যাবে। রাতে হলে ছবি দেখবে? আমরা গড়াই তীর ধরে হাঁটছি। ওতো রাতে আমার কাছে ঘুমোয়।

আমরা সকাল ৮ টায় বাসায় ফিরতেই কাকীমা বললেন, 'তোমরা এতক্ষণে

ফিরলে?' আমি আর কাকা গোসল সেরে টেবিলে বসতেই দেখি, সীমা স্নান শেষ করে নতুন শাড়ি পরে সারা পিঠে চুল এলিয়ে আমাদের কাছে এলো। আমার মনে হল, আমরা বের হওয়ায় পরেই স্নান শেষ করেছে।

আমি তাকিয়েই বললাম, তুই কি এই নতুন শাড়ি পরেই বাজারে যাবি ? কি! আমি বাজারে যাবো ? কাকা আমার চোখের দিকে তাকাতেই সব বুঝে ফেললাম। না রে তোর সাথে আমিও যাবো। বাজারঘাটে যাওয়া হয় না অনেকদিন। খেয়ে নাও, তারপরে দেখা যাবে কোথায় যাওয়া যায়, আর না যায়। একদম আমাদের সামনে থেকে নড়বে না। চারজন একসাথে থাকবো। আমার কথারই প্রতিধ্বনি একটু বদল করে বললো, বাবা আমরা আজ বই দেখবো, তোমার দোকান আজ খুলো না। মা তুমিও যাবে? কাকীমা মিটমিট করে হাসছে মেয়ের আনন্দ দেখে। শেষমেষ আমাদের কোথাও যাওয়া হলো না। বাজারেও না, সিনেমাতেও না। দুলাল ফিরে এসে কি কি বলেছে তা শুরু করলো; বুঝলাম, দুলাল কিছুই বাদ দেয় নাই। আমার বিছানা, বালিশ, চাদর, পোশাক-আশাক এমন কি রুমের ও খাটের মাপ পর্যন্ত। সব বাসাগুলো নাকি পাহাড়ের মাথায়। রাতে কি যে মজা লাগে দেখতে। এবার আমি নিজেই মনছুর ও কবিরদের গল্প করলাম। সবাই ভালো। ওর মাথায় চেপেছে সাগর পাহাড় দেখবে। কিন্তু ঐ চেকের কথা একবারও তুললো না। বিকেলে আমরা হাঁটতে বেরুলাম। বললো, দাদা, ইসলাম সম্পর্কে ধারণা নিয়ে ফেলেছি। প্রাথমিক কাজগুলো শিখে ফেলেছি। আমি বললাম, তোর পূজা-অর্চনা, দেবদেবির কি অবস্থা হবে? ওরা ওদের জায়গায় থাকবে। আমায় পাবে না। ওদের অনেক পূজারি আছে। আর ডাক্তারদের পূজা করার সময় কোথায়? হ্যাঁরে, তুই নাকি ফাস্ট হয়েছিস ? শুধু হাসলো। আমার দুই সাবজেক্ট ফেল। যাও, ও তোমার মিছে কথা। তারপর সব ঘটনা বললাম। শুনে বললো, ও তাই।

প্রিয় পাঠক, গালাগাল দেবেন না। লিখবো কবিরের কথা, লিখছি সীমার কথা। না লিখে পারছি না। আপনাদের একটু ধৈর্য ধরতেই হবে। বললো, দাদা আমি মা, বাবা, বকশীপুরে দুলাল কাকাও ঘরে। হঠাৎ কাকু (আমার আব্বা) আলো খাঁর সাথে বাড়ির নীচে থেকেই ডাকলো, অতুল আছো ? বাবা, দুলাল দ্রুত নেমে গিয়েই হাত ধরে উপরে আনলো। মনে হল মাঠ দেখতে গিয়েছিল। ভিতরে আসতেই আমি পায়ের ধুলা নিয়ে টুলে বসতে দিলাম। পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম।

বেশ রোদ গায়ের জামাও আমি খুলে দিলাম। এক বদনা পানি আর আমার গামছা এনে টুলের পাশে রাখলাম। বাবা মা বারান্দায় বসে। একটু গা জুড়িয়ে এলে বললাম, কাকু ওজু করে নেন। অনেক আগেই আজান পড়ে গেছে। আমি ভিতরে থেকে পাটি জায়নামাজ এনে দিলাম। কাকু ওজু করলেন, আমার কাছে খাওয়ার পানি চাইলেন। আমি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। শুধু পানি না, আরও যা আছে তাই আনো। তোমাদের এখানে খেতে আমার কোন অসুবিধা নেই। ওটা রুচির ব্যাপার। মানুষ, সব মানুষ এক। সমাজ ধর্ম পরিবেশ মানুষকে পৃথক করে ফেলেছে। সবই তাঁর ইচ্ছে। যাও আনো। মাটিতে পাটি পেতে দিয়ে বসার ব্যবস্থা করে মা চিড়েমুড়ি, দুধকলা, নাড়ু সামনে এনে দিলেন।

আমি বাম হাতের কাছে বসে বাতাস করতে লাগলাম। জানো দাদা, কাকুকে আমি সেদিন পূর্ণ চোখে দেখলাম। সৌম্য সুন্দর চেহারা। পাকা লম্বা দাড়ি। সারা মুখে স্বর্গীয় দ্যুতি ঝলমল করছে, চুপ করলেই মনে হয় ধ্যানী তাপস। আমার গামছায় হাতমুখ মুছলেন। বসে নামাজ আদায় করলেন। বললেন, সীমা একটা বালিশ দাও। আমার রুম থেকে একটা চাদর এনে বিছিয়ে দিলাম। বালিশ মাথায় দিয়ে চোখ বুজলেন। আমি বাতাস দিচ্ছি, আর পায়ে হাত বুলায়ে দিচ্ছি। মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় সাত ফুট লম্বা মানুষটাকে দেখছি। দেখতে দেখতে আমার চোখ ভেঙে এলো। বারবারই তুমি আমার চোখের সামানে এসে দাঁড়াচ্ছো। প্রায় আধা ঘণ্টা পর কাকু উঠে বসে বাবাকে ডাকলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, সীমা বড় লক্ষ্মী মেয়ে। বলেই একটা লম্বা শ্বাস ফেললেন। বাবা মা চুপচাপ। দুলালকে ডাকো। দুলাল এলো। বললেন, দুলাল তুই এই বাড়ির বাসিন্দা। এদের যেন কোন অপমান না হয় খেয়াল রাখিস। তাছাড়া আমার লোকও খবর রাখে। তোর উপর এরা ভরসা করে। বলেই উঠে পড়লেন। আমি আবার পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়াতেই আমার মুখটা দুহাতে তুলে ধরলেন। মাথায় হাত দিয়ে কী যেন বললেন। আমাকে যেতে বললেন তোমাদের বাড়িতে।

বাবা বললেন, কাকা তো সাধারণত কারো বাড়ি যান না। সব সময় নামাজ কালাম নিয়েই থাকেন। আগে সালিশ করতেন, ওসবও বাদ দিয়েছেন। সব গ্রামের মানুষ শ্রদ্ধা করে। কী হিন্দু, কী মুসলমান। বড় রাশভারী মানুষ। হঠাৎ আমার বাড়িতে? আবার যা দিলাম তাই খেলেনও। মা রে আমি তো

ভাবতেই পারিনে। আমিও ভাবছি বাবা তো এরকম করেন না। সন্ধ্যা নামতেই আমরা বাসায় ফিরে এলাম। চিটাগাং গিয়ে চা পানের অভ্যেস করে ফেলেছি। সীমা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। নাস্তা শেষে আমরা উঠানে বসে আছি। সীমা বললো, দাদা তুমি একটু মায়ের কাছে বসো। আমি এক্ষুনি বাবার কাছ থেকে আসছি। ভুলেই গেছি, বাবা যেতে বলেছিলেন। ও চলে গেলে কাকীমাকে বললাম, কাকীমা, সীমার বিয়ের কথা কিছু ভাবছেন? দু'বছর পরেই তো বেরুবে।

কাকীমা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, সত্যি বলতে কি বাবা, ওকে আমরা কিছু বলতে সাহস পাইনে। পার শুধু তুমি, আর পারেন পন্ডিত মশাই। আমি তো মা। আমি বুঝতে পারি ওর মন কোথায় পড়ে আছে। আমাদের কাছ থেকে সবদিক থেকে দূরে চলে গেছে। তুমি আসাতে বাড়িটা খুশির হাওয়াতে ও দোলাচ্ছে নিজেও দুলছে। আপনি তো মা। আপনার তো পারা উচিত। আমি বললাম। না, বাবা আমার মা ও পারেন নাই। ম্যাট্রিক প্রথম বিভাগে পাস করে তোমার কাকার সাথে সেদিন এক কাপড়ে চলে এলাম। সেদিন আমার মা ও আমার পাশে ছিলেন। ভাইয়েরা একদম খড়গ হস্ত। কিছুই আমাকে ফিরাতে পারেনি। বাবার একমাত্র মেয়ে। বাবার ব্যবসা, ভাইদেরও ব্যবসা। না, না শুভ আমি পারবো না। ওর সিদ্ধান্ত ইউনিক। সে এখন ডাক্তার হতে যাচ্ছে, ওর সিদ্ধান্তে অন্তত আমি বাধ সাধবো না। সীমা এসে গেল। হাতে ব্যাগ ভর্তি কি যেন। দাদা, মায়ের সাথে কি কাটুরকুটুর করছো? ভারত পাঠানোর বুদ্ধি না তো? না রে এবার তোকে বিলেত পাঠাবো MRCP, FRCP, করার জন্য। আচ্ছা সে দেখা যাবে কে কাকে কোথায় পাঠায় ?

হঠাৎ বলে বসলো, সকাল ১০ টার গাড়িতে বাড়ি যাবে। অন্ধকার রাত। কোথাও বেরুতে ভালোও লাগছেনা। আর রাতে যাবোই কোথায়? কাকা এসে পড়লে আমারা সবাই উঠানে গিয়ে বসলাম। আলো আঁধারিতে ভালোই লাগাছে। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে কবিরের সব ঘটনা ওদের শোনালাম। হিসেব খোলার কথাও বাদ দিলাম না। ছেলেটা তোমাকে বড় ভালোবাসে, বললেন, কাকীমা। সীমা ঠোঁটের এককোণা দাঁতের নীচে কামড়াচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। রাগে, না খুশিতে তা বুঝতে পারলাম না। পারলাম রুমে এসে। তাই তো আমার চেক ছিঁড়ে ফেলা হয়। ৪ মাসে একটাও চিঠি আসে না, সে তোমার কোন কালের আত্মীয় ? সে

কেন তোমাকে টাকা দেবে ? কী তার স্বার্থ ? সে তোমার বোনকে বিয়ে করবে, না তুমি তার। তোমার টাকার অভাব! তুমি ধার করে চলছো। পরশু বাড়ি গিয়েই কাকু আর কাকীমাকে বলবো। হাত ধরতেই, সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল। ওর সারা মুখে আগুন জ্বলছে। মলাম রে! কীসে কী হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। ও ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এবার আমি উঠেই হাত এমন শক্তভাবে ধরলাম যে ছুটতে পারলো না। ছুটার চেষ্টাও করলো না। কপোলে একটু আদর দিয়ে মাথাটা বুকের কাছে এনে বললাম, পাগলী কোথাকার! এবার আমার প্রশ্নের জবাব দে। হিসাব খুলবো, নমিনি করবো কাকে ? তুই তো ছবি দিস নাই। কে বললো চেক ছিঁড়ে ফেলেছি? সযত্নে আছে।

কবিরের বোনও নাই, শালীও নাই। আমার কে আছে তুই তো জানিসই। তুই ছাড়া আর কে আছে ? একমাস পর যখন যাবি নিজে হিসাব খুলে দিয়ে আসবি। কবির হবে স্বাক্ষী। তোর চেক ছিঁড়ে ফেলা মানে তোকে ছিঁড়ে ফেলা। তোকে ত্যাগ করা। তোকে অপমান করা। তোকে আঘাত করতে পারবো কিন্তু ওগুলো আমার জীবন গেলেও পারবো না। তুই যে আমার কত আদরের, কত বেদনার তা তুই জানিস নে ? আর তুই যদি আমাকে ভুল বুঝিস, কার কাছে যাবো রে! ও আমার দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমি ওর পিঠে হাত বুলায়ে দিতে লাগলাম। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এলে, নিজ হাতে মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম, যা মুখ ধুয়ে আয়। রাতে খাবার এর সময় হলো। কাকা এলে আমরা সবাই একসাথে খেয়ে নিলাম। সীমা বললো, 'বাবা দাদা কাল ৯ টার গাড়িতে চলে যাবেন বাড়িতে। ঈদের তো আর বেশিদিন বাকি নাই। দুলাল কাকাকে কিছু বলার থাকলে বলে দাও।' আমরাই তো যাচ্ছি পরশু। দুলালকে খবর পাঠাবো, বললেন কাকা। ব্যবসার আলাপে সালাপে মনে হল ব্যবসা জমে উঠেছে। সীমা ঘরের মধ্যে আমার কাপড় ব্যাগে তুলছে। কাকী রান্নাঘর ঠিকঠাক করছে। হঠাৎ কাকা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ট্রেনিং শেষের দেরি কত? আরও তিন মাস মতো আছে। তারপর পোস্টিং হবে। কোথায় হয় বলা যায় না। আমি আমার রুমে এসে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আজানে ঘুম ভাঙলো। অজু করে এসে ফজর আদায় করলাম। কাকাও উঠে পড়েছেন। বললেন, চলো হেঁটে আসি। চলতে চলতে বললেন, এখানের

ব্যবসা ভালোই চলছে। কল্যাণীর জমিটা কী করবো তুমি তো কিছু বললে না ? বললাম, কাকা সীমা আর কাকীমা কি বলেন? সীমা পারলে আজই বেচে ফেলে। তোমার কাকী হাঁও বলে না আবার নাও বলে না। ওটা রাখা যায় না? রাখতে গেলে ও বাড়িতে থাকতে হবে। না হলে বেহাত হয়ে যাবে। ভারত সরকার অভিবাসীর ব্যাপারে যেসব আইন করছে তা কঠোর, খুব ঝামেলা। আমি তো ভারতের নাগরিকই হই নাই। খাজনা ইত্যাদির ঝামেলা আছে। বললাম, সীমার কথা বাদ দেন।

'আপনি আর কাকী যদি মনে করেন ভারতে যাবেন তাহলে ও জমি রাখতে হবে। আর না গেলে বেচতে হবে। আমার সাথে কথা না বলে আপনি আর কাকী বসে সিদ্ধান্ত নেন। আজ হয়ত সীমা বেচতে চাইছে না এমন এক সময় আসতে পারে এরজন্য আপসোস করবে। শোন বাপু, ওখানে আমরা বাস করতে পারবো না। ওখানকার হিন্দুরাই বেশি খারাপ। এখানকার মুসলমানরা হাজার হাজার গুণ ভালো। ওখানে গেলেই আমার মন এখানে আসার জন্য পাগল হয়ে যায়। ওর মামারা আছে। ঐ দায়সারা গোছের আদর। শুধু ভাবে ও যাবে কবে ? ঈদের পরেই ওখানে যাবো। শেষ ব্যবস্থা করে আসবো। এখানকার একজন ওপারে যেতে চায়, সে আমার জমি দেখতে যাবে। পরতা হলে সেই নেবে। এপারে বসে বেচতে পারলে ভালো। লেনদেন দুজনের পক্ষেই সহজ হবে। আমি শুনছি, কিছু বলছি না। মনে মনে বললাম, এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত দেওয়া ঠিক হবে না। আর আমি তো এদের আত্মীয়ও নই। আমার সম্পর্ক স্নেহের। পাড়া পড়শি যারা গেছে তারাও তাল মিলাতে পারছে না। আগে থেকে যারা চাকরি-বাকরি ধরেছে তাদের কথা আলাদা। অফিস বাসা, বাসা অফিস। এসব পরে দেখা যাবে। চলো বাসায় যাই। তোমার ট্রেন তো আবার প্রায় ৯ টায়। বাসায় ফিরে দেখি মা মেয়ে নাস্তা তৈরি করে চলেছে।

সীমা পরনে টাঙ্গাইলের চেক, চুল পিঠে ছড়ানো মনে হল সদ্যস্নান সেরেছে। সকালের রক্তিম আলো বাঁকা পথে মুখের এক পাশে পড়ে ওকে অপরূপ করে তুলেছে। আমি তাকিয়ে আছি দেখে বললো, হাঁ করে দেখছো কি ? যাও স্নান সেরে তাড়াতাড়ি এসো। ট্রেনের সময় হয়ে যাবে। কাকীমা বলতে চাইলো ও থাক না আজ, কাল যাবে। না, মা ও আজকেই যাবে। বাড়িতে কাকীমা ওর পথ চেয়ে আছে। তাছাড়া তিন দিন পরেই ঈদ। মায়ের কাছে থাকা দরকার। কাকীমা চুপ হয়ে গেলেন।

আমি বাথরুমে ঢুকলাম। গোসল শেষে রেডি হয়ে টেবিলে বসেও ওর দিকে তাকিয়ে আছি। এমনরূপে আগে ওকে কখনও দেখিনি। সীমা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা। মাথায় ঢেউ তোলা দীঘল কেশরাশি। প্রায় হাঁটু ছুঁই ছুঁই। গায়ের রঙ লাল শ্যামলার সংমিশ্রন। এ রঙ দুটো ওর মুখে সারাক্ষণ ঠেলাঠেলি করে। আলো ছায়াতে এক এক রকম। হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে আস্তে করে বললো, ইচ্ছে করছে আমার হাত দুটো দিয়ে তোমার গলা পেচিয়ে মুখটা তোমার মুখের সাথে মিলিয়ে রাখি। কাকা টেবিলে বসতেই, নাস্তা আমাদের দিয়ে সেও বসে গেল। নাস্তা শেষে আমি রুমে এসে বসলাম। ট্রেনের সময় হয়ে এলে আমাকে স্টেশনে তুলে দিতে কাকাও এলো, সীমাও এলো। বললো, আমরা কাল না হয় পরশু সকালে আসছি।

আমি দুপুরের আগেই বাড়ি চলে এলাম। মা বাবা খুশি, বোনটাও খুশি। বাবার সাথে ভাত খেলাম। মা খেয়ে ফুরসৎ পেলে কাছে গিয়ে বসলাম। একথা সেকথায় বিকেল হয়ে গেল। আমাদের বিকেলটা কাটে বাজারে, অথবা স্কুলের মাঠে, অথবা নদীর ধারে আড্ডা মেরে। মাঠে গিয়ে দেখি প্রায় সব বন্ধুরা ঈদে ঘরে ফিরেছে। মাঠে ধুমছে খেলা চলছে। ফুটবলে আমার পা নাকি ভালো চলে, আজও দারুন। তাই যেকোন পক্ষই আমার নিতে চায়। এসব মাঠ আমার অতি চেনা, এর প্রতিটি ঘাস আমার সাথে কথা বলে, এর প্রতিটি বাঁক আমার মুখস্ত। আমরা পরস্পরের খুব প্রিয়ভাজন। কোন বড় খেলায় এ মাঠ আমাকে গোল বঞ্চিত করেনি। ঈদ এসে গেল। নামাজান্তে এবাড়ি সেবাড়ি ঘুরে বাড়ি এলাম। মুরুব্বিদের সালামও শেষ করেছি। সারারাত মা তার সহযোগী নিয়ে রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে রেখেছে। আমার বন্ধুরা আসবে, আত্মীয়রা আসবে তাদের সময় দিতে হবে। এসব মায়েরই করতে হয়। রাতে আজ কদিন মায়ের ঘরেই ঘুমাই। মহিমা বাবার ঘরে। উঠানের চুলার কাছে মা মোড়া পেতে বসে। আমি আর এক মোড়ায় বসে প্লেট হাতে করে খাচ্ছি।

মহিমা এসে মাকে বললো, মা সীমাদি এসেছে বাবার ঘরে। মা বললেন, আসুক। বুঝলাম, সীমা বাবার ঘরে বাবাকে সালাম করতে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বাবার ঘর থেকে বের হয়ে এলো মায়ের কাছে। মা বললেন, উঠোনে নয় চলো ঘরে। মায়ের পিছু পিছু সীমারা রুমে চলে গেল। আমিও পিছু পিছু গেলাম। রুমে সীমা মাকে সালাম করে দাঁড়াতেই মা তার গলা থেকে একটা ভারি সোনার চেইন খুলে ওর গলায় পরিয়ে দিলেন। এ চেইন

আমি চিনি। চমকে উঠে মাকে বললাম, মা। মা বললেন, আমার শাশুড়ি আমাকে দিয়েছিলেন। তারও আগে তার শাশুড়ি তাঁকে দিয়েছিলেন। প্রায় সাত পুরুষ এটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি এই বাধা না ভেঙে দিলে তোদের ভাঙতে কষ্ট হবে। এরপর তোদের যা করণীয় আছে, তোরা ৬ মাসের মধ্যে শেষ করবি। তোর ট্রেনিং শেষের ১৫ দিনের মধ্যে। সীমা নিথর। মুখে একটাও কথা নেই। হঠাৎ টলে উঠে মায়ের বুকের পর আছড়ে পড়লো।

আমি নীরবে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। যাক বাঁচা গেল। আমাকে আর কেউ ডাকলো না। মাঠে বেরুবো বলে রেডি হচ্ছি। সীমা আর মা ঢুকলেন ঘরে, সাথে মহিমা। সীমা কোন অলংকার পরে না। শুধু কানে দুটো ছোট কানফুল। গলায় পুঁতির মালা। আর সব খালি। কানের নীচের ছোট ছোট চুলগুলি সব সময় মুখের উপর খেলা করে। মা বললেন, তোর বাবাকে আবার সীমাকে দেখিয়ে আনলাম। মার মুখে কথার খই ফুটছে আজ। সীমা শুধু দেখছে আর শুনছে। একদম কথাহীন। ওর মনের অতলে যে কেউ তা"ব চালাচ্ছে, তার কোন বহির্প্রকাশ নাই। মা যে কত বড় বাধা ভেঙে দিল। তা কল্পনাও করা যায় না। মা ছাড়া আর কেউ পারতো না। আমি বেরুচ্ছি মা। রাত করিস নে। ওদের ফেলে আমি বেরিয়ে গেলাম। রাতে ফিরে খেয়ে নিয়ে এদিকওদিক করছি। এমন সময় মা ডাকলেন। আয় আমার কাছে বস। মহিমা নাই মা? সীমার সাথে গেছে। আজ আর আসবে না। মা বললেন, সীমার মা, খাঁটি ব্রাহ্মনের মেয়ে। বড় বাড়ির মেয়ে। তোদের পূর্ব পুরুষ যখন কুমারখালির সামপুর থাকতো। সেখানে এক জমিদার বাস করতেন। তারা প্রায়ই কলকাতা থাকতেন মাঝে মাঝে এখানে জমিদারি দেখতে আসতেন। জমিদারের দুই মেয়ের বড় মেয়ে তোদের পূর্ব পুরুষের কোন একজনের সাথে প্রেম করে ভেগে যায়। জমিদার রাগে ঐ গ্রামের সকল মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে উচ্ছেদ করে।

জমিদারের অত্যাচারে যে যেদিকে পারে কেটে পড়ে। জমিদার কন্যা আর ফেরত গেল না। তোদের এক পরিবার মাছপাড়ায় লক্ষণদে এসে ঠাঁই নিলো। সেখান থেকে এখানে। এ এলাকাটা কাশিম বাজার মহারাজার। এখানে অন্য জমিদারের দাপট চলে না। জমিদারের ছোট মেয়ের বিয়ে হয় সীমার মায়ের কোন এক পূর্ব পুরুষের সাথে। তারাও কুলীন ও সমৃদ্ধ পরিবার। তোর বাবার কাছ থেকে এসব শুনেছি। এদেশের প্রায় মুসলমানেদের মাতুল তো হিন্দুরা। সীমার মা বাবাকে কোন এক সময়

আসতে বলেছি। মা তুমি আমার মত না নিয়ে তোমার মতেই সব করে চলেছো? তোর মত আমার অজানা নেই। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলি নে। তোদের বাধাটাই আমি গুড়িয়ে দিলাম। তোর বাবা যে রাশভারি মানুষ। একদিন সীমাদের বাড়ি থেকে এসে বললো, এমন লক্ষ্মী মেয়ে হয় না। রূপতো অনেকেরই থাকে। স্নেহ, মমতা, ধৈর্য, মেধা, গাম্ভীর্যের সমন্বয় আছে ঐ মেয়ের মধ্যে। ও বড় দুর্লভ প্রজাতি। জমিদারের রক্ত আছে ওর মধ্যে। সেই দিনই আমার কাছে ঐ গল্পটা করলো। তোর বাবার দিক থেকে আমার একটু ভয় ছিল। সেদিন ভয়টা কেটে গেল। আজ সব ভয় দূর করে দিলাম।

আমি বললাম, মা জমিদারের বড় মেয়ের ঘরের আমরা, আর ছোট মেয়ের ঘরের সীমারা। এক পাড়ে হিন্দু আর এক পাড় যবন। তুই ভাবতে পারিস, ব্রিটিশ আমলে দাপুটে জমিদারের শিক্ষিত কন্যা সমৃদ্ধ মুসলমান গৃহস্থের ছেলের হাত ধরে পথে বের হতে পারে? কত বড় দুঃসাহসের কাজ! ধরা পড়লে জমিদার আগুনে পুড়িয়ে মারতো, না হয় মাটিতে পুঁতে ফেলতো। ছেলেটারও সাহসের কি বলিহারি। বাবা! ছেলেটা নাকি প্রেসিডেন্সি কলেজের অনার্স ও মাস্টার্স। সেখানেই জানাশুনা। গুজব আছে জমিদার গিন্নির সায় ছিল। ওরা তো সব সাত ফুটের কাছাকাছি। গায়ের রঙ ও সোনার মতো। মেয়েদের চোখ পড়লে সেখানে জাত পাত উঠে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় সীমার বাবা মা এলো আমাদের বাড়িতে। মা ঘরে নিয়ে বসায়ে বললেন, সীমাকে আমি নিলাম। সীমার মাকে বললো, বোন তুমি একদম নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। আর কোন দ্বিধায় থেকো না। সীমার মা উঠে মাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

ঈদ পার করে আমি আর সীমা ঢাকায় চলে এলাম। উঠলাম ধীরেনের বাসায়। ধীরনের চাকরি পুলিশে। সীমার ফুফুর ছেলে ধীরেন। আমার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের সাথী। কবিরের থানার ফোন নম্বরটা আমার কাছে ছিল। সীমা চাইতেই ওটা দিলাম। আমরা ধীরেনের ওখানেই থাকছি। নাস্তা খাওয়ার পর সীমা বললো দাদা কাপড় পরো বাইরে যাবো। বের হলাম। মার ঐ কর্মকাণ্ডের পর সীমা যেন ভারি হয়ে গেছে। চঞ্চলতা থেমে গেছে। একটা টেলিফোনের দোকান দেখতেই রিকশা থামিয়ে বিদায় করে ফোনের দোকানে ঢুকলো। আমি ও ঢুকলাম। ও থানার নম্বরে ফোন

করতেই ও প্রান্ত থেকে ডিউটি অফিসার বললো, কাকে চাই? এএসআই খো. কবিরকে। কবির এসে ফোন ধরতেই, সীমা সালাম দিয়ে বললো, দাদা আমি সীমা বলছি। শুভ'র বোন। কুশল বিনিময়ের পর ও বললো, আগামীকাল রাতের ট্রেনে ও রওনা হবে। আমরা ঢাকাতেই।

এবার নিউমার্কেটে এসে আমার জন্য টুকিটাকি কেনাকাটা করলো। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জমজমাট করে রাখে। দেখতেও ভালো লাগে। সকাল সন্ধ্যা এলাকাটা প্রাণবন্ত থাকে। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক কর্নারে টেবিল ও বেছে নিল। কি খাবে? তোর যা ইচ্ছে। খেতে খেতে বললো, এসব জায়গা তো তোমার মুখস্থ। কতই না আড্ডা মেরেছো, কতজনের সাথে, সেসব মনে পড়েই বুঝি চুপ করে আছো। উল্টোটা বললাম আমি, হ্যাঁরে তোর কাছে কেউ প্রেম নিবেদন করে না? করে না আবার? মুখার্জি, চ্যাটার্জি, কুণ্ডু, মণ্ডল থেকে শুরু করে তোমাদের মোল্লা সৈয়দরা পর্যন্ত। আমাদের এক নবীন শিক্ষকও ফিস ফিস করতে চায়। বলে দিয়েছি আমার স্বামী আছে। অক্সফোর্ডে পিএইচডি করছে। অতএব জায়গা নেই। বললাম, তোর লজ্জা শরম নেই। মার ঐ কাণ্ডে তোর একটু না না করা উচিত ছিল। মনে যাই থাক। কি বললে, না না করবো? ঐ রকম একটা মুহূর্তের জন্যই আমার মন প্রাণ উন্মুখ হয়ে ছিল। আমি বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। জানো দাদা, কাকুকে সালাম করতেই উনি দাঁড়িয়ে মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন। আমার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মনে হল, কে যেন ভেতরটা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পরিষ্কার করে দিল। আমার ভিতরে নতুন এক আলোক আলো ছড়াতে লাগলো। কি যে ঘটলো, আমি বর্ণনা করতে পারছিনে। যাও বলতেই আমি ধীর পায়ে কাঁপতে কাঁপতে কাকীমার কাছে এলাম। তারপর ঐ কাণ্ড। বললাম, বাবা তোর জন্য দোয়া করলেন। আর সেই দোয়া সঙ্গে সঙ্গে খোদা কবুল করে ফেললেন।

বাবা আমার সাধু পুরুষ তার দোয়া খোদা ফেললেন না। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি কবুল করোনি? আমাকে টানছিস কেন ? ব্যাপারটা তোর, মার, আর বাবার। আমি তো থার্ড পার্সন। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি তোদের খেলা। খেলা ? তুমি খেলা দেখছো ? আমি গুরুভারে কাবু হয়ে যাচ্ছি। দায়িত্বের ভারে তোমার সাথে মিশতেও পারছিনে। তুমি স্বার্থপরের মতো হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছো। না না ঠাট্টা নয় দাদা কাকীমা

দুয়ার খুলে দেওয়াতে আনন্দে উড়া তো দূরের কথা একটা বিরাট দায়িত্ববোধ বুকে চেপে বসেছে। চল এবার উঠি। চলো। এবার সোনার দোকানে ঢুকলো। এখানে কি করতে এলি? এসো না! আমার কি কি লাগবে তোমাকে আগেই দেখিয়ে দেই। এটা সেটা দেখতে দেখতে এলো রিং এর কাছে। পছন্দ মতো মাপ মতো দুটো রিং কিনলো।

একটা আমার মাপের আর একটা ওর। আমার বাধা দেওয়ার সাহস হলো না। ও একটা ঘোরে চলছে। এর শেষ কোথায় ওকি জানে ? 'মনটা তার নিজের শরীরের ভিতরে আছে, না আর কাহারও কাছে জমা দিয়া আসিয়াছে।' শরৎবাবুর এই বাক্যটাই মনে এলো। বললাম, এবার কোথায়? চলো না যেদিকে দুচোখ যায়। দুপুরে বাইরেই খেয়ে নিলাম। বুঝলাম, সাঁঝের আগে ঘরে ফেরার ইচ্ছা নেই। বলতে লাগলো, তোমাদের সংসারে লোকজন কম কিন্তু এর আধিপত্য প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত। জমিজমা ধনদৌলত এসব বাদই দিলাম। সবাইকে একসূত্রে গেঁথে রেখে কর্তৃত্ব করা সোজা কথা নয়। না দাদা, আমি ডাক্তারি শেষ করে গ্রামে ফিরে যাবো। একটা ডাক্তার খানা খুলে নেবো। আর কাকীমার কাছ থেকে বৈষয়িক শক্তিগুলো শিখে নেবো। বললাম, দিদি ভাইয়েরটা তো নিলি এবার মায়েরগুলো মারার তালে আছিস। এই মারিফতের গুণগুলো কে শেখালো রে ? না, দাদা। আমি এসব ভাবিনি। ভাবছি! ভাবছিস সংসারে অপ্রতিদ্বন্দ্বি কত্রী হয়ে সবার উপর কি করে ছোটা ঘোরাবি।

ঘুরা ঘুরা, যত পারিস ঘুরা। এখন কোথায় যাবি বল ? চলো পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসি। বসে বললাম, হ্যাঁরে রিং দুটো বের কর। এই পড়ন্ত দুপুরে পরে ফেলি। না এখানে না, ধীরেনদা আর বৌদির সামনে। ওরা স্বাক্ষী থাক। বললাম, একেবারে পাকা ব্যবস্থা একটু এদিক ওদিক হলে, সোজা কোর্টে স্বাক্ষী সাবুদ নিয়ে হাজির। তাই তো! মেয়েদের শক্ত হতেই হবে। শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। তা না হলে, বুঝতেই তো পারো। না পারিনে রে, বললাম, কবিরকেও স্বাক্ষী রাখ। ও দারোগা মানুষ। ও সাথে থাকলে আমাকে ধরতে বেগ পেতে হবে না। ঠিক বলেছো দাদা। একদম ঠিক বলেছো। এটা আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু.....।

কিন্তু কি রে ? দেরি হয়ে যাবে। আমি তো দেরি করতে পারবো না। চিটাগাং গিয়ে কবিরদাকে বললেই হবে। তা হবে, তুমি দেখো আমি

বললেই উনি বিশ্বাস করবেন। আর তোমার সামনেই তো বলবো। বলিস.....। সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরলাম। সারাদিন ঘোরাঘুরিতে গা চিটচিট করছে। বাথরুমে ঢুকে প্রাণভরে শাওয়ারে গোসল করে ফেললাম। সীমাও দেখি গোসল করে নিয়েছে। রাতে খাওয়ার পরে ধীরেনের রুমে পাটি পেড়ে বসলাম। ধীরেনই বললো, আমি সব শুনেছি। সীমার ইচ্ছে, তোরা পরস্পর আংটি পরিয়ে দে। বলেই আংটি দুটো মেলে ধরলো। বললাম, একটু দাঁড়া, উঠে রুম থেকে মানিব্যাগ থেকে ১০০০ টাকা নিয়ে ধীরেনের হাতে দিলাম। ওর টাকার আংটি ওকে দিলে, ওকে অপমান করা হবে। ওটা পারবো না। তুই রাখ। ধীরেনের হাত থেকে সীমার মাপের রিং নিয়ে আঙুলে পরিয়ে দিলাম। ও আমারটা আমার আঙুলে পরিয়ে দিল। উঠে আমি আমার রুমে ঘুমোতে গেলাম।

পরদিন রাতে ধীরেন আর সীমা আমাকে ট্রেনে তুলে দিল। ভোরে স্টেশনে নামতেই দেখি কবির দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সি নিয়ে কলেজে এসে দেখি প্রায় সবাই এসে গেছে। বাকি যারা আজই এসে যাবে। সারাদিন ঘুমালাম। সন্ধ্যায় কবির এলে, খোশ গল্প শুরু হল। আমি জানি ও কি বলতে চায়। কি শুনতে চায়। সীমা কি বললো রে? তোমাকে ট্রেনে উঠানোর পর আবার ফোন করেছিল। যেন পৌঁছানোর খবরটা দেই। তোমার পরীক্ষা শেষ হলেই আসবে। শোন আমি কিন্তু ঝামেলা করতে পারবো না।

সাগর দেখাও, পাহাড় দেখাও, ওটা দেখাও, সেটা দেখাও, তোকে দেখাতে হবে। আমার কাজ আছে। না পারলে বলে দেবো আমরা এখানে নাই ট্যুরে। না দাদা তোমার কিছু করতে হবে না। আমি ছুটি নেবো। সব ম্যানেজ আমিই করবো। বললাম, আসার খবর তুই তো আগে পাবি? তবে এখানকার কেউ যেন না জানে। শুধু মনছুরকে আমি বলবো একদম শেষ দিনে। হাতে সময় নেই। ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ ঠিক হয় নাই এখনও। ট্যুরই আগে হল, পনের দিন সুন্দরবন ট্যুর করে আমরা ফিরে এলাম কলেজে। পরীক্ষা সামনে ক্লাস হালকা পাতলা। পড়াশুনার চাপ প্রচ ঁ। এখন কবিরের সাথে সীমার প্রতিনিয়ত কথা হয়। ওর কাছ থেকে খবর পাই। দাদা দিদি তো মেডিকেল ফাইনালে উঠে গেল। প্রাকটিক্যাল শেষ হলেই চিটাগাং। তোমার পরীক্ষা সামনে থাকবে। থাকুক। ওতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। মাসখানেক পরে একদিন কবির বললো, ওরা কাল পৌঁছাবে। হোটেল সুফিয়াতে একটা রুম ঠিক করেছি। বললাম, তিন

বেডের এক রুম, আর দুই বেডের একরুম ঠিক কর। অতো বেশি রুম লাগবে না। কবির ঠিক আছে বলে চলে গেল। এখন সে দারুণ ব্যস্ত। রাতে আমি কবিরের কাছে গিয়ে থাকলাম। ভোরে দুজন স্টেশনে গেলাম ওদের আনতে। ওদের নিয়ে হোটেলে উঠালাম।

ওরা ৪ জন। দুলালকে বললাম, সব ভালো তো রে। হ্যাঁ কাকা সব ভালো। খাবার দাবার রুমেই। সীমারা গোসল সেরে নিলে নাস্তা আনালাম। কবিরকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। সীমার মনে হল, কতদিনের চেনা। ওদের যা দেখানোর কবির দেখালো। বন গবেষণাগারসহ আমার কলেজ চত্বর ঘুরিয়ে এনেছে ও। দূর থেকে আমার রুমটাও দেখিয়েছে। পাইন গাছের সারিতে ঘেরা আমাদের কলেজ। আমি সময় দিতে পারিনে বলে সীমা উসখুস করে। কাকীমা বলেন, ওর পরীক্ষার শেষে এলেই ভালো করতি। রাঙামাটি কক্সবাজারটাও দেখা যেতো। প্রতি সন্ধ্যায় আমি আসি। দুই এক ঘণ্টা সময় কাটাই। আবার চলে যাই। কবির প্রাণভরে ওদের সেবা করছে। কাকা কবিরকে একটা টাকাও খরচ করতে দেয়নি। ইতোমধ্যে চেকটার কথা উঠলে কবির চেকটা সীমাকে দেখালো। কবির সীমাকে নমিনি করে লালদিঘির সোনালীতে আমার নামে একটা হিসেব খুলে ফেললো। চেক জমা হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় কাকা বললেন, এখান থেকে গিয়েই সেই লোকটার সাথে ভারত যাবো। যদি দামে দরে মেলে দিয়ে দেবো। বারবার এপার ওপার ঝামেলা। আমি চুপ করে আছি। তোমার তো আর দেরি নেই। ২/৩ মাস। বললাম, কাকা কি কি দেখলেন? সাগর, পাহাড়, মাজার, মন্দিরও দেখলাম। কবির বাটালী হিলটাও দেখা যেখানে সূর্যসেনের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল।

যেখানে প্রীতিলতা ওয়াদ্দের ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়ে ছিল। তুমি চলো না দাদা আজ। সব দেখালাম। দেখালাম ইংরেজদের ক্লাব। দেখালাম আমাদের মৃধা স্যার যেখানে বসে অফিস করতেন। দেখালাম রেলওয়ের হেড অফিস। আরো নানান জায়গা। রাতে ওদের ট্রেনে দিয়ে কলেজে চলে এলাম। কবির এলো না। সপ্তাহে একবার আসে। আসে খবর দিতে। সীমার সাথে জমে গেছে ওর। কবির এখন আর টাকা সাধে না। আমি নিজেই নিয়ে বলি, খাতায় লিখে রাখ। আমরা পরীক্ষায় বসে গেলাম। পরীক্ষার মাঝে গ্যাপ আছে। শেষ পরীক্ষা দিয়ে হল থেকে বেরুবো, খবর পেলাম থানা থেকে ফোন এসেছিল। কবির খুব অসুস্থ। আমি আর মনছুর

ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে থানায় গেলাম। একজন অফিসার আমাদের থানার ভেতরে নিয়ে গেল। বললো, ওর ডেড বডি আমরা বিকাল ৩ টায় দেশে রওনা করে দিয়েছি। জানাজা এখানেই হয়েছে। সকালে ডিউটি করে এসে ভিজা লুঙ্গি তার থেকে ধরতে গেলেই বিদ্যুৎ শকড করে। ঐ শকেই ও মারা যায়। বের হয়ে দেখি রুমটা তালা মারা। আমার পরীক্ষা শেষ হলে কত প্লান করে রেখেছি কি কি করবো। মনছুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। গভীর রাতে রুমে ফিরলাম দুজন। সবাই জেগে আমাদের কাছে খবর শোনার জন্য। ও ছিল সবার প্রিয়। সবার চোখে পানি। কেবল আমার চোখে পানি নাই। নীরব পাথর। পড়ে আছে ওর খাতা। ওর দেওয়া ছোট ছোট জিনিস। ফজরের নামাজে ওর জন্য দোয়া করলাম। নিজেকে মোটেই বুঝাতে পারছিনে। চোখের পলকে কী হয়ে গেল! বুকে পাথর চাপা দিয়ে সময় পার করছি। ভাইভা পরীক্ষা হল। বেজে উঠলো আমাদের বিদায়ের ঘণ্টা। চোখের জল ফেলে সবাই হোস্টেল ছাড়লাম। আমার আর মনছুরের একই পথ। আমরা এসে কবিরের রুমের সামনে দাঁড়ালাম। অনেক অফিসার আমাদের চিনতেন। আমরা বললাম, আজ আমরা চিটাগাং ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ওর রুমটা একটু শেষবারের মতো দেখতে চাই। ওসি সাহেব নিজে রুমের তালা খুলে দিলে আমরা জুতো খুলে ভিতরে ঢুকলাম। সেই খাট, আল্না সেই মরণ তার। বুকটা হা হা করে উঠলো। খাটের পরে আমরা দুজন কাঁদতে লাগলাম। ওসি সাহেব আমাদের তুলে বের করে আনলেন। একজন বললেন, সীমা নামের একটা মেয়ে ফোন করতো। তাকে বলে দিয়েছি কবির এখানে নেই। অন্যত্র বদলি হয়ে গেছে। বললাম, ভালো করেছেন। ওসি সাহেব জানালেন এই দো-চালা ঘর আর থাকবে না। এখানে বিল্ডিং হবে। বললাম, তাই ভালো। আপনারা বনের অফিসার। চিটাগাং তো বনেরই জায়গা। যদি এদিকে পোস্টিং হয়, মাঝে মাঝে আসবেন। টিকেট কেটে ট্রেনে উঠে পড়লাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। বিদায় চট্টগ্রাম। প্রায় ছত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। বহুবার গেছি চিটাগাং, কোতয়ালির দিকে তাকাইনি। সবই আছে আজও। নেই কবির। আমার হৃদয়ের গহীনে বসে আছে আজও। প্রায়ই বলতো, দাদা সবাই কেমন আছে? সেই হিসেবের খাতা আজও আছে। দেনা তার শোধ করা হয়নি। হয়তো এ জীবনে হবে না। কাকে দিয়ে শোধ করবো। তার ঠিকানাও জানিনে ওটা মাথায় নিয়েই চলে যেতে হবে। পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে

তারা চায় না, শুধু দিয়েই যায়। ঐ জাতের ধাতের মানুষ ছিল সে। আজও যোগাযোগ আছে ওর ছোট ভাই হাবিবের সাথে। এই টুকুই ধরে রেখেছি। খোদা ওকে একটা বড় বেহেশত দাও।

লেখকের সাথে (ডানে) মুক্তিযোদ্ধা কবির (বামে)

বি.দ্র. গল্পের কবিরের ঘটনা সত্য। কিন্তু সীমা চরিত্র কাল্পনিক।

ভারতের মাটিতে কিছু অল্প মধুর ঘটনা

॥ এক ॥

কল্যাণী স্টেশনে নেমে আমরা পাঁচজন হাঁটছি আর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছি মুক্তিবাহিনীর জন্য কল্যাণী ক্যাম্পটা কোথায়? কেউ বলছে সামনে যান, কেউ বলছে দাদা বলতে পারছি না। আমরা পাঁচজন হলাম আমি, মতিন, সাহা খাঁ, ইন্তাজ আর হোসেন মোল্লা। একজন বললো কল্যাণী ভার্সিটির কাছে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করুন। ভাবলাম, ভার্সিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ওখানে আগে যাই তারপরে দেখা যাবে। বেলা ঠিক মধ্যাহ্ন। পেটে ক্ষিদে থাকলেও করার কিছু নেই। আমরা হাঁটছি, হঠাৎ বামে তাকিয়ে দেখি আমারই বয়সের একটা ছেলে আমাদের দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে আছে। ওর পিছনে একটা দোচালা ছনের ঘর দরজায় পুরোন কাপড়ের পর্দা টানানো। ও হাতের কাজ ফেলে আমাদের দিকে ছুটে এসে বললো, সামছু তুই ? বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি বললাম, ভরত তুই এখানে ? আমি আর ভরত হাবাসপুর হাইস্কুলের ছাত্র। আমার এক ক্লাস নীচে পড়তো। খেলার মাঠে আমরা গলায় গলায় বন্ধু। মতিন ও সাহা খাঁ ওকে চেনে। ও হাত ধরে ওর ঘরের কাছে নিয়ে গেল। বললো, ভারতে চলে আসার পর, কোন কাজকর্ম না পেয়ে এখানে হোটেলের ব্যবসা শুরু করেছি। ও বারবার দেশের অবস্থা জানতে চাইলে আমরাও বলে চললাম। আমরা ওটাকে জানতাম হরে শা এর বাড়ি। এই হরে শা বোধহয় ওদের দাদু বা কাকু হতেন। আজও যে বিল্ডিং খাড়া আছে তা ব্রিটিশ আমলে তৈরি। এক সময় সাহাদের জমজমাট ব্যবসা বাণিজ্য ছিল। আজ ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বাড়িটার দিকে প্রাণ ফেলে তাকাই। ভরত আমার আজও মনের মধ্যে আছে।

আগে আমরা এই পথ দিয়ে চলাফেরা করতাম না। নানাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াত করতাম। আজ ভরতদের বাড়ির পাশের পথই মেইন পথ। পাকা পথ, যে পথে এক সময় হেঁটে যাওয়া যেত না আজ সে পথে বাস চলে। আমাকে পেয়ে ভরত আবেগে কাতর। কি করবে ঠিক পাচ্ছে না। বললো, তোরা টিউবওয়েল থেকে হাতমুখ ধুয়ে আয় আমি তোদের একবেলা ভাত খাওয়াবো। তোদের একবেলা না খাওয়াতে পারলে এ কষ্ট

আমার সারাজীবনেও যাবে না। এটা তো আমার জন্মভূমি নয়। ঠেলায় চলে এসেছি। সারাক্ষণ মন পড়ে থাকে হাবাসপুরে, পাংশাতে। রাতে শুতে গেলেই জন্মভূমি আমাকে চেপে ধরে। সময় সময় মনে হয়, ফিরে যাই। একটা কিছু জুটবেই। নানা বাঁধনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি রে! আমাদেরও ক্ষিদে পেয়েছে। একসাথে বড় হয়েছি। আর এখানে আমাদের কেই বা আছে ? ওর হোটেলে খাওয়াও বেঞ্চে, বসাও বেঞ্চে। আমরা আনন্দের সঙ্গে খাচ্ছি। আর ওর কথা শুনছি, প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। খাওয়া মাঝপথে প্রায়, এমন সময় পর্দা ফাঁক করে এক সাধু ঢুকলো। আমাদের এক পলক দেখে নিল। সাধুর পরণে গেরুয়া বসন। গায়েও তাই। মাথার চুল মাঝখানে চুড়ো করা। হাতে ত্রিশুল, আর একহাতে লোটা। কপালে হাতে রঙ বেরঙের তিলক কাটা। গায়ের রঙটা ফর্সার কাছাকাছি। যাহোক দেখতে ভালোই লাগছে। ভাত হবে রে ? ভরত বললো, হবে বসেন। সাধুটা হাতমুখ ধুয়ে এসে আমাদের পাশে রাখা একটা বেঞ্চে বসে পড়লো। ভরত তাকে ভাত তরকারি দিল। এই ভরত হলো হাবাসপুর তিন রাস্তার মোড়ে যে বাজার বসে সেখানে অবস্থিত বিল্ডিংওয়ালা বাড়িটার ছেলে।

কিছু গ্রাস মুখে দেওয়ার পর আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কোথাকার ? বললাম, আমরা জয় বাংলার। এপারে চলে এসেছি। ও প্রথম ভেবেছিল আমরা হিন্দু। তাই অনেক দরদ দিয়ে কথা বলছিল। কথায় কথায় আমাদের পরিচয় পেয়ে ভাতের প্লেটটা ধপাস করে মেঝেতে ছুঁড়ে মেরে বললো, এই শুয়োরের বাচ্চা তুই নেড়েদের সাথে আমার খেতে দিলি কেন ? পায়ের খড়ম খুলে ভরতকে মারে আর কি ? আর মুখে যা আসে তাই বলে গালাগালি দিচ্ছে। আর আমাদের দিকে কড়মড় করে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছুটেও আসছে। ভরত হাতজোড় করে মাপ চাচ্ছে। আর কি যেন বলার চেষ্টা করছে। সাধু হোটেলের মধ্যে আকাশ পাতাল ঝড় তুলেছে। আমরা এটো হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সবাই বোবা হয়ে গেছি। সাধু একবার ভরতের বেঞ্চে লাথি মারে আবার মারে পাতিলের উপর। কুরুক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছে হোটেলটা সাধু। ভরতের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এমন সময় পর্দা ফাঁক করে একটা ইয়ং ছেলে ঢুকে সোজা ভরতকে জিজ্ঞাসা করলো কী হয়েছে রে ভরত ? ভরত চুপ। ছেলেটা আমাদের দিকে একবার তাকালো। বিশেষ করে আমার দিকে। আমার মনে হল ছেলেটা ছাত্র। পা থেকে চপ্পল খুলে সাধুর পাছায় দমাদম

বাড়ি শুরু করলো। শালা, পর্দার ওপাশ থেকে আমি সব শুনেছি। হারামজাদা পাকিস্তানের চর, দাঙ্গা সৃষ্টি করতে চাস তুই। মুখ দিয়ে বলছে আর হাত চলছে আরও দ্রুত। বাড়ির চোটে সাধু দিশেহারা।

কোথায় গেল ত্রিশুল আর কোথায় গেল লোটা ? আমি আমার সহজাত ধর্মে গোলকধাঁধা কাটিয়েই ছেলেটাকে জাপটে ধরলাম। ধরলাম বেশ জোরেই। ছেলেটা আমার কাছ থেকে ছুটতে পারলো না। এই সুযোগে সাধু এক দৌড়ে রাস্তায়। পরে ছেলেটাও আমাকে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সাধুকে দাবড়ানো শুরু করলো। সাধু পিছনে তাকায় আর দৌড়ায়। পরে একটানা দৌড়। মাথার চুড়ো খুলে গেছে। গেরুয়া বসন ধ্বস্তাধ্বস্তিতে বেহাল দশা হয়ে গেছে। ছেলেটি কিছুক্ষণ পর আমাদের কাছে ফিরে এসে হাতজোড় করে বললো, 'আমি মাফ চাচ্ছি আপনাদের কাছে। ওর জ্বালায় আপনারা খেতে পারেন নাই। এবার আমি আপনাদের খাওয়াবো। এতে আমার মন খুশি হবে। আপনারা না থামালে ওকে আমি ন্যাংটা করে দেখাতাম ও কী জাত ! ভরত খাবার দে আমাদের।' আমি বললাম, দাদা আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন খাবার আবার দিলে খেতে পারবো না। আপনি খেয়ে নিন। আমরা আপনার সাথে চা আর সিগারেট খাবো।'

ছেলেটা আমার কথায় খুশি হল। খেতে খেতে বললো, আমি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের থার্ড ইয়ারের ছাত্র। দুপুরের খাবারটা প্রায়ই এখানেই খাই। সস্তা আবার কাছেও। ভরত একেবারে দেশি খাবার খাওয়ায়। ভরত আমার বড় ভাইয়ের মতো। আমাদের সাথে ভরতের কী সম্পর্ক তা আমি বললাম।তাই না কী ? ভরত চা আর সিগারেট আন্ ভাই। বলেই ত্রিশ রুপি ওকে দিল। ইতিমধ্যে আমরা হারানো জোর ফিরে পেয়েছি। বুঝলাম ছাত্রের কোনজাত নাই। মানবতারও কোন জাত নাই। যেখানে অন্যায় সেখানেই এরা সোচ্চার প্রতিবাদী। এদের দেশ নাই, কাল নাই, পাত্র নাই। ওরা বিধাতার মতো সর্বখানে। সর্বযুগে ঘুরে বেড়ায়। আমি বললাম, আমার লেখাপড়াশেষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স। ওরা কেউ উচ্চ মাধ্যমিক, কেউ মাধ্যমিক পাশ করে নানা কাজে ব্যস্ত। পাকবাহিনীর অত্যাচারে ঘরবাড়ি, মা-বাপ ভাইবোন ফেলে ঘর ছেড়েছি। অস্ত্র জোগাড় করতে এদেশে আসা।

চা খাচ্ছি, সিগারেট খাচ্ছি। বললাম, দাদা বলতে পারেন এখানে মুক্তিবাহিনীর জন্য ক্যাম্প কোথায় খোলা হয়েছে ? বেলা পড়ে গেছে। দিনে না পৌছাতে পারলে কী যে হবে ? 'আসুন আমার সাথে। বলেই ছেলেটা উঠলো। আমরাও উঠলাম। সাত আট মিনিটের পথ। হেঁটেই আমরা ক্যাম্পে এসে গেলাম। এবার ছেলেটা বললো দাদা আসি। আমরা হাত বাড়িয়ে বিদায় দিলাম। বললাম, আপনার কথা আমাদের আজীবন মনে থাকবে। মাঝে মাঝে এখানে আসবেন। আপনারাই আমাদের অনুপ্রেরণা। বিদেশ ভুঁইয়ে আপনারা পাশে দাঁড়ালে আমরা দেশ স্বাধীন করবোই। সাধুকে আপনি ক্ষমা করে দেবেন আর ভরতকে দেখবেন। ছেলেটি খুশির সাথে হাসি মুখে বিদায় নিল। সেই হাসিমুখটা আজও চোখের সামনে ভাসে। নামটা বোধহয় পরেশ ম ল।

॥ দুই ॥

কল্যাণীতে খাইদাই পিটি করি। রবিবার ছুটির দিন। শুক্রবারেও হালকা অবসর মেলে। এখানে পাংশা রাজবাড়ির ছেলেদের আধিপত্য বেশি। এরা সংখ্যায়ও বেশি। ছুটির বিকালগুলো আমাদের এদিকওদিক ঘুরে ঘুরে কাটে। হেঁটে হেঁটে কল্যাণী শহরে গিয়েও আমরা আড্ডা মারি। যারা পূর্ব বাংলা থেকে এসেছে তারাই আমাদের বেশি খাতির করে। তারা ফেলে আসা স্মৃতিচারণ করে। মুহূর্তে ওদের মন চলে যায় ফেলে আসা গ্রামটিতে, শহরটিতে। বাড়িঘর, পুকুর, নদ-নদী, খাল, বিল গাছপালা ওদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফেলে আসা স্কুল, কলেজ বন্ধু-বান্ধবদের জন্য প্রাণ কাঁদে। বলে কী যে হয়ে গেল। বুঝতেই পারলাম না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দেশটা স্বাধীন হলে বেড়াতে যাবো। দেখে আসবো কেমন আছে আমার গ্রামটা। ছুটির একদিন মতিনকে বললাম, চল আজ গ্রামের দিকে বেড়াতে যাই। দেখে আসি এদেশের মাঠঘাট প্রান্তর কেমন? আমাদের ক্যাম্প থেকে একটু উত্তরে এগিয়েই একটা কাচা রাস্তা চলে গেছে পশ্চিমের গ্রামের দিকে। আমি, মতিন, সাহা খাঁ সেই পথটাই ধরলাম। বিকেল বেলা রাস্তাটা নির্জন হয়ে গেছে। খেত-খামার অবিকল আমাদেরই মতো। বেশ দূরে দেখলাম কিছু বাছুর চরছে। আমরা প্রায় গরু ছাগলের কাছে চলে এসেছি। ভাবলাম, ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আর এগুনো যাবে না। হঠাৎ বায়ে দেখি ধুতি পরা একটা লোক হাতে ধারালো হেসো দিয়ে একটি লাঠি

চাছতে চাছতে আমাদের দিকে বের হয়ে এলো। গা খালি। মাজায় গামছা বাঁধা। ওর বয়স ৫০ এর কাছাকাছি। কাছে এসে বললো, আপনারা কোথায় যাবেন ? বললাম, আমরা জয়বাংলার মানুষ। একটু ঘুরতে বেরিয়েছি। আসেন কথা বলি। আমরা ওকে নিয়ে রাস্তায় দুবলার ঘাসের উপর বসে পড়লাম। আমরা ওকে একটা সিগারেট দিলাম। আমরাও একটা ধরালাম। ঐ লোকটাই গল্প শুরু করলো। জানেন দাদা আমরাও পূর্ব বাংলার মানুষ।

পাবনার সুজানগর থানার কোন এক গ্রামের কথা বললো। শালার নেড়ের জ্বালায় থাকতে পারলাম না। জমিজমা পানির দামে বেচে চলে আসতে হল। শুনছি কল্যাণী নাকি নেড়েদের ঘাটি হয়েছে। আমরাও তক্কে তক্কে আছি। সুযোগ বুঝে এমন হামলা চালাবো। সবাইকে কচুকাটা করে ফেলবো। আমি সজাগ হয়ে গেলাম। বললাম, হ দাদা নেড়েরা আমাদের সব নিয়ে গেছে। আমাদের মা বাবা ভাইবোন শরণার্থী এ শিবিরে উঠেছে। আমরা উঠেছি অন্যান্য আত্মীয়ের কাছে সব ফেলে এসেছি কিছুই আনতে পারি নাই। তবে এবার দাদা বাঙালি নেড়েরা আমাদের কিছু বলে নাই। অবাঙালি আর পাকিস্তানি সেনারা আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, মেরে ফেলেছে। ওদের ঠেলায় নেড়েরাও দেশ ছেড়েছে। লোকটা মাথা ঝাকায়ে আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করলো। ঐ নেড়েরা কোথায় ? বললাম, ওরাও শিবিরে। ঐ শিবিরেই তো খুঁজবো হেই হালাদের যারা আমাদের সব কেড়ে নিয়েছিল। বুঝলাম, লোকটা অবাঙালি। পাকিস্তানি সৈন্য বুঝে না। বোঝে সেই সব লোককে যারা তাদের ঘরছাড়া করেছিল। দেখছো এই হেসো। ঐসব শালারে কোপায়ে কোপায়ে মেরে ফেলবো। রাইফেল বন্দুক লাগবে না। সন্ধ্যা প্রায় নেমে এসেছে, আর একটা সিগারেট দিয়ে বললাম, দাদা উঠি। আবার আসবো। আমরা সামনে বেশ কিছু কদম চলে আসার পর ঐ লোকটা আমাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো, দাদা আপনাদের নাম তো জানলাম না। হাঁটতে হাঁটতে বললাম, যতিন, সুরেন আর দ্যাংকুরে। ওদের বললাম, জোরে হাঁট, নেড়ে জানতে পারলে ঐ হেসো দিয়েই আমাদের কেটে ফেলবে। চিৎকার করে মানুষ জোগাড় করে আনবে। ও একটা পাকা নমোশুদ্র। আমাদের বাড়ির কাছের সুরীন নমদের মতো। আমরা ওর নাগালের বাইরে এলাম।

ঐ মানুষটা হয়তো লেখাপড়া জানে না। পূর্ববাংলায় ওদের জমিজমা পুকুর

গরু, বাছুর, বাগান সবই ছিল। একজন গৃহস্থ পরিবারে যা যা থাকলে সংসারটা পরিপূর্ণ সে সবের ওরা মালিক ছিল। ছিল নিকটজন, আত্মীয় স্বজন আরো ছিল পালাপার্বনে আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাওয়া। ছিল জন্ম মাটিতে প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়া। পরিণত বয়সে আত্মীয় স্বজনদের কাধে চড়ে শ্মশানে যাওয়া কি কম আনন্দের ? জীবনের এইভাবে সমাপ্তিতেই তো সুখ। ও এখানে এসে গরু চরাচ্ছে। কার গরু চরাচ্ছে কে জানে ? হয়তো পরের বাড়ি কামলা খাটে। রাতে শুয়ে শুয়ে ফেলে আসা সুখের কথা ভাবে। ওর তো মেজাজ খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক, ওতো প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। আমিও কি এই পোড়া চোখে কম দেখেছি কেমন করে আমাদের এলাকার হিন্দু গ্রামগুলো উজার হয়ে গেল ?

যদি বাংলা ভাগ না হতো। দেশ বিভাগ না হতো ধর্মকে ব্যবহার করে কেউ যদি কারোর উপর ঝাপিয়ে না পড়তো। তাহলে এমনটি হতো না। বাংলা দ্বিখন্ডিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায়নি। বিচ্ছেদ বেদনা আজও রয়ে গেছে। ফেলে আসা অতীত আজও ছায়ার মতো তাদের পিছে পিছে হাঁটে। যদি বেড়াটা আরো সহজ করে দিতো। কতই না ভালো হতো। শিকড় ছেড়ে কোথাও বাধ্য হয়ে চলে যাওয়া যে কত কষ্টের। তা যারা গেছে তারাই বেশি বুঝে। আমি অতুল মল্লকে দোষ দিতে পারলাম না। চাষবাস যার একমাত্র অবলম্বন ছিল।

তা হারিয়ে সে মাঠে মাঠে পরের গরু চরাচ্ছে। ফেলে আসা তার জন্মভূমিকে স্মরণ করে গোখরা সাপের মতো ফুসছে। একদিন ফোস ফোসানি কমে যাবে। শরীর যেদিন ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ওতো গরু চরাচ্ছে। ওর পরিবার। ছেলেমেয়েরা কী করছে। হয়তো পরের বাড়ি কাজ করছে। মেয়েরাও হয়তো কাজে বা অকাজে লেগে পেট চালাচ্ছে। এসব জ্বালা যদি অতুলের থাকে চোখের সামনে এসব সইবে কী করে ? ওর জন্য আমার মনটা টনটন করতে লাগলো। কোন যাদুর বলে যদি ওকে ফেলে আসা সুখের সংসারে নিয়ে বসিয়ে দিতে পারতাম। আমি খুব খুশি হতাম। তা তো হবার নয়। যা গেছে তা আজ স্মৃতি। ঐ স্মৃতি নিয়েই ওকে শ্মশানে উঠতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেছে। আমরাও কল্যাণী ক্যাম্পে পৌঁছে গেছি। আজও অতুলের মুখটা আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে তার হেসো ঝাকানোর কথা। মনে পড়ে তার দাঁতে দাঁত রেখে কথা বলার কথা। যখন সিগারেট দিলাম তখনকার চোখের জলে ভরা শান্ত মুখের কথা। আমার ভাবতে

ইচ্ছে করে আমার পরিচিত জন যারা চলে গেছে তারা কেমন আছে ? কেউবা উঠে গেছে। কেউ বা তলিয়ে গেছে। সবার জন্য আমার প্রার্থনা। ওরা ভালো থাকুক।

॥ তিন ॥

আজকে হাবাসপুর কায়েম ডাক্তারের ছেলেরা যে বাড়িতে বাস করছে সেই বাড়িটা ছিল কালাদের। কালা, নির্মল, ও শিবু। তিন ভাই। শিবু সবার ছোট। কালা ও নির্মল আমাদের উপরে পড়তো। শিবু আমার দুই ক্লাস নীচে। কৈশরে যৌবনে এবং আজও আমার নানা বাড়ি জিয়ালগাড়ি যেতে হলে ঐ বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়। সেকালেও গিয়েছি। একালেও মাঝে মাঝে যাই। যখনই ঐ বাড়িটার সামনে দিয়ে যাই, মনে পড়ে শিবুর কথা। কেন মনে পড়ে সেই কথাই বলছি।

১৯৬৯ এ আমি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে বিএসসির পরীক্ষার্থী। আমি আর মনজু চৌরঙ্গি বিল্ডিং এর দোতালায় এক রুমে থাকি। মনজু হল পাংশা জর্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বড় ছেলে। ওকে চাচা বলেই ডাকি। সেও পরীক্ষার্থী, আমার সাথে সম্পর্কটা বন্ধুর মতো?। শীতকালের এক সকালে আমার রুমের পশ্চিম বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছি। দেখি ঠিক নীচের পাকা রাস্তা দিয়ে শিবু দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে হেঁটে যাচ্ছে। অর্থাৎ সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের দিকে। এই শিবু তুই এত সকালে কই যাচ্ছিস? ও ডাক শুনে আমার দিকে তাকালো। বললো, দাদা আপনি এখানে থাকেন ! বললাম হ। বললাম উঠে আয় কথা বলি। ও প্রথম দোমনা করতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এলো। মনজুর সিটে বসলো। মনজু বাড়ি গেছে, সিট খালি। ও এইটুকু উঠতেই হাঁপাচ্ছে। চোখমুখ গর্তে ঢুকে গেছে। বললাম, তোর কী হয়েছে রে! শিবু চাদরটা ফেলে দেখালো ডান হাতের বোগলের তলে বিরাট ফোঁড়া। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিছু খেয়েছিস ? ও উত্তর দিল না। বললাম তুই শুয়ে একটু বিশ্রাম নে। আমি বোয়াকে দিয়ে পরাটা ভাজি ডাল আনায়ে একসাথে নাস্তা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তার দেখাসনি ? ও দুই দিকে মাথা নাড়ালো। বলল কোনো টাকা নেই হাতে। তুই থাকিস কোথায় রে ? দূরে হিন্দুদের এক আশ্রমে। কয়েক দিনের মধ্যে সেটাও ছেড়ে দিতে হবে। কেন রে ? ওরা আর চালাতে পারছে না। ফান্ড নেই। শিবু চুপচাপ স্বভাবের

মানুষ। ও ঘুমিয়ে পড়লে আমিও ওকে ডাকলাম না। ভাবলাম ওকে নিয়ে কী করি ? হঠাৎ মনে পড়লো আমাদের কলেজের এমবিবিএস ডাক্তার আছেন। প্রত্যেকদিন বিকালে ছাত্রদের ফ্রি রুগি দেখেন। তার বেতন ভাতাদিও কলেজ বহন করে। স্যারের চেম্বার আমি চিনি। শিবু ঘুম থেকে উঠে বললো, দাদা যাই। কোথায় যাবিরে ? ও কোন উত্তর দেয় না। বললাম তুই দুপুরে আমার এখানে খাওয়া দাওয়া কর। বিকেলে তোকে ঐ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো। ও আমার কথা শুনলো। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নাম মাত্র খেলো। আবার শুয়ে পড়লো। ওকে নিয়ে একটু আগে আগেই ডাক্তারের কাছে গেলাম। স্যার আসা মাত্র আমরা রুমে ঢুকে পড়লাম। স্যার দেখে বললেন, যদি ওষুধে বসে যায় তো ভালোই। না হলে আপারেশন করাতে হবে। স্যার প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। আগামীকাল আসতে বললেন। ওর কাছে টাকা নেই। আমার টাকায় ওষুধ কিনে দিলাম। ও বললো, দাদা রাতটা এখানেই থাকি। একা কোথাও যেতে পারবো না। বললাম তোর যাওয়ার দরকার নেই। এখানেই ঘুমো। একরাতেই ওষুধ খেয়ে ওর জ্বর চলে গেল। ব্যথাও কমে গেল। ফোঁড়াও ভিতরমুখি হল। নাস্তা খেয়ে ও ওর আস্তানায় চলে গেল। বলল, দাদা বিকেলে আসবো। আপনি কোথাও যাবেন না। ও এলো ঠিক বিকেলে। ওকে নিয়ে আবার ডাক্তার স্যারের কাছে গেলাম।

স্যার দেখে বললেন মনে হচ্ছে ওষুধে যাবে। অপারেশন লাগবে না। স্যার আর একটা প্রেসক্রিপশন করে দিলেন। আজও ওষুধটা আমি কিনে দিলাম। ও বলল, দাদা আমি আজও এখানে থাকবো। বললাম থাক সিট খালি আছে। মনজু কবে আসে তার ঠিক নেই। ও গেলে আর সহজে ফেরে না। বুয়াকে ডেকে মিল দিতে বললাম। ও এখন অনেকটা ভালো ব্যথা কমে গেছে। জ্বর বন্ধ হয়েছে, গোসল করে অনেক সতেজ হয়েছে। রাতে আমাকে বলল, দাদা আগামীকাল বেডিং পত্র নিয়ে বাড়ি চলে যাবো। ওখানে আর থাকা যাবে না। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। চেয়েচিন্তে ফরম ফিল আপ করেছি। পরীক্ষা দেওয়াও হবে না। আমাকে পাঁচটা টাকা দিলে বাড়ি যেতে পারবো। দাদা আমাকে আর টাকা দেবে না। বাপ নাই, কালীদা বড়, সেই গার্ডিয়ান। ওর প্রতি মায়া হল। মনে মনে ভাবলাম আমাদের দুজনের রুমে তিনজন অনায়াসে থাকা যাবে। এদিক না হয় মনজুকে বলে ম্যানেজ করে নেবো। কিন্তু খাওয়া দাওয়া ? আমারও কোনো

মতে চলে। মনজুর আমার চাইতে ভালো চলে। ওর জন্য কিছু একটা করতে হবে। পরীক্ষার দোরগোড়ায় এসে যদি পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়, ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তোর পড়াশুনার খবর কি ? দাদা পরীক্ষা দিলে পাশ করবো। কষ্ট করে পরীক্ষার পড়া এগিয়ে রেখেছি। টেস্টেও ভালো নম্বর আছে। বললাম, তুই এক কাজ কর।

তোর ওখানে যা যা আছে কাল সব এখানে নিয়ে আয়। মনজু আসুক দেখি তোর জন্য কি করতে পারি। সকালে ওকে নাস্তা দিলাম। বলে দিলাম, দুপুরে তোর পাক হবে। তার আগেই চলে আসিস। ও দুপুরের আগেই এলো। বইপত্র ছোট একটা বিছানা। একটা স্টোভ। আর নিজের কাপড় চোপড়। বললাম, সুন্দর করে গোছগাছ করে রাখ। আমার সিটে তুই ঘুমাবি। আমি মনজুর খাটে। বললাম শিবু তুই জাতে হিন্দু আমরা নেড়ে। আমাদের মেসে মাঝে মাঝে গরুর মাংস পাক হয়। যা তোদের জন্য তোদের ধর্ম বারণ করে খেতে। আমার কাছে থেকে জাত খোয়াবি নাকি! ও বললো, দাদা এসব রুচির ব্যাপার সময় হলে দেখা যাবে। সকালের নাস্তা দোকান থেকে কিনে খাই। শিবু আমার নাস্তা কেনা বন্ধ করে দিল। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চাল ডাল তেল পিয়াজ ইত্যাদি কিনে এনে বললো সকালে আমিই পাকাবো এখন থেকে। দাদা আমি মোটামুটি রাঁধতে জানি। কয়েকদিন পর মনজু এলে সব ঘটনা ওকে বললাম।

আমরা তো মিটিং মিছিল নিয়ে প্রায়ই বাইরে থাকি। পরীক্ষায় এবার পাশ হবে না মনে হয়। শিবু যদি পাক করে তো করুক। আমাদের সকালের নাস্তার খরচে এভাবে আমাদের একমাস চলে যাবে। আমরা এখন আর বাইরের নাস্তা খাইনে। আমরাও মাঝে মাঝে শিবুর সাথে হাত লাগাই। মনজু এসব পারে না। এসেই বলে, শিবু হল। মেস ম্যানেজার মহিউদ্দিন সাহেবকে শিবুর ঘটনা খুলে বললাম। উনি ভদ্রলোক। ভিতরে একটা দামি মন আছে। উনি বললেন, শুধু তোমাদের মিলের দামটা দিও। শিবুরটা দিতে হবে না। আমি কায়দা করে চালিয়ে নেবো। আমি আর মনজু কায়দা করে আমাদের বিলের সাথে কিছু টাকা বেশি দিয়ে দিলাম। মহিউদ্দিন সাহেব এতেই খুশি। শিবুকে ডেকে বললেন, শিবু মন দিয়ে পড়ো। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। এমনি করতে করতে শিবুর পরীক্ষা এসে গেল। যেদিন ওর পরীক্ষা থাকে সেদিন আমরা পাক করি। কোন কোন দিন তিনজনের মিল বন্ধ করে দিয়ে নিজেরাই পাকে চলে যাই। এমনি করেই

শিবুর পরীক্ষা শেষ হল। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের পরীক্ষা শুরু হবে। শিবুকে বললাম, তুই বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। আমাদের পরীক্ষার সময় তোকে একটু পাকে সাহায্য করতে হবে। ওর যাওয়ার টাকাও আমি আর মনজু দিয়ে দিলাম। ও যে গেল আর ফেরে না। সব জিনিসপত্র এখানেই পড়ে আছে। ভাবলাম অসুখ বিসুখ হল নাকি ! আমাদের পরীক্ষার সপ্তাহখানেক আগে ও এলো। বললো, কালাদা আমাকে সব নিয়ে বাড়ি যেতে বলেছে। আমি আর মনজু হতবাক। বললাম যা। দরকার থাকলে তো যেতেই হবে।

আমরা প্রাকটিকাল শেষে ফিরে দেখি ওর গোছগাছ শেষ। এখনই রওনা হবে। স্টোভটাও নিয়ে যাচ্ছে। ওকে বললাম, তোর স্টোভটা আমাদের আপাতত ধার দে। আমাদের পরীক্ষা শেষ হলে ওটা তোর বাড়ি আমি নিজে পৌঁছে দেবো। ও শুধু বললো, কালাদা আমাকে বকবে। ওর কথা শুনে রক্ত মাথায় উঠে গেল। বেরো শালার মালাউন। নিমক হারাম কোথাকার। ৪ মাস তোকে পুষেছি। তোর একটা টাকাও খরচ করতে দেইনি। সব টাকা দিয়ে এখান থেকে পা বাড়াবি। মনজু হিসেব করতো কত টাকা হয়। ওকে কিচ্ছু নিতে দেবো না। বেরো এখান থেকে। মনজু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, শিবু তুই যা। তোর স্টোভ আমাদের লাগবে না। আমি রাগে দুঃখে অপমানে সিগারেট ধরায়ে বের হয়ে গেলাম। সারাদিন আর রুমে ফিরিনি। রাতেও ফিরলাম না। বন্ধু আ. হাইয়ের মেসে রাত কাটিয়ে পরদিন দুপুরে ফিরলাম। এসে দেখি রুম তালা মারা। খুলে দেখি শিবু সব নিয়ে চলে গেছে। মনজুর কোন হদিস পেলাম না। সন্ধ্যা বাদ মনজু এলো। বললো, তোকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান কোথায় ছিলি সারারাত? বললাম সহপাঠি হাইয়ের মেসে। শিবুর কথা আমি ঘৃণায় তুললাম না। মনজুই তুললো। বললো, শিবু আমাদের মতো নয়। বড় ভাইয়ের তাবেদারে থাকে। তাই তাকে প্রচ ভয় করে। খারাপ ছেলে নয় সে। যাওয়ার সময় চোখের পানি ফেলে গেছে। আমি যাওয়ার ভাড়াটাও দিয়ে দিয়েছি। বললাম, ভালোই করেছিস। এবার হাত খরচের টাকা পাঠা। ইতোমধ্যে হঠাৎ করে বাড়ি গেলাম। বাড়ি গেলেই হাবাসপুর বাজারে যাই। সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা মেরে ঘরে ফিরি। সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়। ভালোই লাগে। একদিন সকালে রুমে বসে পরীক্ষার পড়া পড়ছি। এমন সময় শিবু এসে হাজির। আমার চৌকির পরই বসে পড়লো। বললাম,

আবার কী চাস ? বলল, দুই দিন ধরে আপনাকে স্কুলের মাঠে দেখছি। দেখা করতে সাহস পাইনি। আজ ভয় ভেঙে দেখা করতে এলাম। কি জন্য এলি বল ? তোর প্রয়োজন শেষ। আবার নতুন কিছু কী ? বাড়িতে কী করিস ? খাই দাই ঘুরে বেড়াই। বললাম, তুই যা। আমার সাথে তোর কোন সম্পর্ক নেই। তুই আমার সামনে আসিস নে। মা রুমে ঢুকেই বলল, 'তুই শিবুর সাথে ও রকম ব্যবহার করছিস কেন ? দেখ তো ও কাঁদো কাঁদো ভাবে বসে আছে। মা, আমাদের মুড়ি গুড়ের নাস্তা দিল। মায়ের পীড়াপিড়িতে শিবু নাস্তা খেল। আমাকে মা বলল, হ্যাঁরে তুই কী আগামীকালই যাবি ? বললাম, হ, মা। শিবুকে বললাম, 'তুই যা, আমার কাজ আছে। ও আস্তে করে উঠে কথা না বলে চলে গেল। ওর যাওয়ার পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। বুঝলাম, ওকে ভালোবেসেছি। বাইরে ঘৃণা দেখালেও ভিতরে পুড়ছে। বিকেলে বাজারে গেলাম না ওর সাথে দেখা হওয়ার ভয়ে। মনে মনে ঠিক করলাম, আমার পরীক্ষা আগে শেষ হোক। শিবুর রেজাল্ট বেরুক। ধরবো কালাদাকে। সেদিন আর সিনিয়র-জুনিয়র মানবো না। শিবুর হিসেব নেবো। আমাদেরটাও নিব। পরদিন ফরিদপুর চলে এলাম। মনজু আছে। বলল, 'ভাস্তে এত তাড়াতাড়ি ফিরলে ?' না বাপু বাড়িতে ভালো লাগে না। এখানে থাকলে পড়ি আর না পড়ি মিছিল মিটিংয়ে যাওয়া যায়। সিনেমা-যাত্রা ইচ্ছে মতো দেখা যায়। বললাম, পাশ মনে হয় হবে না। তবু চেষ্টা করবো বের হয়ে যেতে। তোমার তো পাকা হাত। হাতের বাহাদুরি তোমার পার করে দিতে পারে। আমার দ্বারা হবে না। হতে গেলে ধরা খেয়ে মারা পড়বো। এমনি করেই আমাদের দিন যাচ্ছিল। হঠাৎ এক বিকেলে শিবু এসে হাজির। হাতে ছোট্ট একটা পোটলা। মনে হল, গামছা লুঙ্গি বাঁধা। ওকে দেখে আমার মুখটা পেঁচার মতো হয়ে গেল। বসতে বলবো কী বলবো না ভাবছি। মনজু উঠে ওকে হাত ধরে টেনে এনে ওর বিছানায় বসালো। আমি আমার সিটে শুয়ে ছাদের কড়িকাঠ গুনছি আর ভাবছি। মালাউনের বাচ্চা আবার কেন এলো ? মনজু ওকে গোসল করে আসতে বলে, বুয়াকে দিয়ে ওর জন্য হোটেল থেকে ভাত আনালো। আমি বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বর্ষার আকাশের মেঘের দৌড় দেখতে লাগলাম। শিবু খেয়ে দেয়ে মনজুর বিছানায় কাত হল। মনজু খাতা কলম নিয়ে বসলো। শিবু আসাতে কষ্ট পাচ্ছি না খুশি হয়েছি তা ঠিক বলতে পারছি না। বাইরে যাই প্রকাশ পাক

ভিতরে খুশির আনন্দের চিকন মোটা সুর তার বেজে উঠলো। মেঘের দৌড় দেখা বাদ দিয়ে মন ও চোখ শিবুকে দেখতে চাইল। ঘাড় তুলে মনজুকে বললাম, চাচা একটা সিগারেট দাও। সিগারেটও নেওয়া হল, শিবুকেও দেখা হল।

ওর মুখ পানে চাইতেই অতীতের সমস্ত গ্লানি উঠে গিয়ে আমার ভেতরের ভালোবাসা কথা বলার জন্য আকুলিবিকুলি করতে লাগলো। তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে বললাম 'থামো'। আরো ধীরে চলো। মনজুর সাথে এটা সেটা আলাপ করতে করতে বিকেল হয়ে গেল। সন্ধ্যা নামার সাথে প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হল। সকল জড়তা কাটিয়ে শিবুকে জিজ্ঞেস করলাম কি খবর রে ? আমার মুখের উপর থেকে পলক না সরিয়ে বললো, এই তো দাদা এলাম। আপনি তো আমাকে চিনতেই চাইছেন না। আমি আপনাকে এতো বেশি চিনি যে আপনি না চিনলেও চলবে। দয়া করে আমার উপর রাগ করে এই বর্ষার মধ্যে অন্য কোথাও চলে যাবেন না। মনজুকে বললো, চাচা আপনারা তো নতুন স্টোভ কিনেছেন। আজ রাতে আমি এতে খিচুড়ি পাকাবো। সব আছে তো ? বলেই কি আছে না আছে দেখতে লেগে গেল।

স্টোভটা নেড়ে চেড়ে দেখলো। এই স্টোভই আমাদের বিভাজনের মূল কারণ। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, জানেন দাদা কালার স্টোভ ঘরে নেইনি। ট্রেনে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে ওটা কুমার নদীতে ফেলে দিয়েছি। ঐখানটায় যেখানে পানি পাক খায় বেশি। ছোটে প্রচণ্ড বেগে। আমরা মাঝে মাঝে রেলের ঐ ব্রিজের উপর বেড়াতে যেতাম পানির খেলা দেখার জন্য। আমি জানি শিবু মিথ্যা বলে না। কথা কম বলে মধ্যমানের জীবন যাপন করে। সুখ ও দুঃখ সমানভাবে গ্রহণ করে। আবেগ ভালোবাসাও প্রকাশ করে না। মনজু চকিত চোখে জিজ্ঞেস করলো, কি করলি স্টোভটা ? ফেলে দিলি। আমার মনে হল, এটা ইচ্ছে করে প্রকাশ করে নাই। তার অজান্তে স্টোভ দেখে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। শিবু আর একটা কথাও বললো না। খিচুড়ি পাকের কাজে বসে গেল। আমি জানি আর কথা বেরুবে না। কথা আরো আছে। যা বের করতে সময় লাগবে। রাতে খাওয়ার পর শিবু বললো, দাদা আমি পাটি পেড়ে মেঝেতে ঘুমাই। শুধু বালিশ আর চাদর দেন। মেঝেতে আমরাও মাঝে মাঝে ঘুমাই। আর মেহমান এলে মেঝেই নির্ভর। ভালোই লাগে। আমরা বেশ রাতেই ঘুমালাম। আমরা আমাদের সিটে শিবু মেঝেতে। শেষ রাতে কার স্পর্শে

আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি শিবু আমার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে। আমি না জানার ভান করে পাশ ফিরে শুলাম। অনেকক্ষণ পর সে আবার শুতে গেল। ভোরে নামাজ পড়েই আবার শুলাম। সবাই নাস্তা খাওয়ার পর নানা কথায় মেতে উঠলাম। রাতের ঘটনা ওকে নতুন করে আমার চিনালো। মন খুব নরম হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিনে। দুপুরের পাকও শিবু করলো। মনজুকে বললো, চাচা দাদাতো আমার উপর ক্ষেপে আছে, কথা বলছে না। আপনারা অনুমতি দিলে আপনাদের পরীক্ষার সময় সব পাক আমি করবো। আমার তো টাকা পয়সা তেমন নেই। শুধু আপনারা বাজারের টাকা দেবেন। আমি জানি পাক করতে করতে শিবুর হাত পেকে গেছে। আমি বললাম, না ওকে আমি রাখবো না। ওর সাথে এক পাতে খেতে আমি পারবো না। তোর যে কয়দিন থাকা দরকার থেকে চলে যা আমাদের একভাবে চলে যাবে। আমার কথায় ওর মুখটা শুকিয়ে গেল। বুঝলাম কথাগুলো শেল হয়ে বুকে বিঁধলো। মনের বিরুদ্ধে গিয়ে মুখ ওর উপর গোলা বর্ষণ শুরু করলো। আমার তাল বেতাল কথাবার্তা শুনে মনজু আমার উপর রেগে বলে উঠলো, থাম তো তুই। কয়েকদিনের মধ্যে ওদের রেজাল্ট বেরুবে সে পর্যন্ত ওকে রাখ। যা হবার তা হয়ে গেছে। শুনলি তো ওর স্টোভ কুমার নদীতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কালা হলো শিবুর বড় ভাই। আমাদের বেশ সিনিয়র ছিলো। মনজুর চোটে আমি থেমে গেলাম। আমার মনে হলো বাড়িতে শিবু একটা তালগোল পাকিয়ে এসেছে। তা না হলে কালার স্টোভ বললো কেন। ওর ভাইকে তো সে এভাবে ডাকে না। দুপুরে খাওয়ার পর বললাম আজ তিনজন সিনেমায় যাবো। শিবু আমার মুখপানে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। সিনেমা হল আমাদের এতো কাছে যে ওদের সকল কর্মচারির সাথে আমাদের ভাব। যখনই যাবো ভালো টিকিট পাবো। আমরা সন্ধ্যার শো তে গেলাম না। রাতের শো তে গেলাম। রাতে ফিরে শিবুকে বললাম তুই আমার সিটে ঘুমো। আমি আজ মেঝেতে। আজও দেখি গভীর রাতে আমার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে। টের পেয়েও আজও কিছু বললাম না। আমাদের মনজুর ঘুম বেশি। সিগারেট আর ঘুম এই দুটো পেলে অন্যসব ভুলে যায়। এমনি করেই কয়েকদিন কাটলো। হঠাৎ মনজু একদিন বললো শিবুদের ফল বেরিয়েছে। পেপারে দেখি ওর রোল দ্বিতীয় বিভাগের ঘরে। শিবু এতেই খুশি। খুশি না অখুশি এর কোন বহিঃপ্রকাশ ও ঘটালো না।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। কি রে খাওয়াবি না কিছু ? ও বললো দাদা আমার কাছে ২০ টাকা আছে। এই নিন যা ইচ্ছে নিয়ে আসেন। আমি আর মনজু অবাক ১৯৬৬ সনের ২০ টাকা অনেক টাকা। প্রায় এক মাসের খরচ। টাকাটা ফেরত না দিয়ে আমি তুলে নিয়ে মনজুকে দিয়ে বললাম, চাচা তোমার ইচ্ছে মতো ১০ টাকা খরচ করো। বাকি ১০ টাকা আমাকে দিও।

শিবুর দশ টাকায় আমরা মিষ্টি খেলাম। বুয়াকে খাওয়ালাম। খাওয়ালাম মেসে শিবুকে যারা চেনে তাদের। ঐ টাকার ভিতরেই মনজু খাসির মাংস আর মুরগিসহ অন্যান্য বাজার করে এনেছে। বাকি ১০ টাকা আমাকে ফেরত দিল। ৪/৫ দিন পরে শিবু কলেজে গিয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে এলো। আর তিন নম্বর পেলে প্রায় প্রথম বিভাগ হয়ে যেতো। ওকে আমরা বললাম, এই নম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনায়াসে চান্স পেয়ে যাবি। তোর দাদা কালা কে বলে ঢাকা চলে যা। কালকে বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আয়। এখানে তোর থাকার দরকার নেই। আমরাই সামলাতে পারবো। শিবু বললো মেজদা খুশি হবে। বড়দাও হবে। পড়ার জন্য সে এক টাকাও আর দেবে না। কালা দা কে বলে এসেছি আমার অংশ আমাকে বুঝিয়ে দাও। তোমরা ভারত যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে তা যাও। আমি যাবো না। এদেশেই থাকবো। অনেক জমি সে বিক্রি করে ফেলেছে। আমরা রেজিস্ট্রি করেও দিয়েছি। সে সব টাকা যে কোথায় তাও জানিনে। বলে ভারতে জমি রেখেছি। আমার বিশ্বাস হয় না। আর রাখলেও ওর নামে রেখেছে। আমাদের নামে নয়। শুধু মায়ের জন্য পারছিনে। মাকেও বলে এসেছি আর এক ছটাক জমিও বেচবো না। আর বেচলে, আমার টাকা আমাকে দিতেই হবে। আপনি ও আপনারা না থাকলে পাশ তো দূরের কথা, পরীক্ষাই দিতে পারতাম না। হয়তো দোকানে কাজ করতে হতো। আপনারা আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। কালা শুনলে হার্ট ফেল করবে। মা বৃদ্ধ হয়েছেন, তার কথার দাম কেউ দেয় না। হিন্দু পরিবারে মাতা নমস্য ঠিকই তবে তার গয়না ছাড়া আর কোন সম্পদ থাকে না। যদি কারো থাকে তারা ব্যতিক্রম। তাছাড়া আমার বোন আছে। মা গয়না আমাকে দিবেন কেন ? বোনকে পার করতে হবে না ? আমি বললাম তাহলে তুই কি করতে চাস ? ও বললো, জানিনে। তোমাদের পরীক্ষা তো আরো একমাসের বেশি দেরি আছে। চলো না সবাই বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। আমার চাচা, বাড়ি যাওয়ার কথা শুনলে পাগল। বললো, আজ রাতেই চলো যাই। আমি

বাগড়া দিলাম। না বাপু ভোরে যাবো। পরদিন আমরা বাড়ি চলে এলাম। শিবুদের বাড়ির কাছ দিয়েই আমাদের গ্রামে আসতে হয়। মনজুর বাড়ি পাংশা প্রপারে। আসার সময় শিবুদের বাড়িতে ওর পাশের খবর প্রাপ্ত নম্বরের খবর আমিই জানিয়ে দিয়ে এলাম। কমার্সে এতো ভালো রেজাল্ট গ্রামের ছেলেরা খুবই কম করে। প্রায়ই থার্ড ডিভিশন। টেনে টুনে সেকেন্ড ডিভিশন জোটে?। শিবু আমাকে বললো, দাদা বাজারে আসবেন। বললাম, আগে যাই তো বাড়িতে। আমি খবরটা প্রচার করতে করতেই এলাম। ২/৩ দিন বাজারে এলাম না। হঠাৎ একদিন শিবু আমার বাড়িতে এসে হাজির। মুখ খুবই শুকনো। কিছু নাস্তা খাওয়ার পর বললো, দাদা আমি মুসলমান হতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করেন। সেই আমলে হিন্দুরা দেশ ছেড়েছে। ধর্ম ত্যাগ করে এদেশে রয়ে গেছে তাদের সংখ্যা বিরল। তবে মেয়েরা প্রেমে পড়ে ধর্ম ত্যাগ করেছে। এর নজির বহু আছে। ওতো মেয়ে নয়। তুই পাগল হয়েছিস ? এই বুদ্ধি তোর দিলো কে ? আজ আমার এখানে থাক। বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই?। মাকে বললাম, মা শিবু থাকবে। আমাদের খাবার বেড়ে ঢেকে রেখো। ফিরতে রাত হবে। রাতে ফিরে খেয়ে দেয়ে আমি পড়তে বসলাম। ও শুয়ে পড়লো। সকালে নাস্তার পর ও বললো, দাদা আমার ব্যাপারটা কী করবেন ? বললাম, আমি ছাত্র, তুইও ছাত্র। এসব ব্যাপার আমরা ভালো বুঝবো না। তোর ভারতে যেতে ইচ্ছে না করলে তুই যাবিনে। তোর তো বাড়ি জমি-জমা ভালো আছে। তুই না দিলে কালা দা বেচতে পারবে না। তুই ঠেকাতে চাইলেই সংসারের তিক্ততা তৈরি হবে। তাছাড়া কাকীমা আছেন। তার কী ইচ্ছে রে ? কালা যা বলে, মাও তাই বলে। এটাই আমার বড় সমস্যা। মা যদি না যেতে চাইতো তাহলে আমি জোর পেতাম। তবে দাদা আমার বোন শিবানী যাচ্ছে না। সে বোধহয় সুযোগ পেলেই বাড়ি ছেড়ে মুসলমান হয়ে বিয়ে করে এদেশে থেকে যাবে। সব ঠিকঠাক। আমাকে সব বলেছে। আমিও বলেছি শিবানী আমি তোকে সাহায্য করবো। ছেলেটা ভালো দাদা। ওরা ভালো, ঘরও ভালো। আমার এক ক্লাস উপরে পড়তো। আজ নাম বলবো না। পরে জানাবো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোদের বাড়ির আর কে কে জানে ? মনে হয় মা অনুমান করে অতো গভীর খবর সে জানে না। কালা, নির্মল অনুমান করলেও অতো মাথা ঘামায় না। শালা ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হতাম। শিবানীর মতো একটা সুযোগ আমিও নিয়ে নিতাম।

অন্যের ঘাড়ে চেপে সংসার করায় মজাই আলাদা। দাদা, আমার বোন শিবানীকে দিয়েই উদাহরণ দিচ্ছি। ছোটকালে বাবা মারা যাওয়ার পর মা আমাদের কষ্ট করে বড় করলো। লেখাপড়া শেখালো সেই মাকে ফেলে সবাইকে ফেলে ও ঘর ছাড়বে ? সে কীসের টানে দাদা ? যদি মা না থাকতো আলাদা কথা। ওর শোকেই তো মা মরে যাবে। এমন সময় ও আঘাত করবে যখন কালার ওকে ফেলে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। আমি বললাম, তুই কি ওকে সাহায্য করবি ? কেন করবি ? করবো এই কারণে যে, জন্ম মাটিতে ও থেকে যাবে। আমিও পরে ওর সাহায্য পাবো। সর্বোপরি ওর ভালোবাসার ভালো সমাপ্তি হবে।

আমি জানি, তোমার পরীক্ষা আসন্ন আমার বিষয়ে ভাববার সময় তোমার নেই। দেশও এখন আন্দোলনমুখি। তোমাদের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে গেছে। হিন্দুরা যারা স্বচ্ছল তারা পোটলা পুটলি বেঁধে ফেলেছে। তুমি পরীক্ষা দিয়ে আমার কথা ভাবো। বেলা হলে ও চলে গেল। আমিও ফরিদপুর চলে এলাম। শিবু বলে এসেছিল তুমি যাও আমি আসছি। আমাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। শিবু এলো না। আমরাই নিজেদের মতো চলতে লাগলাম। মনজু বললো, ভাস্তে পরীক্ষার সময় পাকশাক করা ঝামেলা। ওসব বাদ দাও। গ্যাপের দিনে আমরা ওগুলো করবো। পরীক্ষার মাঝামাঝি সময়ে শিবুর চিঠি এলো।

দাদা,

"প্রণাম নিবেন। আজেবাজে কথায় না গিয়ে আসল কথায় আসি। শিবানী চলে গেছে। ওকে যেতে সাহায্য করেছি। আজ রাতে আমরাও চলে যাবো। যাবার আগে লিখছি। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে না যেয়ে পারলাম না। মা আমার হাত ধরে বললো, শিবু চল। তুই আমার ছোট ছেলে তোর হাতেই আমার মুখাগ্নি হোক। মায়ের এমন কথায় আর থাকতে পারলাম না। শিবানীকে আপনার কথা বলেছি। ওকে আপনাদের কাছে রেখে গেলাম। ফিরে আসার চেষ্টা করবো। হয়তো পারবো হয়তো পারবো না। আপনাদের কথা আমার আমৃত্যু মনে থাকবে। আমায় ক্ষমা করে দেবেন আপনারা। অনেক ঋণ আপনাদের কাছে। এতো শোধ দিতে পারবো না"।

ইতি
শিবু

মনজুকে চিঠিটা দেখালাম। বার দুই পড়ে বললো, বড় ভালো ছেলে রে। তোকে বড় ভালোবাসতো। এখানে থাকলে আমরা ওর এক ব্যবস্থা করতামই। ঢাকায় দুটো প্রাইভেট পড়ালেই ভার্সিটির খরচ হয়ে যেতো। না গিয়েই কী করবে। হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার শুরু হয়েছে তাতে মাত্র ইজ্জত নিয়ে বাস করা বড় দায়। ওর মা বেঁচে না থাকলে এদেশ থেকে না গেলে ও কিছুতেই যেতো না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকতো। জীবনে আর দেখা হবে না। এইটা ভেবে বুকের মধ্যে ছটফট করতে লাগলো। আমরা ওকে উপকার করলেও আমি তো মুখ খারাপ কম করিনি। সময় ব্যথা মিলিয়ে দেয়। আমার ব্যথাও দিন গড়ানোর সাথে মিলিয়ে যেতে লাগলো। তবে রেশ গেলো না। যতবারই ওদের বাড়ির কাছ দিয়ে গিয়েছি ততবারই একটু থেমেছি। দেখতে দেখতে ৭০ এর নির্বাচন হয়ে গেল।

১৯৭১ এ আমরা ২৫ মার্চের আগেই পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ শুরু করলাম। ২৫ মার্চের ক্রাক ডাউনের পর দেশ ছাড়া শুরু হলো। জুলাইতে ভারতে পাড়ি দিলাম। কল্যাণী যুব ক্যাম্পে উঠলাম আগস্টে। হঠাৎ একদিন ভরত আর শিবু আমার তাবুতে এসে হাজির। প্রায় দুবছর পর দেখা। ভরতই ওকে খবরটা দিয়েছে। ঢুকেই আমাকে প্রণাম করলো। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরলো। স্কুলে ওর সহপাঠিদের সাথে দেখা হলো। রবিবার। ভারতে সাপ্তাহিক ছুটি। প্রতি রবিবারে শিবু আসে। আমার তাবুতে থাকে। আমাদের বাইরে খাওয়ায়। আমার জন্য বেশি বেশি পয়সা খরচ করে। একদিন নিরিবিলি বললাম, শিবু তোর কথা কিছু বল। দাদা এখানে এসে গ্রাজুয়েশন শেষ করে ছোটখাটো একটা সরকারি চাকরি করি। বিয়ে শাদি করি নাই। মা নেই, আমিও কালাদের সংসারে নেই। ওখানকার টাকা দিয়ে এখানে কিছু জমিজমা করা গেছে। কালা, নির্মল ব্যবসা করে। ওরা ছোটখাটো থাকার জায়গা করেছে। আমারটা পড়ে আছে। মেসে থাকি। দাদাদের ওখানে গেলেও থাকিনে। শিবানীর খবর আর পাই নাই। আমি বললাম, খারাপ খবর হলে আমি পেতাম। ভালোই আছে।

মনজুর কথা জিজ্ঞেস করলে বললাম ভালোই আছে। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুনোর পর পাংশাতে গেলে দেখা হতো। ওর রেজাল্ট ভালো হয় নাই। তবে দেশ ছাড়লে আমি জানতাম ভারতে আসে নাই। দাদা, দেশ কী স্বাধীন হবে ? বলিস কী তুই ? বাংলা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরবো না। আমরা দুজন সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে

কলকাতায় যাই। ফিরিনে, আমার টাকা নাই, ওর আছে। আমার জন্য প্রচুর ব্যয় করে। দাদা আমাকে খরচ করতে দাও। আমি মনের মধ্যে শান্তি পাই। তোমাকে পেয়ে আমি আমার ফেলে আসা জন্মভূমিকে পেয়েছি। আমার দেহে যে রক্ত বইছে তা বাংলার মাটির প্রাণরস।

আমার ইচ্ছে করছে তোমাদের সাথে যুদ্ধে চলে যেতে। আবার হাবাসপুরে বসবাস করি। বললাম, না ভাই, তোর সেই কচি মুখটা আজও আমার বুকের মধ্যে পুরা আছে। পুরা আছে তোর সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয় থেকে শেষ দিনের ঘটনা পর্যন্ত। ঢাকায় ভর্তি হলাম নাম মাত্র। ক্লাস করা হল না। আন্দোলন ঘরের বাহির করে দিল। অবশেষে এখানে। শিবু আমাদের স্যার কলকাতায়। চল একদিন প্রণাম করে আসবি। ঠিক দাদা, চলো যাই। শিবু মাঝে মাঝে আমার পকেটে টাকা রেখে যায়। আর বলে, তোমার টাকার অভাব হবে না। তোমার যে সব বন্ধুরা এখানে চলে এসেছে তারা শুনলে তোমাকে এখানেই রেখে দেবে। দাদা, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার কাছে থাকো। যুদ্ধে যাওয়ার দরকার নেই। অন্যভাবেও দেশের কাজ করা যায়। বললাম শিবু, তোকে ধন্যবাদ। তুই আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসিস। তাই আমাকে ভুলায়ে কাছে রাখতে চাস। আমার জন্য অনেক কিছু করতে চাস। কিন্তু আমার যে যুদ্ধে যাওয়ার সময়। আমাদের মতো যুবকরা যুদ্ধে না গেলে জন্মভূমির সাথে বেঈমানি করা হবে। একদিন ছুটির দিনে আমি শিবু কলকাতায় গিয়ে আমাদের স্যার মোসলেম উদ্দিন মৃধা (এমপিএ) সাহেবের সাথে দেখা করে এলাম। স্যার প্রথমে ওকে চিনতে পারেন নাই। আমিই বললাম, স্যার আপনার ছাত্র শিবু, কালার ভাই। হাবাসপুর বাড়ি। ও স্যারকে প্রণাম করলো। স্যার ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। স্যার আমাকে বললেন, তোমরা এই সপ্তাহেই হায়ার ট্রেনিং এ চলে যাচ্ছো। আমি আর ফণিদা প্রায় ব্যবস্থা করে ফেলেছি। রাতে আমরা ফিরলাম না। এক হোটেলে থাকলাম, সিনেমা দেখলাম, হোটেলে খেলাম। শিবুর মন খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের চলে যাওয়ার কথা শুনে। বললো, দাদা তোমাকে হারালাম। তোমরা যে কাজে নেমেছো এর থেকে ফেরার উপায় নেই। তোমরা মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমার দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথী হতে পারলাম না। তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার বেতনের অর্ধেক টাকা ত্রাণ তহবিলে দান করে দেবো বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত। এ ভারত আমার ভালো লাগে না। অথচ এখানেই আমার থাকতে

হবে। এখানে থাকার যে কষ্ট তোমাকে বোঝাতে পারবো না। অথচ নিজের জন্মভূমিতে যাওয়াও যাবে না। বললাম, দেশ স্বাধীন হলে ভিসাটিসা লাগবে না। বর্ডারে যাবি বাংলাদেশে ঢুকবি। ইচ্ছে মতো ফিরবি। আমার ওখানে থাকবি। ফেলে আসা মাঠ ঘাট স্কুল, কলেজ, সঙ্গিসাথী, বাড়িঘর প্রাণভরে দেখবি। তখন তোর এই কষ্ট থাকবে না। ওখানেও বাড়ি করতে পারবি। শ্বশুর বাড়ি হাবাসপুরে বানিয়ে নে না। এক জীবনে এতো পাওয়া সেতো ভগবানের দান। দেখলাম, আমার কথায় শিবু চোখ মুছছে। পরদিন কল্যাণী ফিরে এলাম। শিবু আরো বেশি সময় দেওয়া শুরু করলো। বললো, তোমরা তো রাতে যাবে। দেখা হবে না, এই নোটগুলো তোমার কাছে রাখো। কাজে লাগবে। চলো একসাথে আজ ছবি তুলবো। ওর সব কথা শুনলাম। আমরা ছবি তুললাম। নোটগুলোও নিলাম। ও সন্ধ্যায় এসে জানলো, আমরা চলে যাবো। ও আমার কত কী যে কিনে দিল। সিগারেট দিল বেশি। বাসে উঠার সময় ও আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সে এক বোবা কান্না। আমিও আবেগাপ্লুত। মনে হল, ও ওর জন্মভিটা, পাঠশালা, হাইস্কুল, খেলার মাঠ, বাড়ির পূঁজার মন্দির, আবাল্য সাথী সবকিছু আমার মধ্যে পেয়ে মোদ্দাকথা গোটা বাংলাদেশকে জড়িয়ে ধরে ও কান্না করছে। ও আমাকে ধরে রাখবে। ধরে রাখবে বাংলাদেশকে। হায়রে! মাটির টান, শিকড়ের টান। ওর মুখটা দুহাতে চেপে ধরে বললাম,

"নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইবো চিনে
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারি যেন না করি সংশয়"।

বললাম, শিবু শোন রবি ঠাকুরের কয়েকটা লাইন

"হায় ওরে মানব হৃদয়
কারো পানে বারবার ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে–
এক হাটে নাও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে”।

আমাদের আর ফিরে চাইবার সময় নাই। হয় মৃত্যু না হয় বাংলার স্বাধীনতা। সব ফেলে এসেছি এক স্বাধীনতার জন্য। এছাড়া আমরা আর কিছু চাইনে। এ আমাদের ধ্যানজ্ঞান। ও বললো, দাদা দেবতা টেবতা মানিনে পুঁজোটুজোও করিনে বিশ্বাস করি এক ভগবানে তাঁর হাতেই তোমাকে ছেড়ে দিলাম। আরো যেন কী বলছিল বাসের হর্নে শোনা গেলনা। ভারতীয় সেনা সিপাহীর হুকুম এলো, ‘বাস মে উঠ্ পড়।’ এবং ধাক্কা দিয়ে বাসের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। শিবুকে আর দেখা গেল না। বাস ছেড়ে দিল বিহারের উদ্দেশে।

খলিলের কাছে খোলা চিঠি

প্রিয় খলিল,

তুমি অনেকদিন নেই আমাদের সাথে। নেই আরশেদ ও আরো অনেকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে একবার তোমাকে দেখতে তোমার কর্মস্থল ফরিদপুর গিয়েছিলাম। দেখা হলো। তুমি আমাকে তোমার বাসায় নিয়ে গেলে। ভাবীর সাথে পরিচয় করে দিলে। মনে পড়ে পর্দার আড়াল থেকে দু’চার কথা হয়েছিল। তোমার ধর্ম তোমাকে এমনভাবে বেঁধেছিল যে সে বাঁধন কেটে আমাদের দিকে হাত বাড়ানো তোমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যাপারটা আমি আগেই শুনেছিলাম। স্বচক্ষে দেখার জন্যই তোমার সামনাসামনি হওয়া। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘাড় না ফিরিয়ে সোজা হেঁটে এলাম যেই না পথ বাঁকা হলো, বাঁক ঘুরতে গিয়েই তোমার দিকে তাকালাম। দেখলাম তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছো। একটা আঁচল তোমার পিছন থেকে সরে গেলো। সালটা আজ আর মনে নেই। সম্ভবত ১৯৭০ এর দিকে হবে। দেশ আন্দোলনের দোলায় দোল খাচ্ছে। দুলছি আমরা যুবকরা। দেখতে দেখতে এসে গেলো স্বাধীনাতা যুদ্ধ। বউ বাচ্চা সংসার ফেলে নিলাম হাতিয়ার তুলে হাতে। আমাদের পরিচিতজনের সবার দেখা মিললো। মিললো না দেখা তোমার। কত চাকুরিজীবী চাকুরি ফেলে গ্রামে এলো। এলে না তুমি। কেন এলে না? পরে বাতাস থেকে জেনেছি ৭১-এ তুমি হারিয়ে গেছো। কারা তোমাকে নিয়ে গেলো? মুক্তিযোদ্ধা হলে তোমার নাম শহীদদের তালিকায় থাকতো। তা নেই। তাহলে কি পাকিদের হয়ে মুক্তিদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিলে? বাতাস সেই কথাই বললো। তুমি ‘ইসলাম’ বাঁচাতে গিয়ে গোটা বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলে। স্বাধীনতার পরে তোমার স্ত্রীর সাথে তোমার ভাই ভাতিজিদের সাথে আমার কথা হয়েছে। তোমার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা একটা চুপচাপ ভাব বজায় রেখে পাশ কাটিয়ে গেছে। মনে হয়েছে তোমার কর্মকাণ্ডে তারা লজ্জিত। একজন মুক্তিযোদ্ধার সামনে তোমার কাহিনি তারা কইতে চায় না। আমিও ঘাটাইনি। কী খুড়তে কী বেরিয়ে আসে। আমাদের নুরু (উদয়পুরের নুরুল হক) রাজাকার হয়েছিল। তবে দেশ বিরোধী কোন কাজ করে নাই। তাকে আমি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। তবে

তার মনটা পরিষ্কার করতে পারিনি। যদিও তার পরীক্ষা আর হয়নি। আমাদের ভাগ্য ভালো আমরা ৭১ এ মুখোমুখি হইনি। তুমি আমাদের মারতে। আমাদের সঙ্গে তোমাদের মারামারি একটা হতোই। দূরে থেকে চলে গেছো একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। তোমার বংশ আর নেই। তোমার মেয়েটা মারা গেল। বউটা আবার ঘর বাঁধলো। আমার কিন্তু ইচ্ছে হয়েছিল তোমার বউকে বিয়ে করি। একটা রাজাকারের বউকে বিয়ে করবো এতো খুশির কথা। তুমিও খুশি হতে। ভাবতে, আমার বন্ধু আমার বউ নিয়ে সংসার করা আর তোমার সাথে সংসার করা একই কথা।

খলিল, তোমার কথা মনে পড়ছে। এবার ঈদের পরে (২০১১ এর ১২ নভেম্বর) তোমার গ্রামে গিয়েছিলাম। সাঁঝে গেলাম, রাতে ফিরে এলাম। আমার- তোমার স্মৃতিধন্য এই গ্রাম। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের একাংশ কেটেছে এখানে। সব বদলে গেছে। নাই আগের মানুষ। আগের প্রকৃতি। সে আনন্দও আর পেলাম না। স্মৃতি বারবার কষাঘাত করতে থাকলো। ভাবলাম, তাড়াতাড়ি পালাই। বুড়াকালে স্মৃতির আঘাত বড়ই লাগে। তোমাদের দক্ষিণ পাড়ার কাদুকে জিজ্ঞেস করলাম,'খলিলদের বাড়িটা আছে না?' ও বললো, আছে। আর কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। তোমার জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমার ধর্ম তোমাকে দেশপ্রেম দিলো না। করলো দেশদ্রোহী। আলখেল্লার আর কান বাবরির দাপট তোমাকে আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেল। তোমাকে গোলাম আযমের সৈনিক ভাবতে আমার কষ্ট হয়। আরশেদের মাজার কোথায় জানো? হাবাসপুর কাচারির পাশে। আমাদের বন্ধুটি হরিতকি গাছটির ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে। আমরা বাড়ি গেলেই ওকে সালাম দেই। ওকে ঘিরে যেসব স্মৃতি আছে। মনের চারপাশে ভিড় করে। কী যে ভালো লাগে! তোমার স্মৃতি তো আরো সুখময় হওয়ার কথা। তাতো হয় না। পরিসমাপ্তি ঘটে তোমার বিষাদময় অন্তর্ধানের দৃশ্য নিয়ে। তুমি পাকিস্তানের হয়ে কাজ করেছো। খুঁজে খুঁজে মুক্তি মেরেছো। তোমার অতীতকে মনে আনার জন্য আমার মামাতো ভাই খালেককে ফোন করেছি। খালেককে তুমি চেনো। ও আমার বড় আপন। ও ছাড়া আর কারো সাথে যোগাযোগ নাই। ফোনে পেলাম। তোমার সেই ঘৃণিত কর্মকাণ্ডের কথা আবার সে নিশ্চিত করলো। ভেবেছিলাম এত বছর পর হয়তো ভালো কিছু শুনবো। হয়তো ভালোর

কাছাকাছি। বললো, তুমি মুসলিম লীগের পাণ্ডা ছিলে। অজ পাড়াগায়ে তোমার জন্ম। ২০১১ সালেও যেখানে যাওয়া যেত না। উন্নয়নের কোন ছোঁয়া ছিল না। মাটির এদো গন্ধ বাতাসে মিশে আছে। রাস্তাঘাটে যুবক-যুবতী শিশু বৃদ্ধ আজও বদনা নিয়ে বসে। সেখানকার ছেলে হয়ে তুমি হলে জামায়াতে পান্ডা। ধিক্ তোমাকে! তোমাকে নিয়ে আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। তোমার আত্মীয়-স্বজন যাদের আমি চিনতাম সবাই হলো মুক্তিযোদ্ধা। এদের ফেলে লেগে গেলে বাঙালি নিধনে। তোমাদের শাহাজাহান, লিয়াকতসহ চাচাতো ফুফাতো সব ভাই দেশের জন্য জীবন দিতে নেমে গেল, আর তুমি ইয়াহিয়া খাঁর বেতনভুক্ত কয়টাকার কেরানি হয়ে ঐ টাকা কয়টার মায়া ছাড়তে পারলে না? আমি জানি ব্যাপারটা টাকার নয়। ব্যাপারটা ধর্মের। ওদের ইসলাম বাঁচাও, ইসলাম বাঁচাও আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের সত্য মর্ম না বুঝে চলে গেলে ওদের সাথে। তোমার চোখে সারা বাংলার নারী পুরুষ সবাই হয়ে গেল কাফের। ভেক্ লেবাস পরা জঙ্গীদের সাথে তোমার তালিম আগেই হয়ে গিয়েছিল। তোমার ব্রেন এমনভাবে ওয়াশ করা হয়েছিল, সেখানে বিকৃত ইসলাম আর পাকিস্তান ছাড়া কিছুই ছিল না। ধর্মান্ধতা তোমার চোখে এমন ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিল যে পাকমন্ত্রী সভার সদস্য হওয়ার লালসা তোমার ছিল।

তোমাদের বড় বড় ঘুঘুদের এখন খাঁচায় গলায় রশি পরানো আছে। শুধু টান দেওয়ার অপেক্ষা। তোমার ভাগ্য ভালো। তাই টান খাওয়া থেকে বেঁচে গেছো। আবার বলছি শোন, তুমিতো মিরজাফর আলীর ভাই। আজও মানুষ ওর মাজারে গিয়ে নিরিবিলি প্রসাব করে খুশি হয়। তোমার তো মাজার নাই। হয় পুঁতে ফেলেছিল না হয় নদীতে ফেলে দিয়েছিল। আমার জানতে ইচ্ছে করে, এতো ধর্ম ধর্ম করলে, জানাজা পেয়েছিলে? তোমাদের আবার জানাজা! তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। আল্লার কাছে বলে পাকিস্তানে চলে যাও, সেখানে গেলে মোটামুটি ভালো থাকবে। দেশের লোকের সাথে দেখা হবে না। বিদ্রুপ অপমান সইতে হবে না। শালা, বানচোত শুনতে হবে না। তুই রাজাকার বলেও কেউ ডাকবে না। ওখানে তোমাদের নব্য নব্য পেয়ারে দোস্ত তৈরি হচ্ছে, তাদেরই একটা কমান্ড নিয়ো। আবার বলি, ধিক্ তোমাকে ! শুধু নিজেকেই কলঙ্কিত করোনি, করেছো তোমার পরিবার, গ্রাম তথা সমস্ত

বাংলাদেশের। তুমি ছাড়া আমাদের বন্ধুরা ঐ পথে আর কেউ যায়নি। তোমার আত্মাকে বলো, দেখে যাক। আরশেদসহ আরো অনেকের মাজার। বাংলার শহীদদের মাজারগুলো ঘুরে ঘুরে দেখুক। বাংলার মানুষের বিনম্র শ্রদ্ধায় সিক্ত হয়ে তারা ঘুমাচ্ছে। কতকাল চলবে এই শ্রদ্ধা নিবেদন তা মহাকালই বলতে পারে। আর তোমাদের কাদের মোল্লার ফাঁসি হয়েছে বাকি গোলাম আযম, নিজামি, মুজাহিদ গংরা কারাগারে।

হ্যাঁরে কাদের মোল্লা তোমার সাথে দেখা করে নাই ? এতো পেয়ারের দোস্ত তোমার, কীভাবে গেলো, দেখা করে জেনে নিও। ও যদি না বলতে চায় বলবে, তোমার গলাটা দেখি? তাহলেই বুঝতে পারবে কেমন করে ও গেল। তোমার বিষয় নিয়ে আবার খোঁজ খবর শুরু করেছি। একমাত্র ভাবীই বলতে পারে। সত্য ঘটনা। আর পারে তোমার ভাতিজিরা যারা তোমার কাছে যাওয়া-আসা করতো। মন ভালো কিছু শুনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ভালো আসে না। তোমার সাথে আমার দূরত্ব শুধু বাড়েনি মাঝখানের অন্ধকার এতো গাঢ় নিকষ যে চোখের দৃষ্টিতো দূরের কথা মনের দৃষ্টিও ঢুকে না। শুধু কল্পনা করি, তোমার সেই সময়ের কর্ম দিবসের কথা। কাদের মোল্লা, মুজাহিদ তোমার সমসাময়িক। ওরা হেরফের করে করে ৪৩ বছর পার করে ধরা খেল। আর তুমি ঐ বছরেই মারা পড়লে। হেরফের তোমার মাথায় আসেনি। একনিষ্ঠ পাকিস্তারের সেবক তো! মারবো না হয় মরবো। তোমার মেয়েটা যদি বেঁচে থাকতো, আমি যোগাযোগ করতাম। সখ্য গড়ে তুলতাম। বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস তার কাছে ধাপে ধাপে শুনাতাম। ভাবীর সাথে যোগাযোগ করতে ইচ্ছে করে কিন্তু সে এতো দূরে চলে গেছে যে, নাগালের বাইরে। আর আমাকে পাত্তাই দেবে কেনো? নিজের জীবনের গ্লানিময় অধ্যায়গুলো কে উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখতে চায়? তোমাদের গ্রামে আবার যদি যাই। যাকে পাই তাকেই দেখাবো ঐ বাড়িতে একজন রাজাকার বড়ো হয়েছিল। নাম খলিলুর রহমান। পিতা-হারাণ ফকির, জিয়ালগাড়ি, পাংশা।

তোমার সব ভাই আমার চেনাজানা। সবাই বিনয়ী ভদ্র সদাচারী। আল্লাহ্ ভক্ত মানুষ। ওনারা মাঠে খেটে তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। গোটা বংশের মুখে এক খাবলা কালি মেরে তুমি হয়ে গেলে রাজাকার! মরে গিয়ে বেঁচে গেলে। তোমার মেয়ে মরে বেঁচেছে, তোমার

বউ আবার বিয়ে করে পবিত্র হয়ে সংসার করছে। দোয়া করি ওনারা ভালো থাকুক। তোমার সমস্ত কালিমা ওনার মন থেকে মুছে যাক। যারা নির্দোষ তারা কেন কষ্ট পাবে? তোমাদের গ্রামের বাড়িটা নিভৃত শেষ প্রান্তে। পাশেই খাল। দক্ষিণে বিশাল দুবলা ঘাসের চত্বর। খালে টলটলে পানি। সাঁকোয় উঠলে কত রকমের মাছ যে চোখে পড়তো। ঐ সাঁকো দিয়েই আমাদের পন্ডিত মশাই রোজ বৃহস্পতিবার বাড়ি যেতেন। আমরা দুষ্টুমি করে মাঝে মাঝে সাঁকোর অর্ধেক বাঁশ তুলে রাখতাম। পন্ডিত মশাইকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যাতে তিনি আমাদের ক্লাসে পড়া না পারলেও বেত না মারেন। মনে আছে তোমার? উনি আমাদের কিচ্ছুই বলতেন না। বৃহস্পতিবার ক্লাসে না দেখলেই বলতেন, 'ছোড়া দুটো বাঁশ তুলতে গেছেনাকি রে আবার?' বেঞ্চির তলে মাথা রেখেই বলতাম, না স্যার, আছি। থাক্ থাক্। হ্যাঁ রে ডুব মেরে কী করছিস? কথা না বলে পকেট থেকে পড়ে যাওয়া কাচের গুলিগুলো গোছাতে ব্যস্ত থাকতাম। এই গুলিও পন্ডিত মশাই দেখতে পারতেন না। কিন্তু আমার আর তোমার বলে কথা! কারণ ঐ বাঁশ। তোমার মনে আছে খলিল, পন্ডিত মশাই বাংলা সেকেন্ড পেপারে ১০/১২ জনের বেশি পাশ করাতেন না। সংস্কৃত জানা মানুষ। একটা টান বাদ পড়লেই আর রক্ষা নাই। বানানগুলো দূরবীন দিয়ে দেখতেন। তুমি আর আমি এমনভাবে লিখতাম যে ঠিক বেঠিক বুঝা যেত না। আমরা ঝগড়া করে নম্বর আদায় করে ছাড়তাম। কারণ ঐ বাঁশ। পন্ডিত মশাই যেই কথা শুনতে লাগলেন, আমরা পায়ের তলায় আরো বাঁশ দিয়ে চওড়া করে দিলাম। এক হাত বাড়িয়ে দুই হাত করে দিলাম। এবার আর পন্ডিত মশাই সাঁকো পার হতে ভয় পান না। আমাদের দেখলেই বলতেন, তোরা খুব ভালো। বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। এখন চোখ বুজেই পার হওয়া যায়। আমরা বলতাম, স্যার বাংলা দ্বিতীয় পত্রে আমি ২৫ ও ২৯। আচ্ছা আয় দেখি কী করা যায় ? ফেলের দায় থেকে রেহাই পেয়ে যেতাম। যেদিন স্যারের রাত হয়ে যেতো, আমরা দুজন গল্প করতে করতে প্রায় ঘর পর্যন্ত এগিয়েও দিয়েছি। আবার রাতের আঁধারে আলোতে দু'জন ফিরেও এসেছি। কৈশোরের সেই সোনালি দিনগুলোর সুখে ভরা স্মৃতির কথা বলতে বলতে মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। বাস্তবে ফিরতেই দেখি তোমরা কেউ নাই। গোপাল নাই, আরশেদ নাই, পন্ডিত মশাইও নাই। হায়াত যদি থাকে এবারের শীতে তোমাদের গ্রামে

যাবো। তোমাদের বাড়িতেও যাবো। সবার খোঁজ খবর নেবো। পুরোনো তো আর কেউ নাই। এখনকার প্রজন্ম আমায় চেনে না। তোমাদের বাড়িরও হয়তো কেউ চিনবে না। তবু যাবো। পুরোনো টানে যাবো। কষ্ট হবে তা জানি, সেই দুবলার চত্বরে খালের ধারে সাঝের বেলায় হাঁটবো। তোমার কথা মনে পড়বে। তুমি নাই ভেবেও কষ্ট হবে। তুমি রাজাকার ছিলে তাও ভেবে কষ্ট পাবো। কেউ না কেউ সাথে থাকবে। তারা জিজ্ঞেস করলে বলবো, বাড়িটা আমার এক সময়ের বন্ধুর বাড়ি। একটা রাজাকারও ঐ বাড়িতে বড় হয়েছিল। বড় ভাগ্য তোমার কোন বংশধর আজ আর নেই। থাকলে তাদের কী চোখে দেখা হতো তুমি ভাবতে পারো ? জানি না তুমি কতজন মুক্তিযোদ্ধা মেরে মরেছো! তোমার মরার সময় মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে কী দিয়ে মারলো তোমাকে ? তোমার লাশটাই বা ওরা কী করলো? জানি এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো কেউ নেই। তবু অনুমান করতে গেলে ভয়ে কেঁপে উঠি। আমাদের আর এক বন্ধু কালাই এর কথা তোমার মনে আছে? আজ থেকে কয়েক বছর আগে ট্রাক দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে। ওতো স্কুলে টিস্কুলে গেল না। বাপের সাথে চাষবাস নিয়েই থাকলো। তবু তোমার মতো সে দেশদ্রোহী হয় নাই। আমাদের মতো বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে। তুমি যে জগতে আছো সেখান থেকে কোন খবর আসে না। কেউ ফিরে না। ওটা না ফেরার দেশ। ঐ জগতে গিয়ে যদি তোমার দেখা মেলে, সব কথা শুনবো আমার কাছে বসিয়ে। আজ আসি। খোদা হাফেজ।

সামছা

লোকাল ট্রেনিং নিয়ে যারা রাজবাড়ীর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন

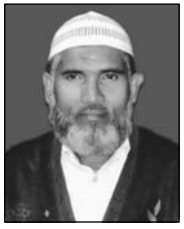

আনোয়ার হোসেন
উদয়পুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মরহুম জহুরুল হক
উদয়পুর
পাংশা, রাজবাড়ী

আ. সালাম সাদী
উদয়পুর
পাংশা, রাজবাড়ী

আবুল হোসেন
উদয়পুর
পাংশা, রাজবাড়ী

আমির আলী
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

ভাসাই
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মইজদ্দি
লক্ষ্মীপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মরহুম বানাত আলী মন্ডল
জয়কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মরহুম সাদেক আলী শেখ
জয়কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

আ. কুদ্দুস
কাচারীপাড়া
পাংশা, রাজবাড়ী

আ. সাত্তার
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

শরফউদ্দিন
কাঁধিপাড়া
উদয়পুর পশ্চিমপাড়া, রাজবাড়ী

লিয়াকত আলী
চরআফড়া
পাংশা, রাজবাড়ী

আ. হামিদ
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

আফতাব
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. ছবেদ আলী
শাহমীরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মরহুম আ. কাদের
কাচারীপাড়া
পাংশা, রাজবাড়ী

আ. মাজেদ
জিয়ালগাড়ী
পাংশা, রাজবাড়ী

মরহুম খো. নবাব আলী
হাবাসপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

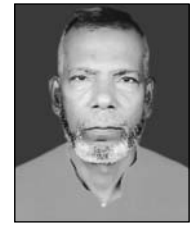

সেকেন পুলিশ
জয়কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

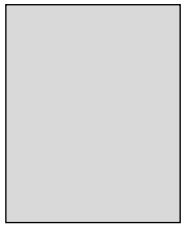

শহীদ খবির উজ্জামান (বীরবিক্রম)
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

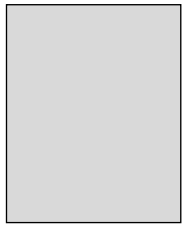

শহীদ জিন্নাত আলী
পাটিকাবাড়ী
পাংশা, রাজবাড়ী

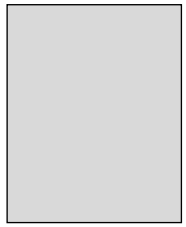

মরহুম মতিউল ইসলাম
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

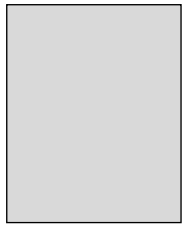

মরহুম আব্দুল কাদের
বলরামপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

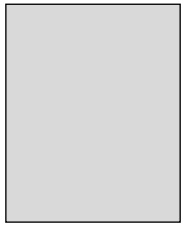

মরহুম ওবায়দুল- াহ (পিন্টু)
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

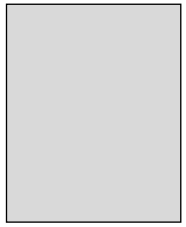

অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর
বলরামপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

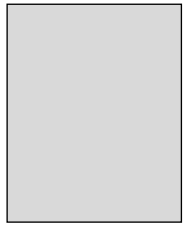

মোঃ এনামুল বারী
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. মতিয়ার রহমান
জয়কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

সুবেদার আব্দুল গণি
জয়কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

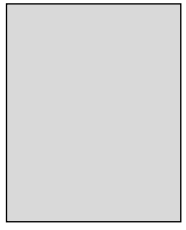

মো. খবির উদ্দিন মাস্টার
জয়কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. সৈয়দ আলী
বকসীপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

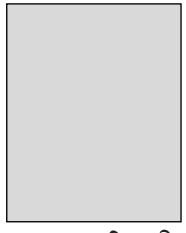

মো. আব্দুল হামিদ আলী
বকসীপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. সেকেন্দার আলী
তারাপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. ইমান আলী মাস্টার
রঘুনন্দনপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. শমশের আলী মাস্টার
রঘুনন্দনপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. আব্দুস সাত্তার
রঘুনন্দনপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

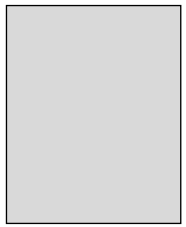

মো. হাচেন আলী শেখ
রঘুনন্দনপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

কাজী কবির উজ্জামান লেবু ডাক্তার
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

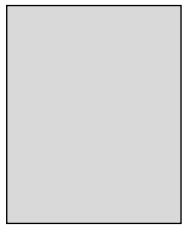

মো. আব্দুল মাজেদ
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

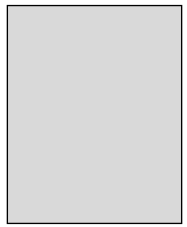

কাজী নুরুল আমিন
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

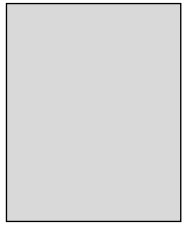

মো. মসলেম উদ্দিন শেখ
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. হামিদ শেখ
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

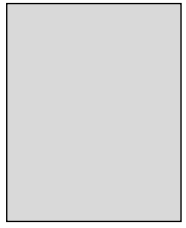

মো. মসলেম উদ্দিন
বলরামপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. আব্দুল জব্বার
বিলগজারিয়া
পাংশা, রাজবাড়ী

ড. মো. সিরাজুল ইসলাম
রঘুনন্দনপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

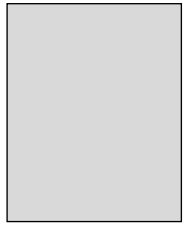

মরহুম সামছুদ্দিন মন্ডল
রঘুনন্দনপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

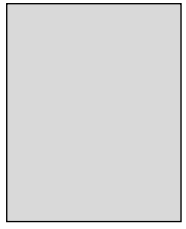

মো. এনামুল হক
রঘুনন্দনপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

মো. ইন্ডাজ উদ্দিন
কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

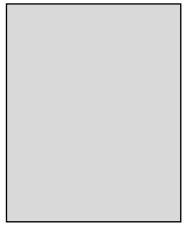

মরহুম রস্তম আলী শেখ
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

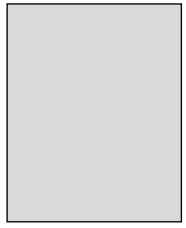

মো. লোকমান হোসেন
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

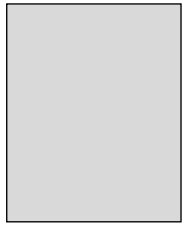

মো. আবুল কাশেম মাস্টার
পাটিকাবাড়ী
পাংশা, রাজবাড়ী

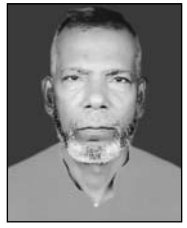

মো. সেকেন্দার আলী (সেকেন্দ পুলিশ)
জয়কৃষ্ণপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

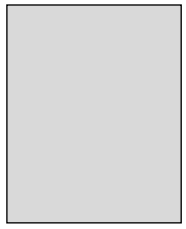

মরহুম জিল্লু মৃধা
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

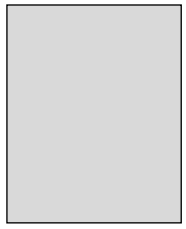

মোঃ শফিউজ্জামান
বাহাদুরপুর
পাংশা, রাজবাড়ী

সহায়ক গ্রন্থ

১। Liberation and beyond Indo-Bangladesh relation- J.N. Dixit
২। Tales of Millions-রফিক-উল-ইসলাম, বীর উত্তম
৩। যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা- মেজর নাসির উদ্দিন
৪। নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলিল-সিদ্দিক সালিক
৫। 1971, A global history of the creation of Bangladesh- Srinath Raghavon
৬। বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস- ফজলুল কাদের কাদেরী